অন্যচোখে রবীন্দ্রনাথ

ও

বিবিধ প্রসঙ্গ

পীযূষ দাশগুপ্ত

বাণী প্রকাশ

এ-১২৯ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট

কলিকাতা-৭০০০০৭

ANYACHOKHE RABINDRANATH-O-BIBIDHA PRASANGA.
(Articles on Rabindranath & other Subjects)
By Piyus Dasgupta
Published by Akhtar Husain : Bani Prakash
A / 129 College Street Market, Calcutta—7000 07
Price : Rs. 20·00

প্রকাশক :
আখতার হোসেন
বাণী প্রকাশ
কলিকাতা—৭০০০০৭

প্রথম সংস্করণ ॥ প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি—১৯৭৮

মুদ্রক :
অনিলকুমার ঘোষ
নিউ ঘোষ প্রেস
৪/১ই, বিডন রো,
কলিকাতা—৭০০০০০৭

মূল্য : কুড়ি টাকা

আমার বাবা

প্রয়াত গঙ্গাচরণ দাশগুপ্ত-র

পুণ্য স্মরণে

লেখকের কথা

দীর্ঘ কাল ধরে বিভিন্ন পত্রিকায় আমার বিভিন্ন ধরনের লেখা প্রকাশিত হয়ে আসছে —কখনো স্বনামে, কখনো বেনামে। এই সব লেখার মধ্যে কিছু নিবন্ধ এই সংকলনে এক সঙ্গে প্রকাশ করা হল।

সংকলিত নিবন্ধগুলির বেশির ভাগই সাম্প্রতিক কালে লেখা এবং প্রকাশিত হয়েছে 'বর্তমান' পত্রিকায়। দুটি লেখা—'গান্ধী-নেতৃত্বের শ্রেণী-দর্শন' এবং 'স্বাধীনতা আন্দোলনে কমিউনিস্টদের ভূমিকা'—বেশ কিছু কাল আগেকার এবং প্রথম প্রকাশিত হয় 'বাঙলাদেশ' সাপ্তাহিকে। তখন অবশ্য লেখা দুটির নাম ছিল ভিন্ন এবং লেখকের নামও ছিল প্রচ্ছন্ন। পুস্তকাকারে প্রকাশের জন্য প্রায় সবকটি লেখাই কিছু পরিমার্জনা করা হয়েছে।

এই সংকলনের নামের সঙ্গে 'অন্য চোখে' কথাটি জুড়ে দেবার তাৎপর্য আছে। প্রথমতঃ, আমি বোঝাতে চেয়েছি, বেশির ভাগ নিবন্ধই সংশ্লিষ্ট পত্র-পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হলেও সেগুলি সম্পাদকীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন নয়। দ্বিতীয়তঃ, আমি বোঝাতে চেয়েছি, নিবন্ধগুলি মার্কসবাদী অবস্থান থেকে লেখা হলেও, সেগুলি কোনো বিশেষ দলের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা নয়। একান্ত ভাবে আমারই দৃষ্টিকোণ থেকে, আমি যে ভাবে মার্কসবাদকে বুঝেছি, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা।

এই পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত 'কবির মুখে কবির কথা' শীর্ষক নিবন্ধটিতে আমি যাঁর বক্তৃতা নিয়ে আলোচনা করেছি, এই প্রসঙ্গে সেই কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নিজস্ব বক্তব্যটি এখানে উদ্ধৃত করা কর্তব্য বলে মনে করি. অন্যথা তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। তিনি লিখেছেন, "'বর্তমান' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত পীযূষ দাশগুপ্তের প্রত্যেকটি লেখাই আমি সাগ্রহে পড়ি……রবীন্দ্রকাব্যের প্রাসঙ্গিতার বিষয়ে……আমি যা বলেছিলাম, শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত তার প্রশংসা করেছেন, এবং একই সঙ্গে আক্ষেপ করেছেন যে, প্রাসঙ্গিকতা সংক্রান্ত কিছু কথা আমি বলেছি বটে, কিন্তু অনেক কথাই বলিনি। তাঁর প্রশংসার জন্য ধন্যবাদ জানাই। একই সঙ্গে স্বীকার করি. তাঁর আক্ষেপও অকারণ নয়। আমার কৈফিয়ৎ মাত্র একটাই। সময় তো পেয়েছিলাম মাত্রই আধঘণ্টা। ফলে অনেক কথাই সে দিন বলা গেল না।…" ('বর্তমান', ১৯. ৬. ৮৭।)—সন্দেহ নেই. নীরেনবাবু কেবল কবি হিসাবেই মহৎ নন, মানুষ হিসাবেও মহৎ।

এই সংকলন প্রকাশ করতে গিয়ে যাঁর কথা বিশেষ ভাবে মনে পড়ছে তিনি আমার

অগ্রজপ্রতিম শ্যামলকুমার রায়। এই সংকলন প্রকাশে তিনি কেবল আমাকে উৎসাহিতই করেননি, সেই সঙ্গে তাঁর সযত্নে রক্ষিত 'ফাইল' থেকে আমার দুটি হারিয়ে যাওয়া লেখাকে উদ্ধার করে দিয়ে, আমাকে সাহায্যও করেছেন। কিন্তু বইটি প্রকাশিত হবার আগেই আকস্মিক মৃত্যু এসে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

পরিশেষে, ধন্যবাদ জানাই তরুণ বন্ধু আখতার হোসেনকে। কাগজ ও মুদ্রণের নিত্য-বর্ধমান ব্যয় সত্ত্বেও তিনি কেবল এই বইখানা প্রকাশের দায়িত্বই নেন নি, প্রকাশনাটি যাতে সৌষ্ঠবসম্পন্ন হয় সে দিকেও যত্ন নিয়েছেন। আরো একজনের .কথা সবিশেষ উল্লেখ্য যিনি আমাকে নানা ভাবে সাহায্য করেছেন। তিনি আমার স্ত্রী স্বস্তি দাশগুপ্ত, কিন্তু তাঁকে ধন্যবাদ-জ্ঞাপন বাহুল্য মাত্র।

অভিনন্দন জানাই সহৃদয় পাঠকবৃন্দকে, যাঁরা নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও লেখক ও প্রকাশকদের পাথেয় যুগিয়ে চলেছেন। তাঁদের সমাদর এবং সমালোচনা—দুই-ই আমার মহার্ঘ্য সম্পদ।

২০. ১২. ৮৭
গল্‌ফ্‌ গ্রীন
কলকাতা-৪৫

বিনীত
পীযূষ দাশগুপ্ত

বিষয়সূচী

২৫শে বৈশাখ, ১৩৯২, তথা ৮ই মে, ১৯৮৫

এ বছর ২৫শে বৈশাখ এবং ৮ই মে পড়েছে একই দিনে। তাই একই দিনে উদ্‌যাপিত হ'ল রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী এবং ফ্যাসিবাদের উপরে মানবিকতার ৪০তম বিজয়-বার্ষিকী। যোগাযোগটা আকস্মিক, তবে অর্থহীন নয়। ফ্যাসিবাদের কথা ও কাজের বিরুদ্ধে যাঁর জীবনের প্রতিটি নীতি ও কৃতি ছিল সোচ্চার প্রতিবাদ, তাঁর জন্ম-জয়ন্তী এবং ফ্যাসিবাদের উপরে বিজয়-জয়ন্তী যদি উদ্‌যাপিত হয় একই দিনে, এমনকি একই সঙ্গে, তাহলে তার চেয়ে বেশি সুসঙ্গত, বেশি অর্থপূর্ণ আর কী হতে পারে?

কবির জন্মদিনে মনে পড়ল বিশেষ করে তাঁর মৃত্যুদিনের এবং তার আগেকার কয়েক দিনের কথা। 'অস্তাচলের পারে এসে' তখন তিনি ফিরে তাকিয়েছিলেন 'পূর্বাচলের পানে'; শঙ্কিত প্রতীক্ষার পরে অবশেষে পেয়েছিলেন ঈপ্সিত আলোর প্রতিশ্রুতি এবং তারপরে চির-নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন নিরুদ্বেগ প্রশান্তিতে। ....১৯৪১ সালের আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষের ক'টি দিন। হিটলারের ফ্যাসিস্ট বাহিনী সদর্পে এগিয়ে যাচ্ছিল মস্কোর দিকে। কবি তখন শায়িত তাঁর অন্তিম শয্যায়। প্রতিদিন তাঁর একই প্রশ্ন পার্শ্বে প্রতীক্ষমান প্রশান্ত মহলানবিশের কাছে, 'কী পরিস্থিতি রণাঙ্গনের?' প্রতিদিনই একই উত্তর, 'এখনো এগিয়ে চলেছে দস্যু-বাহিনী।' কবি ডুবে যান নীরব বিষণ্ণতায়। ....অবশেষে শেষবারের মত সংজ্ঞা এল কবির; চোখে সেই একই প্রশ্ন। কিন্তু প্রশান্তর উত্তর এবারে ভিন্ন। ইতিমধ্যে ইতস্তত শুরু হয়েছে সোভিয়েত বাহিনীর প্রতিরোধ। কবিকে তিনি সোৎসাহে জানালেন সে কথা। কবির মুখে দেখা দিল প্রসন্নতা। শেষবারের মত জ্বলে উঠল তাঁর প্রাণের প্রদীপ। বলে উঠলেন তিনি, "পারবে, দানবকে ঠেকাতে ওরাই পারবে"।

এবং 'ওরা' অর্থাৎ সোভিয়েত দেশের বীর সন্তানেরা সত্য সত্যই ঠেকাতে পেরেছিল ঐ দানব-বাহিনীকে। কেবল ঠেকাতে পেরেছিল বললে সবটা বলা হয় না, পাল্টা আঘাত হেনে তাদের বাধ্য করেছিল পিছু হটতে। অবশেষে ১৯৪৪ সালের ১লা মে স্তালিন তাঁর মে দিবসের ভাষণে হিটলারকে উদ্দেশ্য করে ঘোষণা করলেন, "দূরবীণ-জোড়া হাতে নিয়ে শেষবারের মত দেখে নাও সোভিয়েত দেশের ছবি। ফিরে যাও নিজের দেশে। আগামী বছর এমন দিনে আমরা পৌঁছে যাব বার্লিনে। সেখানে ওড়াব আমাদের বৈজয়ন্তী।"....এবং কী আশ্চর্য! এক বছর পরে এই মে মাসের ১লা তারিখেই সোভিয়েত সেনাবাহিনী প্রবেশ করল বার্লিনে এবং ৭ তারিখে দখল করে নিল বার্লিন; রাইখস্ট্যাগের শীর্ষে উড়িয়ে দিল সোভিয়েত রক্ত পতাকা। পরের দিন ৮ই মে জার্মান কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করল সোভিয়েত সেনাপতির

কাছে। এইভাবে শেষ হ'ল বিশ্বত্রাস দানব-শক্তির আগ্রাসী অভিযান এবং দেশে দেশে শুরু হ'ল মুক্তিকামী শান্তিকামী মানব-শক্তির দুর্বার জয়যাত্রা।

রবীন্দ্রনাথ যাকে অভিহিত করেছেন 'দানব' বলে, সেই 'ফ্যাসিবাদ'-এর নাম-গোত্র সম্বন্ধে এখানে কিছু বলে নেওয়া আশা করি বাহুল্য হবে না। 'ফ্যাসিবাদ' কথাটা এসেছে রোমান 'ফ্যাসি' থেকে, যার মানে 'দড়ি দিয়ে বাঁধা এক আঁটি কাঠ'। অতীতে রোম সম্রাটদের সাম্রাজ্যিক প্রতীক ছিল এই এক আঁটি কাঠ, যার মধ্যে থেকে মাথা তুলে আছে একটা কুড়োলের ধারালো মুখ। এই প্রতীকটাকেই মুসোলিনি বেছে নেন তার পতাকার প্রতীক হিবাবে এবং সেই অনুসারে তার পার্টিরও নামের দেন 'ফ্যাসিস্ট ফাইটার্স'। উদ্দেশ্য পার্টির পতাকা ও নামের সাহায্যে ইতালির মানুষের মনে রোম সাম্রাজ্যের গৌরব-গরিমা জাগিয়ে তোলা!

বিশের দশকে ইতালিতে ধনিক শ্রেণীর যখন দারুণ সংকট, ঘরে তারা সন্ত্রস্ত বিপ্লবের আশংকায়, বাইরে তারা অক্ষম সাম্রাজ্য-বিস্তারের মাধ্যমে সেই সংকট সমাধানের আকাঙ্ক্ষায়, তখন তাদের জরুরি দরকার পড়ল এমন একটা শক্তির, যা পারে তাদের এই সংকট থেকে পরিত্রাণ করতে। সেই সময়ে তাদের নজর পড়ল মুসোলিনি আর তার বাহিনীর উপরে—ইতিমধ্যেই যে লোকটি ত র দলবল নিয়ে মালিকদের হয়ে মজুর শ্রেণীর ধর্মঘট ও আন্দোলনকে গায়ের জোরে ভেঙে দিয়ে বেশ 'সুনাম' অর্জন করেছেন। ধীরে ধীরে এই শোষক তথা শাসক শ্রেণীর বেসরকারি ও সরকারি সাহায্যে মুসোলিনি সারা ইতালি জুড়ে গড়ে তুললেন বড় বড় ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী, তাদের সজ্জিত ও শিক্ষিত করলেন নানারকম হাতিয়ারে। তার পরেই তিনি ঘোষণা করলেন, "আমি চাই আমার হাতে দেশের শাসন ক্ষমতা।" ইতালির শোষক তথা শাসক শ্রেণী সানন্দে তাঁর হাতে তুলে দিল সব ক্ষমতা।

এবার তাঁকে পায় কে? তিনি নিজেকে ঘোষণা করলেন 'ইল ডুসে' ('সর্বময় কর্তা') বলে। শুরু করলেন সন্ত্রাস ও সংহারের অমানুষিক তাণ্ডব, যার বলি হলেন কেবল কমিউনিস্ট ও সোস্যালিস্ট রাজনীতিকেরাই নয়, সেই সঙ্গে বলি হলেন সমস্ত প্রতিবাদী শক্তি, যাঁদের মধ্যে ছিলেন শত শত শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষাব্রতী, গবেষক। যাঁরা কোনক্রমে নিস্তার পেলেন সেই দানবিক অভিযান থেকে, তাঁরা প্রাণে বাঁচলেন দেশের বাইরে স্বেচ্ছা-নির্বাসনে। কেড়ে নেওয়া হ'ল কেবল রাজনৈতিক অধিকার নয়, মানবিক অধিকারও। মুসোলিনি ঘোষণা করলেন, "এখন থেকে অধিকার বলে থাকবে নারীদের বেলায় কেবল যুদ্ধের সৈন্য যোগানোর জন্য সন্তান প্রসবের অধিকার এবং পুরুষদের বেলায় কেবল যুদ্ধের ডাকে সব সময়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার অধিকার।" গোটা ইতালি জুড়ে তিনি সৃষ্টি করলেন এক অস্বাভাবিক যুদ্ধোন্মত্ত পরিবেশ। তারপরে সত্য সত্যই ঝাঁপিয়ে পড়লেন আবিসিনিয়ার উপরে।

বিশের দশকের ইতালির মত মোটামুটি একই রকম পরিস্থিতিতে জার্মানিতে প্রাদুর্ভাব ঘটল ফ্যাসিবাদের, যদিও সেখানে তার সংক্ষিপ্ত নাম হ'ল 'নাৎসিবাদ'—সম্পূর্ণ নামটি হ'ল 'ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট মতবাদ'। একই রকম সংকটে পড়ে জার্মানির ধনিক শ্রেণী ক্ষমতা তুলে দিল হিটলার-এর হাতে, যিনি নিজেকে ঘোষণা করলেন 'ফ্যুয়েরার' বলে। ইতালিতে যেমন মুসোলিনি মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিলেন রোম সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখিয়ে, জার্মানিতে তেমন হিটলার মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুললেন 'হেরেন ভোক'-এর তথা আর্য জাতির বিশ্ব-প্রভুত্বের স্বপ্ন দেখিয়ে। তাঁর পতাকা হ'ল স্বস্তিকাচিহ্ন-লাঞ্ছিত; তাঁর হুংকার হ'ল আর্যেতর জাতিগুলির ধ্বংস সাধন। তারপরে শুরু হ'ল প্রথমে ইহুদিদের বিরুদ্ধে,সেই সঙ্গে ইহুদি মার্কসের অনুগামী কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে এবং তারপরে সোস্যালিস্ট ও গণতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে, তাঁর অমানুষিক সন্ত্রাস ও সংহারের অভিযান। এখানেও নিহত হলেন, কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন এবং নির্বাসিত হলেন অগণিত কবি, লেখক, শিল্পী, বিজ্ঞানী, অধ্যাপক। তারপরে শুরু হ'ল তাঁর বিশ্ব-জয়ের অভিযান এবং তারই ভূমিকা হিসাবে মুসোলিনির সহযোগে স্পেনে ফ্যাসিস্ট ফ্র্যাংকোকে ক্ষমতা দখলে সাহায্য, অস্ট্রিয়া গ্রাস, ফ্রান্সের উপরে আধিপত্য বিস্তার, অর্ধেক চেকোস্লোভাকিয়ার অন্তর্ভুক্তি, লণ্ডনে বোমা বর্ষণের মাধ্যমে ত্রাস সৃষ্টি এয়ং শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত দেশের উপরে তার আকস্মিক আগ্রাসন।

ওদিকে দূর প্রাচ্যে জাপানও গ্রহণ করেছে ফ্যাসিবাদের পথ! "এশিয়াবাসীর জন্য এশিয়া"—এই স্লোগানের আড়ালে সে আক্রমণ চালাল চীনের উপরে, দখল করে নিল একটার পরে একটা অঞ্চল। এই সময়ে ব্যথিত বিক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ অমিয় চক্রবর্তীর কাছে এক চিঠিতে লিখলেন, "মানব ইতিহাসে ফ্যাসিজিমের, নাৎসিজিমের কলংক-প্রলেপ আর সহ্য হয় না।....সবচেয়ে বেদনা পাই চীনের জন্য। .. সহায়শূন্য, চীন লড়ছে শূন্য হাতে, কেবল তার নির্ভীক বীর্য ভর করে।" এই সঙ্গে স্মরণীয় জাপানের "সভ্যতা বিস্তারের অভিযানে" রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ কামনা করে জাপানি কবি নোগুচির পত্রের উত্তরে তাঁর তীব্র ধিক্কার ও জ্বালাময় অভিসম্পাতের কথা।

তাহলে এই হ'ল বিশ্বত্রাস, বিশ্বগ্রাস ফ্যাসিবাদ, যার প্রধান পাণ্ডা ছিল হিটলার-জার্মানি, যাকে প্রায় একক শক্তিতে পরাভূত ও পর্যুদস্ত করেছিল তখনকার বিশ্বের একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন। হিটলার-জার্মানির উপরে সোভিয়েত ইউনিয়নের এই বিজয় কেবল ফ্যাসিবাদেরই পতন ঘটাল না, সেই সঙ্গে ভাঙন ধরাল ব্রিটিশ-মার্কিন ইত্যাদি সাম্রাজ্যবাদেরও। আর এরই কল্যাণে সমাজতন্ত্র বিস্তার লাভ করল কেবল ইউরোপেই নয়, সেই সঙ্গে এশিয়ায়, এমনকি দক্ষিণ আমেরিকাতেও এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলন জয়যুক্ত হ'ল বিশ্বের দেশে দেশে—আমাদের এই ভারতেও। সেই ১৯৪৩ সালে সোভিয়েত নেতা মলোটভ ঠিকই

বলেছিলেন, "ককেশাসের পাদদেশে আমরা রক্ষা করছি না কেবল আমাদের দেশকেই, সেই সঙ্গে রক্ষা করছি ভারতকেও।"

কিন্তু ধরা যাক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফল যদি হ'ত বিপরীত, তাহলে কী দাঁড়াত তার পরিণতি; অর্থাৎ সোভিয়েত-নেতৃত্বে মিত্র শক্তির জয় না হয়ে, যদি জয় হ'ত হিটলার জার্মানির নেতৃত্বে অক্ষ-শক্তির, তা হলে কী দাঁড়াত আজকের বিশ্বের পরিস্থিতি? প্রথমতঃ, গোটা পৃথিবী জুড়ে প্রতিষ্ঠিত হ'ত ফ্যাসিবাদের আধিপত্য....বেশির ভাগটা জুড়ে জার্মানির আর বাকি ভাগের উপরে কোথাও জাপানের, কোথাও ইতালির। তার অর্থ দাঁড়াত পরাধীন দেশগুলির স্বাধীনতা-আন্দোলনের সমাধি, অর্জিত অধিকার-গুলির অবসান। তার অর্থ দাঁড়াত স্বাধীন দেশগুলির স্বাধীনতার অপমৃত্যু, শ্রমিক শ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের এবং ট্রেড ইউনিয়ন ও রাজনৈতিক অধিকার সমূহের অবলুপ্তি। তার অর্থ দাঁড়াত বিশ্বের একমাত্র সমাজতন্ত্রের দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের ধ্বংসসাধন এবং এইভাবে দেশে দেশে মুক্তিকামী মানুষ ও শ্রেণীর কাছে যে দেশটি ছিল একমাত্র আলোকবর্তিকা, তার অকাল নির্বাপণ।

কেউ কেউ হয়ত এই দুরাশা পোষণ করতে পারেন যে, বাকি দুনিয়ায় ফ্যাসিবাদের জয় হলেও, আমাদের দেশে তো ঘটত না তার আত্ম-বিস্তার। এখানে আসতেন আমাদের নেতাজী তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে; ঘোষণা করতেন ভারতের স্বাধীনতা, গ্রহণ করতেন স্বাধীন ভারতের সংবিধান, অনুসরণ করতেন স্বাধীন অর্থনীতি এবং স্বাধীন বিদেশ-নীতি। হাঁা, নেতাজী নিশ্চয়ই তা করতে চাইতেন, কিন্তু পারতেন কি? যখন সোভিয়েত ইউনিয়নসহ গোটা ইউরোপ, মহাচীনসহ গোটা এশিয়া ফ্যাসিবাদের পদানত, তখন মদমত্ত সেই দানব কি ভারতবর্ষকে ছেড়ে দিত নেতাজীর হাতে? অসম্ভব! তখন ফ্যাসিবাদের প্রতিরোধে শুরু হ'ত সংগ্রাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত নেতাজীর ক্ষত-বিক্ষত মৃতদেহের বুকের উপর দিয়ে আমাদর দেশ এগিয়ে আসত হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ জোড়া ফ্যাসিস্ট বুট। ভারতের কেবল প্রভু-বদলই ঘটত না, সেই সঙ্গে তার উপরে চেপে বসত আরও কঠোর, আরও নৃশংস, আরও দানবিক এক সাম্রাজ্যবাদ—যার নাম ফ্যাসিবাদ।

বিশ্বমানবের সৌভাগ্য যে, ঘটেনি সেই সর্বনাশা বিপর্যয়। পরাজিত হয়েছে দানবিক ফ্যাসিবাদ, বিজয়ী হয়েছে মানবিকতার প্রতিরোধ। সত্য হয়েছে কবির সেই প্রত্যয়দৃপ্ত ঘোষণা:

"মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখ-বিকারে,
তারে হাস্য হেনে বলে যাব—এ প্রহসনের
মধ্য-অঙ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের;
বলে যাব দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়॥"

তবু মনে রাখতে হবে, ফ্যাসিবাদের দানব পরাজিত হলেও এখনও মৃত নয়। বিশ্ব-ধনতন্ত্রের চরম সংকটে আজ সে ভর করেছে বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের শেষ প্রহরী মার্কিন ধনিক শ্রেণীর কাঁধে। তাই আজ জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে মার্কিন প্রশাসনের প্রলয়ংকর পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়ংকর প্রস্তুতি। তাই আজ মার্কিন প্রেসিডেন্টের মুখে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধ্বংসের উন্মত্ত হুংকার। তাই আজ মৃত নাৎসি দস্যুদের কবরে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনে মার্কিন নায়কের তড়িঘড়ি পশ্চিম জার্মানিতে উড়ে যাওয়া।

অতএব এবারের এই ২৫শে বৈশাখ, এই ৮ই মে ভবিষ্যৎ ইতিহাসে স্থান পাক নবজাগ্রত ফ্যাসিস্ট দানবের বিরুদ্ধে বিশ্ব মানবের শেষ সংগ্রামের অঙ্গীকার গ্রহণের দিন হিসাবে। এবারের রবীন্দ্র-জন্মজয়ন্তী এবং ফ্যাসিবাদের উপরে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজয়-জয়ন্তী ভবিষ্যতে পরিণত হোক হিংস্র দানবের বিরুদ্ধে বিশ্ব-মানবের চূড়ান্ত বিজয়ের শাশ্বত অধ্যায়ের গৌরচন্দ্রিকায়!

১১।৫।৮৫

অন্যচোখে রবীন্দ্রনাথ

স্থান পার্ক সার্কাস ময়দান। কাল ১৯৬১ সাল। উপলক্ষ রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন। কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী সেই মহাসম্মেলনে দেশের নানা রাজ্য থেকে আগত, গুণীজনদের সঙ্গে ভাষণ দিয়েছিলেন কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ, শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা শ্রী এস এ ডাঙ্গে। ভাষণের বিষয় ছিল রবীন্দ্রনাথ এবং শ্রমজীবী মানুষ।

নাতিদীর্ঘ সেই ভাষণে ডাঙ্গে যা যা বলেছিলেন, তার সবকিছু সবিস্তারে মনে নেই, তবে কিছু কিছু আছে। তিনি বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ছেলেবেলায়, যখন আমি স্কুলে পড়তাম। চাক্ষুষ নয়, একটি কবিতার মাধ্যমে। কবিতাটির নাম 'পুরাতন ভৃত্য'। মনে পড়ে, কবিতাটি পড়ে বেশ কিছুক্ষণ আমি আবিষ্ট হয়ে ছিলাম। আবেশ যখন ভাঙল, তখন আমার মধ্যে অনুভব করলাম দুটি বোধ। এক, কবি হবার প্রেরণা এবং দুই, ঘরের কাজের লোকের প্রতি সহানুভূতি। প্রথমটি ক্রমে ক্রমে লোপ পেয়ে গেল। কিন্তু দ্বিতীয়টি রয়ে গেল এবং ক্রমে ক্রমে ঘরের কাজের লোককে ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ল বাইরের কাজের লোকদের ক্ষেত্রেও। আমার মনে হয়, আজ যে আমি শ্রমিক-নেতা, তার পিছনে অন্ততঃ কিছুটা কাজ করেছে কবির সঙ্গে ছেলেবেলায় আমার সেই প্রথম পরিচয়।

ডাঙ্গে আরো বলেছিলেন, এ কথা সত্য যে, কবি মেহনতি জনগণের জন্য কবিতা লেখেননি, লিখেছেন তাদের সম্বন্ধে। তাদের সম্বন্ধে কবিতা লিখে তিনি সমাজের বাকি অংশগুলিকে ভাবতে শিখিয়েছেন তাদের জন্য। আর তা ছাড়া, তিনি যে তাদের জন্য লেখেননি, তার জন্য তাকে দোষারোপ করে লাভ নেই। এরজন্য দায়ী আমাদের দেশের বাস্তব পরিস্থিতি। যেখানে মেহনতি জনগণের শতকরা নব্বুই ভাগেরও বেশি নিরক্ষর, সেখানে তাদের জন্য কিছু লেখা তো নিরর্থক। তারা তো পড়তেই পারবে না। সুতরাং কবিকে লিখতে হয়েছে তাদের জন্য নয়, তাদের সম্বন্ধে। তাদের জন্য কিছু না লিখলেও, তাদের জন্য তিনি করে গিয়েছেন অনেক কিছু, বিশেষ করে গ্রামের গরিবদের জন্য।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে আরেকটি ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক সম্মেলনে একজন স্বল্প-শিক্ষিত গ্রামীণ কবির কথা। চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে মহম্মদ আলী পার্কে অনুষ্ঠিত সেই সম্মেলনটিও সংগঠিত হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে—তৎকালীন কমিউনিস্ট নেতা পি সি যোশীর নেতৃত্বে। পক্ষকাল-ব্যাপী সেই সম্মেলনে সমবেত হয়েছিলেন অখণ্ড বঙ্গের শহুরে সুখ্যাত শিল্পী সাহিত্যিক ও কলাকারদের সঙ্গে বহু গ্রামীণ শিল্পী, কবিয়াল ও কলাকারও। সম্মেলন শেষে এই দারিদ্র্য-পীড়িত গ্রামীণ

প্রতিভাদের কাউকে কাউকে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে বিনম্র স্বীকৃতি হিসাবে দেওয়া হয় কিছু কিছু উপহার—অর্থ, বইপত্র, জামাকাপড় ইত্যাদি। উপহার প্রাপকদের মধ্যে একজন ছিলেন গ্রামের এক স্বল্প-শিক্ষিত কবিয়াল (গুরুদাস?), যাঁকে দেওয়া হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের একখানা 'সঞ্চয়িতা'। আসর ভাঙার পরে মঞ্চের এক ধারে এই প্রতিভাদের ঘিরে জড়ো হই আমরা অনেকে। নানা প্রশ্ন, নানা উত্তর। এর মধ্যে কে-একজন ঐ কবিয়ালকে অনুরোধ করেন তাঁর একটি কবিতা আবৃত্তি করতে। হেসে তিনি বললেন, আমার কবিতা তো আপনাদের শুনিয়েছি এই মেলায়। এবার আপনারা আমাদের শোনান কিছু কবিতা এই বইখানা থেকে।—এই বলে তিনি এগিয়ে দিলেন 'সঞ্চয়িতা'-খানা। আমাদের মধ্যে একজন পরপর অনুরোধে আবৃত্তি করলেন পরপর কয়েকটি কবিতা। আমি লক্ষ্য করলাম কবিয়ালের চোখে জল। পাঠশেষে তিনি সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, এই "কবিতা লিখেছেন আমাদেরই মত একজন মানুষ! কোনো ঠাকুর-দেবতা নন! হায়, আমার দেশের বেশির ভাগ মানুষ আমি যতটুকু লেখাপড়া জানি, ততটুকুও জানে না? তারা এই কবিতা পড়তে পারবে না!" ....তারপর একটু থেমে বললেন, "অবশ্য কেউ পড়ে শোনালে সবটা না বুঝলেও ভাবটা বুঝবে। গ্রামে গিয়ে আমি তাদের পড়ে পড়ে শোনাবো এই কবিতা।"

যে 'পুরাতন ভৃত্য'টির মাধ্যমে কবির সঙ্গে ডাঙ্গের প্রথম পরিচয়, সেই 'কেষ্টা বেটাই' বোধহয় রবীন্দ্রকাব্যে প্রথম শ্রমজীবী মানুষ, যে সশরীরে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত। যদিও ক্ষেতের চাষি, কলের মজুর এবং আরও অসংখ্য রকমের খেটে খাওয়া মানুষ নিয়ে গঠিত যে বিশাল শ্রমজীবী জনসমষ্টি, তার তুলনায় গৃহ-ভৃত্যরা কি সংখ্যায়, কি গুরুত্বে, একান্তই নগণ্য, তবু কেবল এই কারণেই তাকে আমরা স্বীকৃতি না দিয়ে পারি না। 'পুরাতন ভৃত্য'র আগে যে কবিতাটিতে রবির রশ্মি সম্পাতে শ্রমজীবী মানুষের ছবি আমাদের চোখের সামনে ব্যক্ত হয়ে ওঠে, সেটি হ'ল 'এবার ফেরাও মোরে'। চিরবঞ্চিত, চিরলাঞ্ছিত, সাধারণ মেহনতি মানুষের যে ছবি তিনি সেখানে কয়েকটি মাত্র ছত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন, তার তুলনা নেই, তেমনি তুলনা নেই তাদের অবস্থা-পরিবর্তনের জন্য তাঁর উদাত্ত আহ্বানের। 'পুরাতন ভৃত্য'র প্রায় সমকালে তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন শ্রমজীবী মানুষের সম্পর্কে, ছোট চাষিদের সম্পর্কে একটি অনবদ্য কবিতা—'দুই বিঘা জমি'। এখানে একদিকে উপেনের মাধ্যমে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন বঞ্চিত, লুণ্ঠিত চাষিদের শোচনীয় অবস্থা, অন্যদিকে, জমিদারের মাধ্যমে বঞ্চনাকারী লুণ্ঠনকারী সামন্ত-প্রভুদের সংবেদনহীন, বিবেকহীন স্বরূপ। তারপরে 'হতভাগ্যের গান', যেখানে তিনি নিজেকে একাত্ম করে দিয়েছেন 'রিক্ত যারা সর্বহারা', তাদের সঙ্গে এবং অবজ্ঞাভরে সোচ্চারে পরিহাস করেন ভাগ্যদেবী আর তাঁর

ক্রীতদাসদের প্রতি। 'অপমানিত' কবিতাতেও তিনি আমাদের আবেগভরে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন শ্রমজীবী জনসমাজের সবচেয়ে নিচুতলার মানুষদের প্রতি, যারা কেবল আর্থিক দিক দিয়েই সবচেয়ে বঞ্চিত নয়, সামাজিক দিক দিয়েও সবচেয়ে লাঞ্ছিত—তথাকথিত অচ্ছুৎদের প্রতি এবং সরোষে সতর্ক করে দিয়েছেন এই দুর্ভাগা দেশকে যে অচিরে অবসান ঘটাতে হবে এই অমানবিক বিধানের, অন্যথা, "মৃত্যু-মাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান।"

কবিজীবনের শুরু থেকে ১৩১৭ সন অবধি কবি শ্রমজীবী মানুষদের সম্পর্কে যেসব কবিতা লিখেছেন, উপরে সেগুলিরই একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সংকলন কালানুক্রমিক ভাবে উপস্থিত করতে চেষ্টা করেছি। বেশ কিছু কবিতাই হয়তো আমার স্মৃতি এড়িয়ে গিয়েছে কিন্তু, তাতে কবির দার্শনিক বক্তব্যে এবং সে সম্পর্কে আমার সবিনয় মন্তব্যে বিশেষ কোনো হেরফের হবে বলে আমার মনে হয় না। যেমন ভাবে উপরে কবিতাগুলি উল্লেখ করা হয়েছে তেমনভাবেই পরপর আমার কথা এখানে রাখছি। 'পুরাতন ভৃত্য': এখানে প্রকাশ পেয়েছে মনিবের চরম বিপদে সেবকের চরম আত্মদানের ঘটনা এবং সেই সঙ্গে মনিবের গভীর মর্মবেদনা। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটিতে মূলতঃ প্রকাশ পেয়েছে কবির ভাবমগ্ন সত্তা এবং বাস্তব সচেতন সত্তার মধ্যে সংঘাত এবং দ্বিতীয়টির জয়; আলংকারিক ভাবে বলা যায়, এ যেন কবির শকুন্তলা-সত্তার সঙ্গে তাঁর দুর্বাসা-সত্তার সংঘাত এবং তার ফলে কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে তাঁর নোতুন উপলব্ধির উদয়! সন্দেহ নেই যে, কবিতাটি তাঁর ব্যক্তির সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে এবং তাঁর নিজের প্রতি কর্তব্যের আহ্বান ছড়িয়ে পড়েছে সবার প্রতি আহ্বানে। কবিতাটির সার্থকতা এখানেই যে, সেই হিসাবে তার মধ্যে যা ধ্বনিত হয়েছে তা শ্রমজীবী জনগণকে ভাষা ও আশা দেবার, অবিচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সাহস ভরে দাঁড়াবার বাণী। 'দুই বিঘা জমি'তে ব্যক্তি উপেন এবং ব্যক্তি জমিদারকে ছাপিয়ে উঠেছে একটি গোটা ব্যবস্থার বঞ্চনা ও লুণ্ঠনমূলক চরিত্রের উদঘাটন। উপেনের মুখ দিয়ে কবি নিজেই উচ্চারণ করছেন এই ব্যবস্থার প্রতি তাঁর ধিক্কার: "রাজার হস্ত করে সমস্ত গরিবের ধন চুরি।" 'হতভাগ্যের গান'-এ তিনি স্পষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা করে দিয়েছেন তিনি কাদের সঙ্গে—বিত্তবানদের না বিত্তহীনদের। 'অপমানিত' কবিতায় তিনি আহ্বান জানিয়েছেন "মানুষের অধিকারে বঞ্চিত" করা হয়েছে যে মানুষদের, তাদের মানুষের অধিকার সবিনয়ে মেনে নিতে—স্বেচ্ছায় সামাজিক সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠা দিতে।

আশা করি পাঠকেরা এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, এই কবিতাগুলিতে যে মহৎ ভাব প্রকাশ পেয়েছে, তা এক উদার মানবতাবাদ—তবে অবশ্যই সমাজবাদ নয়। আশা করি পাঠকেরা আরও একটি বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, এই কবিতাগুলিতে প্রাক্-যন্ত্রযুগের শ্রমজীবী মানুষদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা স্বপ্রকাশ হলেও, যন্ত্রযুগের শ্রমজীবীদের সম্পর্কে, কলকারখানার শ্রমিকদের সম্পর্কে, তাঁর ভাবনা

অপ্রকাশ। অবশ্য, তাদের সম্পর্কে তাঁর ভাবনা অন্ততঃ অংশতঃ প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বেশ কিছু কাল পরের কিছু স্মরণীয় সৃষ্টিতে, যেমন, 'মুক্তধারা' (১৩২০) এবং 'রক্তকরবী' (১৩৩১) কাব্য-নাট্য দুটিতে, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিতে। এবং 'ঐক্যতান' (১৩৪৮) কবিতাটিতে! নিচেকার অনুচ্ছেদ কটিতে আমি আলোচনা করব কাব্য-নাট্য দুটি প্রসঙ্গে।

প্রথমে 'মুক্তধারা'। উত্তরকূটের মহারাজ রণজিৎ। ক্ষাত্রশক্তি ও বৈশ্যস্বার্থের প্রতীক। তাঁর নির্দেশে নির্মাণ করা হয়েছে দৈত্যাকার এক যন্ত্র—পাহাড়থেকে অবাধে নেমে আসা ঝর্ণা 'মুক্তধারা'কে বাঁধবার জন্য। উদ্দেশ্য শিবতরাইয়ের অবাধ্য প্রজাদের জলপ্রবাহ তথা প্রাণপ্রবাহ বন্ধ করে দিয়ে তাদের ফসলের ক্ষেতগুলিকে মরুভূমি করে দেওয়া, তৃষ্ণার জল থেকে বঞ্চিত করে তাদের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করা। এই দানবীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন ঝরনাতলায় কুড়িয়ে পাওয়া, রাজবাড়িতে বড় হওয়া, যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হওয়া, রাজার পরম স্নেহের পাত্র অভিজিৎ। বন্দী হলেন তিনি। অবশেষে রাজার খুড়ো বিশ্বজিতের সাহায্যে কারগার থেকে পালিয়ে গিয়ে সবার অলক্ষ্যে ভেঙে দিলেন তৃষ্ণা-রাক্ষসীর বেদী সেই বিরাট বিকট যন্ত্রকে। রুদ্ধ ধারা আবার মুক্ত হ'ল। অবারিত হল তার প্রাণ-প্রবাহ।

এখানে লক্ষণীয় যে, উত্তরকূটের শিয়রে এই বিরাট যন্ত্রটির স্পর্ধিত প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও সেখানকার সমাজ-জীবন যন্ত্র-তান্ত্রিক তথা শিল্পতান্ত্রিক নয়। অতএব সেখানকার শ্রমজীবী মানুষেরাও শিল্পশ্রমিক নয়, কৃষিশ্রমিক, তন্তুবায় ইত্যাদি। সাময়িক ভাবে যন্ত্রনির্মাণের কাজে লাগানো হলেও, তাদের মূল চরিত্রে জীবন-যাত্রায় ও শোষণের চেহারায় কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। সুতরাং যন্ত্রশ্রমিক তথা শিল্পশ্রমিক সম্পর্কে রবীন্দ্র-দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবনে 'মুক্তধারা' খুব সহায়ক হয় না। তা হলে মনোযোগ দেওয়া যাক 'রক্তকরবী'র দিকে।

'রক্তকরবী'। রাজ্যের নাম যক্ষপুরী। এখানে ওখানে কেবল সোনায় খনি আর সোনার খনি। রাজার নাম মকররাজ। চারদিকে তার খনি থেকে তোলা সোনার পাহাড়। তবু তার চাই আরও আরও সোনা। সারাদিন মানুষকে মজুর খাটিয়ে তাই তিনি গড়ে চলেছেন আরও আরও সোনার পাহাড়। অসহ্য খাটুনির চাপে তিনি নিঙড়ে নিচ্ছেন মজুরদের শ্রম, তাদের প্রাণশক্তি। তারা পরিণত হয়েছে এবং হচ্ছে তাঁর স্বর্ণ সংগ্রহের হাতিয়ারে, নীরস সংখ্যায়। এই শোষণ ও শাসন অব্যাহত রাখতে তিনি একদিকে যেমন নিয়োগ করেছের সর্দার, মোড়ল আর চর, অন্য দিকে তেমন নিয়োগ করছেন গোঁসাইজী, অধ্যাপক ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এমন আঁটো-সাটো ব্যবস্থার মধ্যেও, এমন সন্ত্রাস ও শোষণের রাজত্বের মধ্যেও প্রাণের মাতন

তুলে দিয়েছে একটি সামান্য মেয়ে—নন্দিনী। হাতে তার রক্তকরবী, মুখে তার সন্দীপনের বাণী। সঙ্গী তার সেখানকারই এক মজুর, রঞ্জন। শোষিত মজুর হয়ে আজও সে ধরে রেখেছে তার দৃপ্ত যৌবন। যখনই একত্র হয় নন্দিনী আর রঞ্জন, প্রমাদ গোনেন রাজা—এই বুঝি জাগরণের ঢেউ তুলে দেয় ঘুমন্ত মজুরদের মধ্যে। রঞ্জন স্থানান্তরিত হয় অন্য এক খনিতে, বিচ্ছিন্ন হয় নন্দিনীর কাছ থেকে।...আজ সকাল থেকেই নন্দিনীর কেমন যেন মনে হচ্ছে, রঞ্জন আজ আসবে, আসবে। তাকে পথে অভ্যর্থনার জন্য সে পাঠালো কিশোরকে—একটি রক্তকরবী হাতে। প্রতীক্ষা আর প্রতীক্ষা। কিন্তু কোথায় তার রঞ্জন? ...অবশেষে রঞ্জন এলো, কিন্তু জীবিত নয়, মৃত। আসার পথে তাকে মেরে ফেলেছে সর্দারেরা। তার নিঃসাড় দেহ পড়ে আছে মাটিতে তখনও হাতে তার নন্দিনীর পাঠানো সেই রক্তকরবী। (মনে পড়ে প্যারি কমিউনের নিহত, কমিউনার্ডের হাতে বুকের রক্তে ভেজা সেই ছেঁড়া জামার রক্ত নিশানের কথা।)... কৃতকর্মের অনুশোচনায় যক্ষপুরী থেকে বেরিয়ে এলেন মকররাজ। নিজেকে সঁপে দিলেন নন্দিনীর কাছে। মজুরেরা কারাগার ভেঙে বের করে আনলেন তাঁদের কারারুদ্ধ সাথীদের। শুরু হ'ল এক নবজীবনের জয়যাত্রা—যার আগে আগে চলেছে নন্দিনী, সঙ্গে সেই রাজাও।

এই কাব্য-নাট্যের ভূমিকায় কবি বলেছেন, "এই নাটকটি সত্যমূলক।—কবির জ্ঞানবিশ্বাস মতে এটি সম্পূর্ণ সত্য।... এই নাটকটি একেবারেই পৌরাণিক নয়, একে রূপকও বলা যায় না।" আমিও বিশ্বাস করি এই নাটকটি সত্য ও সমকালীন। রঞ্জনের হত্যা পর্যন্ত নাট্যাংশ বাস্তব সত্য, বাকি অংশ অর্থাৎ মকররাজের অনুশোচনা আত্মসমর্পণ ইত্যাদি ইত্যাদি বাস্তব সত্য নয়, কবি-সত্য—কবির তত্ত্ববিশ্বাস অনুসারে সত্য। আর সমকালীন তো বটেই, কেননা এখানে যে শোষণ ও শাসন ব্যবস্থার ছবি উপস্থিত করা হয়েছে, তা মূলতঃ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থারই ছবি। যদিও কাব্যের রঙে আঁকা। মার্কসবাদের ভাষায় প্রকাশ করলে কবির বক্তব্যটিকে এইভাবে হাজির করা যায়ঃ উৎপাদনের উপায়-উপকরণের (খনি ইত্যাদির) উপরে মালিকানার সুযোগ নিয়ে মালিক (মকররাজ) মজুরদের উপরে চালায় মাত্রাহীন শোষণ, আত্মসাৎ করে তাদের উদ্বৃত্ত শ্রমফল, যা রূপ পায় মূলধনে (সোনার তালে)। বঞ্চিত, অত্যাচারিত মজুরেরা মনে মনে ক্ষুব্ধ হয় কিন্তু শিক্ষা ও সংগঠনের অভাবে গড়ে তুলতে পারে না প্রতিবাদ, প্রতিরোধ। কালক্রমে শ্রমিক শ্রেণীর বাইরে থেকে শিক্ষিত, সচেতন মানুষ তাদের মধ্যে এসে সঞ্চার করে চেতনা ও সন্দীপনা (নন্দিনী যার প্রতীক); অভ্যুদয় হয় নেতৃত্বের (রঞ্জন যার প্রতিনিধি)। মালিক চেষ্টা করে এক দিকে সন্ত্রাস এবং অন্যদিকে সম্মোহনের (গোঁসাইজী এবং অধ্যাপক যার মাধ্যম) সাহায্যে শ্রমিকদের শান্ত রাখতে। অবস্থা যখন চলে যায় আয়ত্তের বাইরে, মালিকপক্ষ তখন হত্যা করে নেতৃত্বকে। নেতৃত্বের মৃত্যু ঘটলেও মৃত্যু ঘটে না শ্রমিক সংগ্রামের। এই মৃত্যুহীন সংগ্রামেরই প্রতীক হ'ল রক্ত-বৈজয়ন্তী (এখানে রক্তকরবী)।

আলোচ্য নাটকটিতে কবি যে মেহনতি মানুষের ছবি এঁকেছেন, তারা যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনস্থ মজুরিশ্রমিক, তাতে কোনও সংশয় নেই। তিনি কেবল তাদের প্রতি নিষ্ঠুর বঞ্চনা, নির্মম অত্যাচার এবং অমানুষিকীকরণের প্রক্রিয়াটিকেই তুলে ধরেননি, সেই সঙ্গে এই মনুষ্যত্বঘাতী ব্যবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্য সংগ্রামের একটি চিত্রও তুলে ধরেছেন, যদিও সেই চিত্রটি যতটা ভাববাদী ততটা বাস্তববাদী নয়।

জীবন-সায়াহ্নে এসে কবি আমাদের উপহার দেন দুটি অনবদ্য কবিতা : 'ঐকতান' এবং 'ওরা কাজ করে'। কালানুক্রমিক ভাবে পরে হলেও আমি দ্বিতীয়টির উল্লেখ করব আগে। এই কবিতাটিতে কবি তাঁর তুলির মত কলমের মুখে এঁকেছেন শ্রমজীবী মানুষের আবহমান জীবনের জীবন্ত চলচ্চিত্র এবং সেইসঙ্গে গেয়েছেন তার জয়গান—"শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ পরে, ওরা কাজ করে।" গভীর উপলব্ধির নিবিড় প্রকাশ ও প্রত্যয়ের এমন কবিতা এমন কি রবীন্দ্র কাব্যেও বিরল। 'ঐকতান' কবিতাটি আত্মদর্শনমূলক সেই সঙ্গে ভাবীকালের কবিদের পথ-প্রদর্শনমূলকও বটে। ১৯৪১ সালের ২১ জানুয়ারি, মৃত্যুর মাত্র ছ'মাস আগে লেখা এই কবিতাটিতে নিজের কবি-জীবনের সমালোচনা করে তিনি লেখেন :

> "চাষি খেতে চালাইছে হাল,
> তাঁতি ব'সে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল—
> মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে,
> ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।
> আমার কবিতা, জানি আমি,
> গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।"

তবু চাষি-জীবনের, তাঁতি জীবনের যতটা কাছাকাছি তিনি গিয়েছিলেন, কারখানা-মজুরের জীবনের ততটা কাছাকাছি তিনি কখনও যান নি। তাছাড়া তাঁর জীবনকালে আমাদের দেশে তেমন কোনও বিরাট আকারের শ্রমিক-সংগ্রামও হয়নি, যেমন হয়েছিল, ধরা যাক, রাশিয়ায়, আর লেনিন কিংবা তার কাছাকাছি কোনও ভারতীয় মার্কসবাদী তত্ত্ববিদের সঙ্গও তিনি পাননি। যেমন পেয়েছিলেন, ধরা যাক, গোর্কি। কি বাস্তব জীবনের দিক থেকে, কি আত্মিক জীবনের দিক থেকে, তিনি ছিলেন আধুনিক শ্রমিক শ্রেণী থেকে অনেক দূরে। এই উভয়বিধ দূরত্বকে অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাথ যে 'রক্তকরবী'র মত কাব্যনাটক রচনা করতে পেরেছিলেন, সেইটাই আশ্চর্য। আরও আশ্চর্য যে, নিজের অসম্পূর্ণতা উপলব্ধি করে তিনি নীরব হয়ে না গিয়ে, সরবে আহ্বান জানিয়েছেন ঠিক তাঁদেরই, যাঁরা সম্পূর্ণ করতে পারেন তাঁর এই অসম্পূর্ণ

কাজ। তিনি আহ্বান জানিয়েছেন সেই কবিকে, যে কবি "কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন", "যে আছে মাটির কাছাকাছি"।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথ কেবল বিশ্বমানবিকতার বৈতালিক ও বাণীবাহকই নন, সেই সঙ্গে নিঃস্ব মানবিকতার ('প্রলেটারিয়ান হিউম্যানিজম'-এর) কবির আহ্বায়ক এবং পথপ্রদর্শকও বটেন। আমাদের দুঃখ, তাঁর আহ্বানে সাড়া দেবার মত, তাঁর প্রদর্শিত পথে এগোবার মত কবি আমাদের মধ্যে নেই ; সাহিত্যিক "শৌখিন মজদুর" অনেকে আছেন, কিন্তু আসল মজদুর কোথায় ? আমাদের লজ্জা, তাঁর কবিতা পড়ে বুঝবার মত শ্রমজীবী বাঙালির সংখ্যা আজও সংখ্যায় সামান্য, বেশির ভাগকেই কেবল কানে শুনে তৃপ্ত থাকতে হয়, কেননা স্বাধীনতার অর্ধশতকের চৌকাঠে এসেও আমরা তাদের করে তুলতে পারিনি সাক্ষর ও শিক্ষিত।

১৩.৫.৮৬

পঁচিশে বৈশাখে বাইশে শ্রাবণের কথা

জন্মদিনের উৎসবে মৃত্যুদিনের কথা বলা সাধারণতঃ অশোভন। কিন্তু যিনি মৃতুর মুখে তুড়ি মেরে বলতে পারেন, "আমি মৃত্যু চেয়ে বড়ো'—এই শেষ কথা বলে, যাব আমি চলে" তাঁর মৃত্যু তো অমৃতত্বে প্রবেশ। সেই হিসাবে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের বয়স এখন মৃত্যুর চেয়ে পঁয়তাল্লিশ বছর বেশি। এবং অনাগতকালে প্রতি বছর মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর বয়সের এই ব্যবধান যে ক্রমেই বেড়ে যাবে, তাতে সন্দেহ নেই। সুতরাং পঁচিশে বৈশাখ উপলক্ষে বাইশে শ্রাবণের কথা বলায় অন্ততঃ তাঁর ক্ষেত্রে কোনও বেমানান ব্যাপার নয়।

আমি অবশ্য এখানে এই প্রসঙ্গটির অবতারণা করছি একটি বিশেষ কারণে। 'বিশ্বভারতী' কর্তৃক সম্প্রতি-প্রকাশিত একখানা বইতে কবির মৃত্যু-দিবস একটি ঘটনা প্রসঙ্গে আমার নামোল্লেখ করা হয়েছে। ঘটনাটি যে ব্যাপক কৌতূহল সৃষ্টি করেছে, এ সম্পর্কে আমার কাছে লেখা বিপুল সংখ্যক পত্রই তার প্রমাণ। পত্রগুলির বক্তব্য মোটামুটি এই : চিন্মোহন সেহানবীশের লেখা সম্প্রতি প্রকাশিত বইতে উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯৪১ সালের ২২শে শ্রাবণ তখনকার দিনে বেআইনি কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে আপনি এবং আপনার সঙ্গে আরো দু'জন রবীন্দ্রনাথের মরদেহে মাল্য অর্পণ করেছিলেন। সেই দিনটির কথা, বিশেষ করে এই মাল্য অর্পণের ঘটনাটির কথা যদি একটু সবিস্তারে বলেন তো বাধিত হ'ব।—এই অনুরোধের উত্তরেই আজকের এই লেখা।

শুরুতেই বলে নেওয়া ভাল যে, আজ থেকে সাড়ে চার দশক আগেকার সেই দিনটির সব কিছু এখন আর আমার বিস্তারিতভাবে মনে নেই। পরের দিন অর্থাৎ ২৩শে শ্রাবণ আগের দিনের ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে আমার বোনের কাছে যে পত্র দিয়েছিলাম, সেটিও তার কাছ থেকে খোয়া গিয়েছে। সুতরাং যতটা মনে আছে, তাই এখানে সংক্ষেপে উপস্থিত করব। তার আগে যাঁর মাধ্যমে পার্টির নির্দেশ পেয়েছিলাম এবং যাঁর নেতৃত্বে আমরা কবির মরদেহে মালা দিয়েছিলাম, সেই অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্যের কথা একটু বলে নেব। বস্তুতঃ পক্ষে, কয়েক বছর আগে তাঁরই স্মরণসভায় স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে আমি এই মালা দেওয়ার ঘটনার কথা বলি। কারো কাছ থেকে শ্রদ্ধেয় চিনুদা (চিন্মোহন সেহানবীশ) সেই বিবরণ শুনে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে ঘটনাটা জেনে নেন। এবং সেটাই তিনি তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত বইয়ে উল্লেখ করেছেন।

অন্নদার সঙ্গে আমার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা সহপাঠী এবং সহ-আবাসিক হিসাবে—একই পার্টির সদস্য হওয়ায় যা পরবর্তীকালে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। আমরা পড়তাম

স্কটিশ চার্চ কলেজে, থাকতাম কৈলাস বোস স্ট্রীটের একটি প্রাইভেট বোর্ডিং-এ। যে রুমে আমি এবং আমার আ-কৈশোর বন্ধু মৃণাল সেন (অধুনা বিশ্বখ্যাত চিত্র পরিচালক) ছিলাম, সেই রুমটিরই বাকি অংশের অধিকারী ছিলেন 'ছাত্র অভিযান' পত্রিকার সম্পাদক বারীন রায় এবং উদীয়মান ছাত্রনেতা অন্নদাশঙ্কর। এই চারজন বাদেও মাঝে মধ্যে রাতের বেলায় আশ্রয় নিতেন বেআইনি কমিউনিস্ট পার্টির আত্মগোপন-কারী কোনো কোনো নেতা। তাছাড়া, আমাদের রুমটি ব্যবহৃত হ'ত পার্টির যোগাযোগ-কেন্দ্র হিসাবে। পার্টি-নেতৃত্বের নানা নির্দেশ, পার্টির নানা ইস্তাহার ও পুস্তিকা এই কেন্দ্রের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ত বিভিন্ন জায়গায়। বারীন রায়কে বাদ দিয়ে, সবচেয়ে সক্রিয় ছিল অন্নদা। সে ছিল তখন পার্টির প্রার্থী-সদস্য। আমরা সক্রিয় কর্মী। অন্নদাশঙ্করের মাধ্যমেই আমরা জানতে পারতাম পার্টি-নেতৃত্বের নির্দেশ।

ক'দিন ধরেই কলকাতার হাওয়া ছিল খুব ভারি। রটে গিয়েছিল, কবির অবস্থা ভাল নয়। বাসে-ট্রামে পথে-ঘাটে সর্বত্রই আলোচ্য বিষয় একটাই—কবি কেমন আছেন ? কলেজে ক্লাস বসছে, তবে হচ্ছে না। অধ্যক্ষ ক্যামেরন নিরন্তর যোগাযোগ রক্ষা করছেন ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে। অধ্যাপক বা ছাত্রদের কেউ না কেউ কিছুক্ষণ বাদে বাদে তাঁর ঘরে ঢুকে সর্বশেষ অবস্থা জেনে নিয়ে, বাইরে এসে তা জানিয়ে দিচ্ছেন প্রতীক্ষমান সমাবেশকে। একুশে শ্রাবণ রাতে খবর ছড়িয়ে পড়ল, চিকিৎ-সকেরা আশা ছেড়ে দিয়েছেন ; অবস্থা এখন-তখন। পরের দিন ভোরে কাগজ থেকে জানলাম, এখনো আছেন, তবে····। ছুটে গেলাম কলেজে। গিয়ে দেখলাম, ইতিমধ্যেই অনেকে পৌঁছে গিয়েছে সেখানে। ফিস ফিস কথা, থমথমে ভাবে। মাঝে মাঝে অধ্যক্ষের ঘর থেকে কেউ না কেউ জানিয়ে দিচ্ছেন, 'Sinking'····'Still sinking'····। তার পরে একসময় গম্ভীর মুখে, সজল চোখে বেরিয়ে এলেন স্বয়ং ক্যামেরন। বাষ্প্যরুদ্ধ কণ্ঠে কোনও ক্রমে বললেন, 'The poet is no more!' ···

কিছুক্ষণের মধ্যে কলেজের ছাত্রছাত্রীরা সমবেত হলাম এক মিছিলে। ইতিমধ্যেই বেরিয়ে গিয়েছে কোনও একটি কাগজের বিশেষ সংখ্যা—পাতা জুড়ে রবীন্দ্রনাথের ছবি সেই সঙ্গে রবির অস্তগমনের সংবাদ ও সময়। মিছিলের সামনে কালো পাড়ে ঘেরা কবির একটি বৃহৎ প্রতিকৃতি; মিছিলের মধ্যে হাতে হাতে ঐ কাগজে প্রকাশিত ছবি! মৌন মিছিল পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল ঠাকুরবাড়ির পথে। রাস্তার দু'ধারে দোকান-পাট সব বন্ধ, স্তব্ধ। কাতারে কাতারে মানুষ চলেছে ঐ একই দিকে। অনেকে এসে যোগ দিল আমাদের মিছিলে। কলেজি চরিত্র হারিয়ে মিছিলটি হয়ে পড়ল সার্বজনিক। শেষ পর্যন্ত আমাদের মিছিলও ভেঙে গেল সেই উত্তাল জনতরঙ্গে।

যে কোন ভাবেই হোক ঢুকে পড়তে হবে ঠাকুরবাড়িতে, কবিকে দেখতে হবে শেষ বারের মত। একা ভিড় কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় অন্নদাশঙ্কর পিছন থেকে এসে টেনে ধরল, "নির্দেশ এসেছে উপর থেকে, মালা দিতে হবে কবির দেহে পার্টির নামে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বের হবে শোক মিছিল; সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ দিয়ে ঘুরে যাবে কলেজ স্ট্রিটে, আমরা মালা দেব সিনেট হলের সামনে। যেখানেই যাও ঐখানে অবশ্যই হাজির থেকো।"

তারপরে কিভাবে ঠাকুরবাড়িতে ঢুকলাম, দোতলায় উঠে চির শায়িত কবির দর্শনলাভে অভিভূত ও ধন্য হলাম, সে আরেক কাহিনী। শোক-মিছিল বের হ'ল দুপুরের পরে। বিরাট বিশাল মিছিল! দারুণ গরম—দু'পাশের বাড়িগুলির দোতলা-তেতলা থেকে মিছিলের উপরে বর্ষিত হতে থাকলো সুগন্ধি জল ও ফুলের পাপড়ি। আকাশে মেঘ, মাঝে মাঝে বৃষ্টিও পড়ছিল ফোঁটা ফোঁটা। শবদেহের উপরে ক্রমেই জমে উঠছিল ফুলের স্তবক ও মালার পাহাড়। ক্রমে ক্রমে মিছিল এসে পৌছালো সিনেট হলের সামনে। মালা নিয়ে অন্নদা আগেই হাজির ছিল সেখানে। আমি ছুটে গেলেই সে সঙ্গে সঙ্গে একটা সাদা কার্ড এগিয়ে দিল আমার হাতে, বলল, শিগগির লিখে দাও 'HOMAGE TO THE GREAT POET—C.P.I.'। লিখে দিয়ে সেটা সেফটিপিন দিয়ে এঁটে দিলাম মালার সঙ্গে—এবং আমরা তিনজনে মিলে সেই মালা অর্পণ করলাম কবির পায়ের দিকে। এবং তার পরে মিশে গেলাম মিছিলের মধ্যে। এই 'আমরা তিনজনের' মধ্যে একজন অন্নদা, দ্বিতীয়জন আমি কিন্তু তৃতীয়জন কে? সত্যি বলতে কি, আমার একেবারে মনে নেই। মৃণাল হলে নিশ্চয়ই মনে থাকতো। তবে কে? প্রভাকর সেন (অধ্যাপক)? প্রভাকর আমাদের এক ক্লাস নিচে পড়ত এবং 'স্টুডেন্টস ফেডারেশন'-এর কাজে অংশও নিতো। পরে স্কটিশ চার্চ কলেজে অধ্যাপনা করে, এখন কোথায় জানি না। হতে পারে প্রভাকর কিংবা আর কোনও 'কমরেড'।

মিছিলের পায়ে পায়ে শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌছুলাম নিমতলা ঘাটে। সেখানে তখন যে দৃশ্য তা বর্ণনাতীত। প্রত্যেকেই প্রত্যেককে এড়িয়ে ঢুকতে চেষ্টা করছে মহাশ্মশানের অভ্যন্তরে। ঐ ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ কাছাকাছি এসে গেলাম মৃণাল এবং আমি। দু'জনে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করতে চোখ পড়ল এক মর্মস্পর্শী দৃশ্য—এক পিতা তাঁর মৃত পুত্রের দেহকে কোলে নিয়ে বারবার চেষ্টা করছেন এগোতে, বার বারই পিছিয়ে আসছেন ভিড়ের ধাক্কায়; শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে ছিটকে পড়লেন জানি না। মৃণালের কাছে পরবর্তীকালে শুনেছি, পরিচালক জীবনে 'বাইশে শ্রাবণ' নামে যে ছবি সে তুলেছে, তার পিছনে পরোক্ষভাবে কাজ করেছিল এই

অভিজ্ঞতা।...তা হোক, আমার মনে তখন জিদ চেপেছে, এসেছি যখন, ভিতরে যাবই। ভাল সাঁতার জানতাম। গঙ্গায় নেমে কিছুটা সাঁতার কেটে এগিয়ে গিয়ে ঘুরে এসে একটি জলের পাইপ বেয়ে উঠে গেলাম শ্মশানবাড়ির উপরে—একেবারে ছাদে। সেখানে কার্নিশে বসে দর্শন করলাম রবির মরদেহের চির-অবসান. নদীর ওপারে "ওই যেথা জলে সন্ধ্যার কূলে দিনের চিতা", তখন এপারে 'এই হেথা জলে গঙ্গার কূলে' কবির অবশেষ।....তার পরে টিপ টিপ বৃষ্টি এবং তার মধ্যে আবিষ্ট মনে বোর্ডিং-এ প্রত্যাবর্তন।

উল্লিখিত অনুচ্ছেদটি বাদ দিলেও হ'ত, কিন্তু বাদ দেওয়া গেল না, এই কারণে যে. চিনুদার বইয়ে এ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তার একটা অংশ সম্ভবতঃ ঠিক নয়। সিনেট হলের সামনে মালা দেবার কথা সঠিকভাবে উল্লেখ করার পরে, তিনি যোগ করেছেন, "এঁদের মধ্যে অন্নদাশঙ্কর নিমতলা ঘাটে গিয়েও দিয়ে এসেছিলেন ফুলের স্তবক।" এই সংযোজিত অংশটির উৎস কে বা কি আমি জানি না। অন্ততঃ আমি নই বা আমার কোন বক্তব্যও নয়! আমি নিশ্চিতভাবে জানি অন্নদাশঙ্কর ভিতরে ঢুকতে পারেনি। বাইরেও মালা দেবার মত অবস্থা ছিল না, আর তা ছাড়া তার প্রয়োজনও ছিল না। একবার যখন দেওয়া হয়ে গিয়েছে, আরেকবার কেন? আগেই বলেছি, আমরা একসঙ্গে থাকতাম, এই নিমতলায় গিয়ে দ্বিতীয়বার মালা দেবার কথা কখনও সে আমাদের বলেনি।

ঐ সপ্তাহেই কলেজে অনুষ্ঠিত হয় কবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। সেই সভায় অন্যতম বক্তা হিসাবে অন্নদাশঙ্কর কবির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে যেসব প্রস্তাব করেছিল, তার একটি ছিল অভিনব। সেটি উল্লেখ করেই এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করব। অন্নদা বলেছিল, "আসুন আমরা সকলে মিলে প্রস্তাব গ্রহণ করি যে, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমরা যখনি কিছু বলব, তখন আমরা অতীতকাল ব্যবহার না করে সব সময়েই ব্যবহার করব বর্তমান কাল, যেন তিনি আমাদের মধ্যেই আছেন।" অন্নদাকে প্রশ্ন করেছিলাম, "এই প্রস্তাব কি পার্টির, না তোমার?" সে শুধু হেসেছিল, জবাব দেয়নি। যাই হোক, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমরা বর্তমান কাল ব্যবহার করি, আর না করি, তিনি যে আমাদের মধ্যে চির-বর্তমান, তা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

২০.৫।৮৬

কবির মুখে কবির কথা ঃ
'রবীন্দ্র-কবিতার প্রাসঙ্গিকতা'

কবির মুখে কবির কথা শুনবার আগ্রহে সে দিন গিয়েছিলাম শিশির মঞ্চে। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মুখে রবীন্দ্রনাথের কথা। বিষয় ঃ 'রবীন্দ্র কবিতার প্রাসঙ্গিকতা'।

সংক্ষিপ্ত ও বিষয়োচিত ভূমিকার পরে নীরেন্দ্রবাবু সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে এসে গেলেন তাঁর আলোচ্য প্রসঙ্গে ; প্রশ্ন করলেন, কবিতার প্রাসঙ্গিকতা বিচার করব আমরা কোন্ মাপকাঠিতে ?

উত্তরে বললেন, আমার বিচারে মাপকাঠি তিনটি। প্রথমতঃ, তা আমার আনন্দকে সমর্থন করে কিনা। দ্বিতীয়তঃ, তা আমাকে শোকে সান্ত্বনা দেয় কিনা। এবং তৃতীয়তঃ, তা আমাকে সংগ্রামে সাহস যোগায় কিনা।

তাঁর মতে, যে কবিতা এ তিনটি জিনিস করে, তাই প্রাসঙ্গিক। অতএব, রবীন্দ্রনাথের কবিতা যদি এ তিনটি জিনিস করে, তাহলে তা অবশ্যই প্রাসঙ্গিক। সুতরাং আমাদের দেখতে হবে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আমার আনন্দকে সমর্থন করে কিনা, আমাকে শোকে সান্ত্বনা দেয় কিনা এবং আমাকে সংগ্রামে সাহস যোগায় কিনা।

প্রথমতঃ আনন্দের সমর্থন। তিনি বললেন, এ জিনিসটি আমরা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পাই অপরিমেয়ভাবে। যখনি কোন কিছু দেখে আমাদের মনে আনন্দ-ভাবের উদয় হয়, তখনি তার সানন্দ সমর্থন পাই রবীন্দ্রনাথের কবিতায়। শরৎকালের প্রভাতে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি। আকাশে নজরে পড়ল রঙের খেলা। মনে উঠল আনন্দের আলোড়ন। সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে গুনগুনিয়ে উঠল কবির একটি কবিতা। তার মধ্যে পেলাম আমি আমার আনন্দের সমর্থন। (একটি কবিতার কয়েকটি পঙক্তি তিনি উদ্ধৃতও করেছিলেন, কিন্তু আমার মনে নেই।)

দ্বিতীয়তঃ, শোকের সান্ত্বনা। নীরেন্দ্রবাবু বললেন, এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের কবিতা তো এক অফুরান উৎস। দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি উল্লেখ করলেন, তখন আমি নানা দিক থেকে আঘাতে আঘাতে বিপর্যস্ত। শোকে অভিভূত। এমন এক মানসিক বিষাদের চরম অবস্থায় পাতা ওলটাচ্ছিলাম রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার বইয়ের— 'ক্ষণিকা'-র। চোখ, এবং সেই সঙ্গে অবশ্যই মন, আটকে গেল একটি কবিতায়, নাম 'বোঝাপড়া'।

'মনেরে আজ কহ যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যরে লও সহজে।'

কবিতাটি তিনি আবৃত্তি করলেন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এবং বললেন, তাঁর চরম শোকের সময়ে এই কবিতাটি তাঁকে দিয়েছিল পরম সান্ত্বনা, দিয়েছিল শক্তি। আক্ষেপ করলেন, 'সঞ্চয়িতা'-য় এই কবিতাটি স্থান পায়নি বলে।

তৃতীয়তঃ, এবং সর্বশেষে, সংগ্রামে সাহস। সংগ্রামের পথে সাহস ও উদ্দীপনা সঞ্চারের এমন কবি এখনো কোথায় ? প্রসঙ্গতঃ, নীরেনবাবু উল্লেখ করলেন এক প্রবীণ স্বাধীনতা-সংগ্রামীর অভিজ্ঞতার কথা—যেমনটি তিনি তাঁর মুখে শুনেছেন। অকথ্য নির্যাতনে নির্যাতিত, দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত এই সংগ্রামীর মনে এক সময়ে দেখা দিল এক চরম ব্যর্থতা-বোধ—বুঝি আর কিছুই হবে না। নৈরাশ্যে ও অবসাদে মুহ্যমান, তখন তিনি বিমূঢ়, বিভ্রান্ত—তবে কি ছেড়ে দেবেন এই সংগ্রামের পথ, মেনে নেবেন পরাধীনতাকে অমোঘ ভাগ্যলিপি বলে ? এই সময়ে ঘটনাচক্রে তাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট হ'ল কবির 'দুঃসময়' কবিতাটির দিকে।

'যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে
সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া
....
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।'

কবিতাটি পড়েন আর পড়েন। যত পড়েন, তত রোমাঞ্চিত হন, উদ্দীপিত হন। ফিরে আসে সংগ্রামের পথে বিশ্বাস ও সাহস। কী অসাধারণ এই কবিতা! কোনো আশা নেই, আশ্বাস নেই, আছে কেবল 'সুচির শর্বরী'-র অব্যাহত অস্তিত্বের কথা, তবু সংগ্রামের পথে কী সন্দীপনী আহ্বান !

'আছে শুধু পাখা, আছে মহানভ-অঙ্গন
উষা দিশাহারা নিবিড় তিমির-আঁকা।
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।'

....এর পরেও কি সংশয়ের বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকে রবীন্দ্র কবিতার প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে ? স্বভাবতই নীরেনবাবু সোচ্চারে ঘোষণা করেন, রবীন্দ্র কবিতা কেবল প্রাসঙ্গিকই নয়, দারুণভাবে প্রাসঙ্গিক !

তারপরে নীরেনবাবু রবীন্দ্র কবিতার প্রাসঙ্গিকতা বিচার করেন আরেক দিক থেকে। ক্রমাগত নিজেকে অতিক্রম করার, বৃহত্তরের মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করার,

ব্যক্তির যে চিরন্তন প্রয়াস তথা সাধনা, তার দিক থেকে। তিনি বলেন, শুরুতে প্রত্যেকেই থাকি কূপমণ্ডুক এবং ঐ কূপের ঠিকানাই আমার পরিচয়। যেমন আমি অমুক পরিবারের, অমুক গ্রামের মানুষ। তারপরে যখন নিজের জেলার বাইরে অন্য জেলায় যাই, তখন পরিচয় হয় জেলার পরিচয়ে। ক্রমে ক্রমে গণ্ডি যায় বেড়ে···জেলার পরে রাজ্য, রাজ্যের পরে দেশ। চক্রবর্তী থেকে হিন্দু; হিন্দু থেকে বাঙালি; বাঙালি থেকে ভারতীয়। তার পরে? উপরে যদি কেউ থাকেন, মরার পরে যদি তাঁর ওখানে যাই আর তিনি যদি প্রশ্ন করেন, কোথা থেকে? তখন আর দেশের পরিচয়েও পরিচয় নয়। আমার উত্তর হবে, পৃথিবী থেকে। রবীন্দ্র কবিতায় আমরা পাই এই নিজেকে অতিক্রমণের, ক্ষুদ্র থেকে বৃহতে, মহতে, উত্তরণের বাণী। আর এই বাণীই তো মনুষ্যত্বের প্রকাশের ও প্রসারের চির প্রাসঙ্গিক বাণী; সুতরাং রবীন্দ্র কবিতা যে আজও প্রাসঙ্গিক আছে, এবং ভবিষ্যতেও থাকবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

নীরেন্দ্রবাবু তাঁর কবিজনোচিত ভাষায় ও ভঙ্গিতে অত্যন্ত সুন্দর ও সার্থকভাবে উপস্থিত করেন তাঁর মূল্যবান বিশ্লেষণ। বাস্তবিক পক্ষে, সভাকক্ষে যখন তাঁর স্বর-সমৃদ্ধ কণ্ঠে শুনছিলাম তাঁর ভাব-সমৃদ্ধ ভাষণ, তখন আমি আবিষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু পরে ক্ষোভ হয়েছে, যতটা তিনি বলেছেন, তার চেয়ে বেশিটাই তিনি বলেননি। তিনি বলেছেন ব্যক্তি-জীবনে রবীন্দ্র-কবিতার প্রাসঙ্গিকতার কথা। কিন্তু সে ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য মেনে নিয়েও সবিনয়ে প্রশ্ন করা যায়, প্রাসঙ্গিকতার বিচারে যে মাপ-কাঠিগুলি তিনি প্রয়োগ করেছেন, সেগুলির প্রেক্ষিতে সমস্ত মহৎ কবিই কি প্রাসঙ্গিক নন? আর তাই যদি হন, তবে রবীন্দ্র কবিতার বৈশিষ্ট্য কোথায়—কোথায় তার অনন্যত্ব?

আমার আরও ক্ষোভ এই কারণে যে, স্বদেশের সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে, এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে রবীন্দ্র-কবিতার প্রাসঙ্গিকতার প্রশ্ন নীরেনবাবুর আলোচনায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। আলোচনায় অনুপস্থিতি অবশ্য প্রাসঙ্গিকতার অস্বীকৃতি নয়, তবু আলোচক আর কেউ নন, দেশের জীবিত কবিদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি স্বয়ং নীরেন্দ্রনাথ, সেই হেতু এই অনুপস্থিতি অর্থবহ হয়ে ওঠে।

সব সমস্যার উল্লেখ এবং প্রত্যেকটির প্রেক্ষিতে রবীন্দ্র কবিতার প্রাসঙ্গিকতা বিচার আমার প্রত্যাশা নয়। কিন্তু এই মুহূর্তে যে সমস্যাগুলি সবচেয়ে প্রকট, সবচেয়ে জরুরি, সেগুলি সম্পর্কে রবীন্দ্র-কবিতার প্রাসঙ্গিকতার অন্ততঃ সংক্ষিপ্ত উল্লেখ নিশ্চয়ই খুব বেশি কিছু প্রত্যাশা নয়। নমুনা হিসাবে উল্লেখ করা যায় দেশের কোনো কোনো

অংশে তথাকথিত নিম্নবর্ণের লোকদের উপরে তথাকথিত উচ্চবর্ণের লোকদের নৃশংস অমানুষিকতার সামাজিক সমস্যার কথা। উল্লেখ করা যায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদী তাণ্ডবের রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার কথা। উল্লেখ করা যায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পারমাণবিক যুদ্ধের জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দানবিক প্রস্তুতির সমস্যার কথা। এবং এই সমস্যাগুলির প্রেক্ষিতে নিশ্চয়ই উল্লেখ করা যেতে পারে রবীন্দ্র-কবিতার প্রাসঙ্গিকতার কথা।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, উল্লিখিত সামাজিক সমস্যার প্রসঙ্গে আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের 'অপমানিত' কবিতাটি।

'দেখিতে পাও না তুমি মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে
অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহংকারে।
সবারে না যদি ডাক, এখনো সরিয়া থাক,
আপনারে বেঁধে রাখ চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান—
মৃত্যু-মাঝে হবে তবে চিতা ভস্মে সবার সমান।'

—কবির এই হুঁশিয়ারি আজ যে কী নিদারুণ প্রত্যাসন্ন বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে, তা আর চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর দরকার হয় না।

ঠিক তেমনি উল্লিখিত জাতীয় সংহতি তথা বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রসঙ্গে করুণভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে কবির বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের বাণীটি, যা বিবৃত আছে 'মহাজাতি সদন' নামটির তাৎপর্যে, 'মহামানবের সাগর-তীর' হিসাবে ভারতের বর্ণনায়, এবং বহু কবিতায় ও গানে। কবির অকম্পিত কণ্ঠস্বর আমাদের অন্তরে সৃষ্টি করে এই অবিচল আশ্বাস যে, অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গের মধ্যে এই অন্ধ আঘাত-প্রত্যাঘাতের পালা শেষ হবে। এবং

'দুঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান
জন্ম লভিবে কী বিশাল প্রাণ
....
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।'

বিশ্বকর্তৃত্ব-লোলুপ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আজ যখন জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে চালিয়ে যাচ্ছে পারমাণবিক যুদ্ধের দানবিক প্রস্তুতি, সামরিক খাতে ব্যয় করে চলেছে অপরিমেয় অর্থ ও সম্পদ, মার্কিন রাষ্ট্রপতি থেকে থেকে হুঙ্কার ছাড়ছেন বিশ্ববাসীর মনে ত্রাস সৃষ্টি করে লক্ষ্যসিদ্ধির অভিসন্ধিতে। তখন কি দেশে দেশে ত্রস্ত মানুষদের মনে

আশ্বাস সঞ্চারের জন্য, বিশ্ব শান্তির সংগ্রামীদের মনে বিশ্বাস সঞ্চারের জন্য, প্রবলভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেনা কবির সেই 'বরাভয়' ঘোষণা :

'শুনি তাই আজি
মানুষ-জন্তুর হুহুংকার দিকে দিকে উঠে বাজি।
তবু যেন হেসে যাই যেমন হেসেছি বারে বারে
... মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে
তারে হাস্য হেনে বলে যাব – এ প্রহসনের
মধ্য রাতে হবে শেষ দুষ্ট স্বপনের ;
....
বলে যাব, দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিহাসে শাশ্বত অধ্যায়।'

আর মাত্র একটি বিষয় উল্লেখ করে এই লেখাটা শেষ করব। আজ ২৫শে মে, 'আফ্রিকা দিবস'। এক দিকে যুগ-যুগ-ব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক লুণ্ঠিতা ধর্ষিতা আফ্রিকার সর্ব্বরিক্ত উত্তরাঞ্চলের বিস্তৃত ভূখণ্ড জুড়ে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ-কবলিত মানুষদের জন্য যথাসাধ্য সাহায্য প্রেরণ এবং অন্যদিকে তার দক্ষিণাঞ্চলের শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদের অপজাত সন্তান 'প্রেটোরিয়া সরকার'-এর দানবীয় অত্যাচার ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে 'জীবন-পণ' সংগ্রামে রত অকুতোভয় কৃষ্ণাঙ্গ জনগণের সঙ্গে সংগ্রামী সংহতি ঘোষণার দিন। এই দিনটিতে কি বিশেষ করে মনে পড়ে না রবীন্দ্রনাথের 'আফ্রিকা' কবিতাটি? আজও কি দারুণভাবে প্রাসঙ্গিক নয় কবির সেই রক্তঝরা বর্ণনা :

'এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে
নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে,
এল মানুষ ধরার দল
গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে।
সভ্যের বর্বর লোভ
নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা ?'

প্রাসঙ্গিক নয় কি 'দানবের সাথে সংগ্রামের তরে প্রস্তুত হতেছে যারা ঘরে ঘরে' তাদের প্রতি কবির আহ্বান ?

উপসংহারে আমার অনুরোধ এই যে, নীরেনবাবুর বক্তৃতা-প্রসঙ্গে আমার এই লেখাটি যেন কেউ ভুল না বোঝেন। আমি তাঁর কবিতার একজন শ্রদ্ধাশীল পাঠক। তাঁর কাছ থেকে যতটা আশা করেছিলাম, ততটা পাইনি বলেই আমার ক্ষোভ। আর এই লেখা সেই ক্ষোভেরই প্রকাশ।

২৭।৫।৮৬

রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে কমিউনিস্টদের কথা ও কাজ

রবীন্দ্রনাথের প্রতি মার্কসবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে অনেকের মনে কিছু ভুল ধারণা চালু আছে। তাই আমার, এবং আমার মত অন্যান্যদের, লেখায় তাঁরা যখন ভিন্নতর কিছু পান, বিশেষ করে যখন জানতে পারেন যে, বে-আইনি ঘোষিত হয়ে আত্মগোপন করে থাকার অবস্থায় সেই ১৯৪১ সালেও কমিউনিস্ট পার্টি রবীন্দ্রনাথের মৃতদেহে মাল্যার্ঘ্য নিবেদন করেছিল, তখন তাঁরা সবিস্ময়ে সকৌতূহলে নানা প্রশ্ন করেন। উল্লেখ্য যে, এই মাল্যদানের দায়িত্ব যে তিন জনের উপরে ন্যস্ত হয়েছিল, আমি সেই ভাগ্যবানদের একজন।

জিজ্ঞাসু বন্ধুদের প্রশ্ন মোটামুটি দুটি। প্রথমতঃ, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমি যে বক্তব্য রাখি, তা কি সাধারণভাবে মার্কসবাদীদের বক্তব্য, নাকি আমার ব্যক্তিগত বক্তব্য? দ্বিতীয়তঃ, আমাদের হাত দিয়ে কবির মৃতদেহে মাল্যদান কি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পূর্বাপর মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, নাকি একটি ব্যতিক্রম—'ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুতে পতাকা অবনমিত করার মত'?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে, আমার বক্তব্য এই: রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মূল্যায়ন মানে তাঁর সমগ্র জীবন-সাধনা এবং সাহিত্য ও শিল্প-সাধনা সম্পর্কে মূল্যায়ন। তা করার মত অধিকার আমার নেই। আমি কেবল তাঁর কাব্যের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু বিনীত বক্তব্য রেখেছিলাম। সেই বক্তব্যের সঙ্গে সাধারণভাবে মার্কসবাদীরা একমত হবেন কিনা জানি না। তবে আমার বিশ্বাস আমার বক্তব্য মার্কসবাদ-সম্মত।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে আমি সোচ্চারে বলতে চাই যে, কবির মৃতদেহে মাল্যদান, তথা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে একটা আচমকা ঘটনা নয়, অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। ত্রিশের দশকের শেষাশেষি থেকে সত্তর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত আমি প্রথমে সি পি আই-এর এবং পরে সি পি আই (এম)-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলাম এবং আমি জানি কমিউনিস্টরা আগেও যেমন রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, এখনও তেমনি আছেন।

এ কথা সত্য যে '৪৮ সালে পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের পরে জনৈক নেতা নিজের পদাধিকারের সুযোগ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতি অশ্রদ্ধাসূচক একটি 'লাইন' পার্টির কাঁধে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। সে সময়ে পার্টির তত্ত্বগত মুখপত্র 'মার্কসবাদী'-তে কয়েকটি তীব্র রবীন্দ্রবিরোধী লেখাও প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু ঐ নেতা বা তার মুষ্টিমেয় অনুগামীদের সেই অপচেষ্টা কখনও সফল হয়নি। পার্টি যেমন

তাঁর রাজনৈতিক লাইনকেও মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুত বলে প্রত্যাখান করেছিল, তাঁর সাংস্কৃতিক লাইনকেও তেমনভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল। সুতরাং জনৈক নেতা এবং তাঁর সামান্যসংখ্যক সমর্থকদের এই বিকারকে পার্টি-মনোভাবের অভিব্যক্তি বলে গণ্য করা হলে দারুণ ভুল করা হবে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি কমিউনিস্টদের মনোভাব কি ছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায় নানা ঘটনায়। এখানে আমরা এই ধরনের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করব। ভারতের অনেক সশস্ত্র স্বাধীনতা-সংগ্রামী তাঁদের স্মৃতিচারণায় রবীন্দ্রনাথের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁদের প্রশ্রয় ও আশ্রয় দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ পরে কমিউনিস্ট হন। নিচের ঘটনাগুলিতে এঁদের সে সময়কার কথা থাকবে না: থাকবে কেবল তাঁদেরই কথা, যাঁরা কমিউনিস্ট হিসাবেই তাঁর সান্নিধ্যে গিয়েছিলেন বা তাঁর সম্পর্কে মনোভাব প্রকাশ করেছেন।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা ঘটে বিশের দশকের গোড়ার দিকে। তার আগে এখানে কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁদের তখনকার মতামত আমাদের জানা না থাকলেও, বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কমিউনিস্ট লেনিন তাঁর সম্পর্কে কী বিপুল শ্রদ্ধা পোষণ করতেন, তার সাক্ষ্য প্রমাণ আজও আছে। সেই ১৯২০ সালেই নবজাত সোভিয়েত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান লেনিন রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ করেন সোভিয়েত দেশ পরিদর্শনে। ইচ্ছা থাকলেও পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতার দরুন তিনি সাড়া দিতে পারেননি সেই আমন্ত্রণে। সাড়া অবশ্য দিয়েছিলেন, দশ বছর পরে ১৯৩০ সালে। গিয়েছিলেন 'তীর্থ দর্শনে' যার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ আছে 'রাশিয়ার চিঠি'তে। তাছাড়া লেনিনের প্রিয় গ্রন্থ-সংগ্রহে সশ্রদ্ধায় রক্ষিত আছে রবীন্দ্রনাথের একাধিক গ্রন্থ।

বিশের দশকের মাঝামাঝি সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সূত্রে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়িতে যাতায়াত শুরু হল মুজফ্‌ফর আহমদ, আবদুল হালিম প্রমুখ কমিউনিস্ট নেতাদের—এবং কালক্রমে ভারতে ছদ্মনামের আড়ালে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মরত ব্রিটিশ কমিউনিস্ট নেতা এলিসন-এর। বাস্তবিক পক্ষে ঠাকুরবাড়ির একতলার একখানা ঘর ক্রমে ক্রমে পরিণত হল কমিউনিস্টদের একটি গোপন কেন্দ্রে। শুনেছি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সেই ঘরে মাঝে মাঝে উঁকি দিতেন কৌতূহলভরে; কুশল প্রশ্ন ছাড়াও, আরও দু-একটা প্রশ্ন করতেন অন্যান্য কাজকর্ম কেমন চলছে, সে সম্পর্কে।

১৯২৫ সালের শেষাশেষি মুজফ্‌ফর আহমদ, নজরুল ইসলাম প্রমুখ ঠিক করলেন একটা পত্রিকা বার করবেন, নাম দেবেন 'লাঙল'। সৌম্যেন্দ্রনাথের উপরে ভার

দেওয়া হল কবির কাছ থেকে একটি আশীর্বাণী সংগ্রহের। আশীর্বাণী তিনি দিলেন সাগ্রহে :

'জাগো, জাগো, বলরাম,
ধরো তব মরু-ভাঙা হল,
প্রাণ দাও, শক্তি দাও,
স্তব্ধ করো ব্যর্থ কোলাহল।'

এই আশীর্বাণীটি প্রচ্ছদ-পত্রে শিরোধার্য করে প্রকাশিত হত 'লাঙল'-এর প্রতিটি সংখ্যা।

ত্রিশের দশকে রবীন্দ্রনাথের প্রতি কমিউনিস্ট পার্টির এবং কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোভাব কেমন ছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায় সরোজ মুখার্জীর লেখায়। তিনি লিখেছেন, "জোড়াসাঁকোর বাড়িতে নিচের তলায়....তদানীন্তন কমিউনিস্ট পার্টির গোপান কেন্দ্র। সে ঘরে কমরেড আবদুল হালিমের সঙ্গে আমি বহুবার গেছি। সোমনাথ লাহিড়ীও যেতেন। ডাঃ রণেন সেনও যেতেন। আবদুল হালিমের সঙ্গে আমি ছ'সাত বার ওখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সুযোগ পেয়েছিলাম। আবদুল হালিম বীরভূমের মানুষ—তাঁকে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ স্নেহ করতেন। তাই আমাদের আলাপ ভালই জমত। একবার আমরা তাঁর তীব্র সমালোচনা করলাম—আপনার 'রাশিয়ার চিঠি'র কয়েক জায়গা আমাদের ভালো লাগেনি। আমরা "সর্বহারার দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠি" শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করছি। তিনি বললেন, তা তোমরা করো, কিন্তু মোটামুটি ভালো চিঠি লিখিনি? আমি তো আর তোমাদের মতো কমিউনিস্ট নই। আমরা বলি, ঠিকই তো, আপনি যা লিখেছেন, তাতে দারুণ কাজ হয়েছে।" ('দেশহিতৈষী", ২১।১।৮৩)

এর পরেও কি কেউ বলবেন, কবির মৃতদেহে মাল্যদান কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে একটা আচমকা ঘটনা—পূর্বেকার মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গতিহীন?

এবার দেখা যাক মৃত্যুর পরবর্তীকালের এই সাড়ে চার দশকে রবীন্দ্রনাথের প্রতি কমিউনিস্ট পার্টির মনোভাব। '৪৮ সালের কংগ্রেসের পরে কমিউনিস্ট নেতা ভবানী সেনের মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুতি এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতি কমিউনিস্টদের চিরাচরিত মনোভাব থেকে বিচ্যুতির কথা আমি আগেই বলেছি, তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন এই সাড়ে চার দশকের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার মত পরিসর আমার নেই, প্রয়োজনও বোধহয় নেই। তাই কয়েকটি মাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক ঘটনার কথা উল্লেখ করব, যেমন, জন্ম-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের কথা, বর্তমানে চলমান ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী

অনুষ্ঠানের কথা এবং আরও কিছু প্রাসঙ্গিক কথা। কিন্তু তার আগে উল্লেখ করব বার্মায় কমিউনিস্ট আন্দোলনে শত্রুর হাতে নিহত এই বাংলার এক কমিউনিস্ট শহীদের কথা, যিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা' হাতে। তাঁর নাম ছিল সুবোধ মুখার্জী। ঘটনাটি আমি উদ্ধৃত করছি চিন্মোহন সেহানবীশের 'রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজ' গ্রন্থখানা থেকে ; তিনি আবার এটা উদ্ধৃত করেছেন 'এক্স-বার্মা স্টুডেন্টস ইলেভেনথ্ অ্যানুয়াল গেট টুগেদার স্যুভেনির, ১৯৭৯-৮০' থেকে।

"১৯৬৫ সাল। পেগু ইয়োমা পর্বতমালার অতি দুর্গম অঞ্চলে বার্মার সশস্ত্র বিদ্রোহীদের গোপন আস্তানা থেকে এক বার্তাবাহী এল সুবোধ মুখার্জীর চিঠি নিয়ে। বিদ্রোহীদের প্রথম শ্রেণীর নেতা সুবোধকে জীবিত বা মৃত ধরে দিতে পারলে এক লক্ষ মুদ্রা পুরস্কারের ঘোষণা তখন বহাল আছে। চিঠিতে তিনি চেয়ে পাঠিয়েছেন —বিদ্রোহ পরিচালনার কোনো উপকরণ নয়—রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সংকলন 'সঞ্চয়িতা'। রেঙ্গুনের কোথাও বইটা পাওয়া গেল না। লোক মারফৎ কলকাতা থেকে আনিয়ে সেটা পাঠালাম। কিছুকাল পরেই ঘটনাচক্রে সুবোধের সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য ঘটে যায়। জিজ্ঞেসা করলাম, 'সুবোধদা তোমার সশস্ত্র সংগ্রামে রবি ঠাকুরের কবিতা কি কাজে লাগবে ?' স্বভাবসিদ্ধ প্রাণখোলা অট্টহাসি হেসে তিনি বললেন, 'তোকে কত কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছি ছাত্র জীবনে, ভুলে গেছিস ?' ···আবেগভরে আবৃত্তি করে গেলেন—'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী···'। অল্পকাল পরেই রেঙ্গুনের সব দৈনিক কাগজে খবর বের হল—"বিদ্রোহী নেতা সুবোধ মুখার্জী নিহত হয়েছেন। সঙ্গে রয়েছে ছবি—সুবোধের ছিন্নমস্তকধারী এক ফৌজী জওয়ান!"

১৯৬১ সালে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানের বিপুল বর্ণাঢ্য ও বহুমুখী আয়োজনের কথা এবং সেই অনুষ্ঠানে কমিউনিস্ট নেতা এস এ ডাঙ্গের ভাষণের কথা আমি আমার একটি লেখায় উল্লেখ করেছি। এই কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান ছাড়াও কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে তখন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ছোট-বড় অসংখ্য সভা-সমাবেশ ও নানাবিধ অনুষ্ঠান। কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশনা-ভবন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল একটি মূল্যবান প্রবন্ধ সংকলন : 'রবীন্দ্রনাথ' যা সমৃদ্ধ হয়েছিল সুশোভন সরকার, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, চিন্মোহন সেহানবিশ, গোপাল হালদার প্রমুখ পণ্ডিত জনের রচনার দ্বারা। প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন যামিনী রায়। সেই সংকলনের ভূমিকায় সম্পাদক হিসাবে গোপাল হালদার যা লিখেছিলেন তা এখানে স্মরণীয়। তিনি লিখেছিলেন, "···রবীন্দ্র প্রতিভার···প্রকাশের মধ্য দিয়ে··· কালান্তরের সঙ্গেও আমাদের পরিচয় ঘটে, ভাবীকালের আভাসও আমরা লাভ করি।"

১৯৬২ সাল থেকে সি পি আই কার্যতঃ দু'ভাগ হয়ে যায়—'সংশোধনবাদী' এবং 'মার্কসবাদী'। আমি ছিলাম এই দ্বিতীয় ভাগে। ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে

কারাবন্দী মুজফ্‌ফর আহমদ একটি অপারেশনের জন্য বন্দী অবস্থাতেই স্থানান্তরিত হন 'মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।' এই সময়ে ঠিক হয় ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে ময়দানে আরম্ভ হবে ভবিষ্যৎ পার্টির একটি আয়োজনী সমাবেশ। পুলিশের চোখ এড়িয়ে মুজফ্‌ফর সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার দায়িত্ব ছিল আমার। তাঁর কাছে দাবি জানালাম ঐ সমাবেশের উদ্দেশ্যে একটি বাণী দেবার। তিনি সাগ্রহে রাজি হয়ে গেলেন। যে বাণীটি তিনি দিয়েছিলেন, সেটি এখানে, সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বাণী প্রসঙ্গে তিনি লেখেন, "এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে রবীন্দ্রনাথ 'সবুজপত্রে' যে একটি কবিতা লিখেছিলেন তার দুটি পংক্তি আজ আমি আপনাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি :

"আমরা চলি সমুখপানে
কে আমাদের বাঁধবে।
রইল যারা পেছুর টানে
কাঁদবে তারা কাঁদবে।"

বিপ্লবী পার্টি গড়ার জন্য বিপ্লবী নেতা জনগণকে আহ্বান জানালেন রবীন্দ্রনাথের কবিতায়। এ থেকেও কি সপ্রমাণ হয় না কবিকে কী শ্রদ্ধার চোখে কমিউনিস্টরা দেখেন?—অবশ্য, উপরের ঘটনাটি জানার পরেও যদি আবার কোনো প্রমাণের প্রয়োজন থাকে।

চলমান, ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন রাজ্য-সরকার যে বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন, তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে আর এই লেখাটিকে দীর্ঘতর করতে চাই না। বস্তুতঃ পক্ষে বামফ্রণ্ট সরকারের কমিউনিস্ট নেতৃত্ব এই ক্ষেত্রে ভারতের তথা বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐতিহ্যকে সার্থক-ভাবে বহন করে চলেছেন। অভিনন্দন জানাই সি পি আই (এম)-কে এবং তাঁর সহযোগী পার্টিসমূহকে। পরিশেষে, সংশয়ী সমালোচকদের কেবল স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, রবীন্দ্রনাথকে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে যেসব সংগঠন মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'ফ্যাসি বিরোধী লেখক ও শিল্পী সম্মিলন' ('প্রগতি লেখক ও শিল্পী সম্মিলন'), 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ', 'বহুরূপী' ইত্যাদি। ব্যক্তি হিসাবে উল্লেখযোগ্য নীরেন্দ্রনাথ রায়, গোপাল হালদার, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নেপাল মজুমদার প্রমুখ লেখক, দেবব্রত বিশ্বাস, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ গায়ক, শম্ভু মিত্র, পূর্ণেন্দু পত্রী প্রমুখ নাট্য ও চিত্র পরিচালক। এঁরা সকলেই হয় কমিউনিস্ট বা তাদের সহযাত্রী।

অতএব রবীন্দ্রনাথের মরদেহে মাল্যদান যেমন কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে একটা আচমকা ব্যাপার নয়, তেমনি আমার বিভিন্ন লেখায় তাঁর প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে তাও একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়।

১০।৬।৮৬

ফাঁসির মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ

না, না রবীন্দ্রনাথকে ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিতে হয়নি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের গুপ্ত তালিকায় রাজদ্রোহী হিসাবে এবং রাজদ্রোহীদের আশ্রয়দাতা হিসাবে তাঁর উল্লেখ থাকলেও এবং সেই সাম্রাজ্যবাদী প্ররোচনায় তাঁর চরিত্র হননের ব্যর্থ চেষ্টা হলেও, তাঁর প্রাণ হননের তো দূরের কথা, কোনও প্রকারের শারীরিক দণ্ডদানের চেষ্টাও হয়নি, কেননা, তেমন চেষ্টা হ'ত সাম্রাজ্যবাদের নিজের পক্ষেই আত্মঘাতী। অবশ্য তেমন অপচেষ্টা যদি কখনও হ'ত, তা হলে তিনি যে হাসিমুখেই সে দণ্ড মেনে নিতেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যিনি মৃত্যুর মুখে স্পর্ধিত 'চ্যালেঞ্জ' ছুঁড়ে দিয়ে সোচ্চারে ঘোষণা করতে পারেন,

> "যত বড়ো হও,
> তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড়ো নও।
> 'আমি মৃত্যু চেয়ে বড়ো' এই শেষ কথা বলে
> যাব আমি চলে ॥"

তাঁর কাছে প্রাণদণ্ড তো তুচ্ছ।

না, আমি এখানে রবীন্দ্রনাথের সশরীরে ফাঁসির মঞ্চে আরোহণের কথা বলছি না। বলছি তাঁর গান ও কবিতা বুকে নিয়ে, মুখে নিয়ে, যাঁরা সহাস্যে ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করেছেন, মৃত্যু-কুঠুরিতে নিঃশঙ্ক চিত্তে অন্তিম দিনের প্রতীক্ষা করেছেন, মৃত্যু অবধারিত জেনেও হেলায় সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, সেই মৃত্যুঞ্জয় বীরদের কথা। বাস্তবিক পক্ষে, রবীন্দ্রনাথের অন্যতম মহৎ কৃতিত্ব এই যে, উদ্যত মৃত্যুর মুখে উদ্ধত প্রতিস্পর্ধা ছুঁড়ে দেবার এই অকুতোভয়তা তিনি সঞ্চারিত করে দিতে পেরেছিলেন অগণিত তরুণের মনে মনে। তারই প্রমাণ স্বদেশী যুগের বিপ্লবীদের রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে হাসি মুখে চূড়ান্ত সংগ্রামে আত্মদান, ফাঁসির মঞ্চে মৃত্যুবরণ। এমনি অসংখ্য ঘটনার মধ্যে মাত্র কয়েকটি আমি এখানে উল্লেখ করব, এ যুগের তরুণদের অবগতির জন্য।

আলিপুর বোমার মামলা। আসামী অরবিন্দ, উল্লাসকর, বারীন্দ্র। এক বছর মামলা চলার পরে সেদিন রায় দান। আদালতের ভিতরে বাইরে লোকে লোকারণ্য। উৎকণ্ঠ কিন্তু নীরব। কী হয়, কী হয়! ঈশ্বর ওদের রক্ষা করুন!....রায় ঘোষিত হ'ল ঃ অরবিন্দের মুক্তি, উল্লাসকর এবং বারীন্দ্রের ফাঁসি। উপস্থিত জনতার সমবেত

দীর্ঘশ্বাস। কারো মূর্চ্ছা, কারো হাহাকার। হঠাৎ সব কিছু ছাপিয়ে জেগে উঠলো একটি মধুর মুখর কণ্ঠ! গান গাইছেন উল্লাসকর:

"সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম মাগো, তোমায় ভালোবেসে ॥

আঁখি মেলে তোমার আলো
প্রথম আমার চোখ জুড়ালো
ওই আলোতে নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে ॥"

গান শেষ হ'ল। মুখে হাসি নিয়ে কাঠগড়া থেকে নেমে গেলেন উল্লাসকর, বারীন্দ্র। একজন সাহেব প্রহরী তার সঙ্গী এক আইরিশ বন্ধুকে বললেন, 'ছাখো ফাঁসি হতে যাচ্ছে, অথচ ওরা হাসছে!" আইরিশ বন্ধুটি বললেন, 'আমি জানি, মৃত্যুকে ওরা পরিহাস করে।'

রাইটার্স বিল্ডিং-এর অলিন্দ যুদ্ধে যাবার আগে। বিনয় আর বাদল প্রতীক্ষা করছেন নিউ পার্ক স্ট্রিটের গোপন আশ্রয়ে। নিকুঞ্জ সেন তাদের নিয়ে যাবেন নির্দিষ্ট এক স্থানে। সেখানে তারা মিলিত হবেন দীনেশের সঙ্গে এবং তার নেতৃত্বে রওনা হবেন রাইটার্স বিল্ডিং-এ। উদ্দেশ্য কারাধ্যক্ষ কর্নেল সিম্পসন ও আরো কয়েকজন অফিসারকে হত্যা করা। নিকুঞ্জ সেন তাঁদের নিয়ে যেতে এসে দেখতে পেলেন তাঁরা রবীন্দ্রনাথের কাব্য-পাঠে বিভোর। বিনয় পড়ছেন আর বাদল শুনছেন।

"....তারপরে দীর্ঘ পথশেষে জীবযাত্রা অবসানে ক্লান্তপদে রক্তসিক্ত বেশে উত্তরিব একদিন শ্রান্তিহরা শান্তির উদ্দেশে দুঃখহীন নিকেতনে।"

....এর পরের ঘটনা সকলেরই জানা। অলিন্দ যুদ্ধে শত্রু-নিধনের পরে বিনয় ও বাদল মৃত্যুবরণ করলেন। দীনেশ ধরা পড়লেন পুলিশের হাতে। বিচারে তাঁর ফাঁসির হুকুম হ'ল।... আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে যে ফাঁসির সেল-এ তিনি ছিলেন তারই পাশে আর একটি ফাঁসির সেল-এ ছিলেন পুলিস ইন্সপেক্টরকে হত্যা করার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত রামকৃষ্ণ বিশ্বাস। দীনেশ গুপ্তের ফাঁসি হয় ক'দিন আগে। ফাঁসির আগের দিন তিনি শোনেন রামকৃষ্ণ সোচ্চারে আবৃত্তি করেছেন:

"যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে,
যে নদী মরুপথে হারালো ধারা,
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।"

পাশের সেল থেকে দীনেশও উচ্চকণ্ঠে জবাব দিলেন:

"যাবার দিনে এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই
যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই ॥'

ফাঁসির আগে দিদিকে এক চিঠিতে দীনেশ লেখেন:

"যার প্রাণ আছে শ্রেয়কে বরণ করবার জন্য, যার আছে শ্রদ্ধা, সে কি কখনও তাঁর

মহাশঙ্খের আহ্বান শুনে স্থির থাকতে পারে?...তাঁর আহ্বানে কি শক্তি আছে জানি না—

'শুধু জানি, যে শুনেছে কানে
তাঁহার আহ্বান-গীতি, ছুটেছে যে নির্ভীক পরাণে
সংকট আবর্ত মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব-বিসর্জন,
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি, মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মতো।'

আজ যাই দিদি! এই হয়তো শেষ প্রণাম।

—স্নেহের দীনেশ।"

এমন কত দৃষ্টান্ত যে দেওয়া যায়, তার ইয়ত্তা নেই। মেদিনীপুর জেলে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের কথা, ফাঁসির মঞ্চে ওঠার আগে যিনি এক চিঠিতে তাঁর বৌদিকে লেখেন:

...."আকাশ হতে প্রভাত-আলো আমার পানে হাত বাড়ালো
...জয়ধ্বনি উঠল রে উঠল রে॥

'এ তো গান শোনা নয় বা কাব্য পড়া নয়, এ যে একেবারে মর্মে অনুভব।"

উল্লেখ করা যায় কিশোর শহিদ ব্রজকিশোরের কথা। ফাঁসির আগে যে মাকে লিখেছিল:

"....আমার মা, মা আমার প্রণাম নিন।
তবে আমি যাই গো তবে যাই,
ভোরের বেলা শূন্য কোলে ডাকবি যখন 'বেজা' ব'লে,
বলবো আমি, নাই গো 'বেজা' নাই, মাগো যাই।"

মনে পড়ে মাস্টাদার কথা, ফাঁসির কুঠুরি থেকে শোনা যেত যাঁর অকম্পিত কণ্ঠস্বর:

"পূর্বাচলের পানে তাকাই
অস্তাচলের পারে আসি।"

মনে পড়ে রাজসাহী জেলে ভবানী ভট্টাচার্যের ফাঁসির আগের রাতের বারংবার আবেগদীপ্ত আবৃত্তির কথা:

"কাঁপিবে না ক্লান্ত কর, ভাঙিবে না কণ্ঠস্বর, টুটিবে না বীণা।
নবীন প্রভাত লাগি দীর্ঘ রাত্রি রব জাগি—দীপ নিবিবে না।"

মনে পড়ে চট্টগ্রামের তরুণ বিপ্লবী প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কৃষ্ণ চৌধুরির কথা। ফাঁসির আগের দিন সে ঘুরে ঘুরে গেয়েছিল একই গান :

'ও আমার দেশের মাটি,
তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা'।

বলেছিল, ফাঁসির দড়িতে গলা বন্ধ হয়ে না যাওয়া অবধি, সে ঐ গানটাই গেয়ে চলবে। এবং সত্যি সত্যিই তাই করেছিল!

মনে পড়ে পাটনা জেলে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত স্কুল-এর কথা, ফাঁসির আগের রাতে যিনি অদূরের সেলে বন্দী বিভূতি দাশগুপ্তকে ডেকে বলেন :

—"দাদা ওহি গানা গাইয়ে"।

....কোন গানা?

—"ওহি যো রবীন্দ্রনাথ কা : 'মরণ হে মোর মরণ'।"

মনে পড়ে আরও কত শহিদের কথা রবীন্দ্রনাথকে কণ্ঠে নিয়ে যাঁরা হেলায় মৃত্যুবরণ করেছেন। মনে পড়ে কত বীর সংগ্রামীর কথা রবীন্দ্রনাথকে বক্ষে নিয়ে যাঁরা জীবনপণ ঝাঁপিয়ে পড়েছেন মুক্তি-সংগ্রামে। কিন্তু সে সব কথা বলতে গেলে, সে তো হয়ে যাবে এক বিরাট মহাকাব্য। আপাততঃ স্বদেশ ছেড়ে বিদেশে, রবীন্দ্রনাথকে জীবনের রসদ করে যাঁরা আত্ম নিবেদন করেছেন মরণের উৎসবে, তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের কথা বলেই শেষ করব আজকের এই নিবন্ধ।

[ক] ১৯১৮ সাল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখনো চলছে। ভাগ্যের পরিহাস, যুদ্ধ-বিরোধী ইংরেজ কবি উইলফ্রেড ওয়েনকেও কলম রেখে বন্দুক হাতে যেতে হ'ল যুদ্ধে এবং সেখানেই দিতে হ'ল প্রাণ। ১৯২০ সালে রবীন্দ্রনাথের কাছে লেখা তাঁর মার চিঠি থেকে জানা যায়, দু'বছর আগে যখন তাঁর কবি-ছেলে যুদ্ধে যাবার আগে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিতে আসেন এবং তিনি তাঁকে বিদায় দিতে গিয়ে ভেঙে পড়েন, তখন তিনি (ওয়েন) তাঁকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে আবৃত্তি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের এই আশ্চর্য লাইন কয়টি :

"যাবার দিনে এই কথাটি
বলে যেন যাই—
যা দেখেছি যা পেয়েছি,
তুলনা তার নাই।"

তারপরে মা বিশ্বকবিকে লিখেছেন, "এই পোড়া যুদ্ধ থামবার একহপ্তা আগে আমার বক্ষের ধন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিল।.. তার পকেট-বই যখন আমার কাছে ফিরে এল, দেখি তার নিজের হাতে এই কথা ক'টি লিখে তার আপনার নাম লিখে রেখেছে।"

[খ] ১৯৬৫ সাল। যুদ্ধোত্তরকালে বর্মায় তখন প্রচণ্ড তীব্র হয়েছে কমিউনিস্ট আন্দোলন। এই আন্দোলনের অন্যতম শরিক ছিলেন বাঙালি তরুণ সুবোধ মুখার্জি। রেঙ্গুনবাসী পরিচয় গুপ্ত লিখছেন : "পেগু ইয়োমা পর্বতমালার অতি দুর্গম অঞ্চলে বর্মার সশস্ত্র বিদ্রোহীদের গোপন আস্তানা থেকে এক বার্তাবাহী এল। সুবোধকে জীবিত বা মৃত ধরে দিতে পারলে এক লক্ষ মুদ্রা পুরস্কার ঘোষণা তখন বহাল রয়েছে। চিঠিতে তিনি চেয়ে পাঠিয়েছেন—বিদ্রোহ পরিচালনার কোনো উপকরণ নয়—রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সংকলন 'সঞ্চয়িতা"।....কলকাতা থেকে আনিয়ে সেটা পাঠালুম। কিছু কাল পরেই ঘটনাচক্রে সুবোধের সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য ঘটে যায়। জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমাদের সশস্ত্র সংগ্রামে রবি ঠাকুরের কবিতা কি কাজে লাগবে?'....আবেগভরে আবৃত্তি করে গেলেন....'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী....'/....অল্পকাল পরেই রেঙ্গুনের সব দৈনিক কাগজে খবর বের হ'ল—বিদ্রোহী নেতা সুবোধ মুখার্জি নিহত হয়েছেন। সঙ্গে রয়েছে ছবি—সুবোধের ছিন্নমস্তকধারী একজন ফৌজী জওয়ান।" সহজেই অনুমান করা যায়, ফৌজী জওয়ানের সঙ্গে তিনি যখন মোকাবিলা করেছিলেন, তখন তাঁর এক হাতে ছিল বন্দুক, অন্য হাতে রবীন্দ্রনাথ।

[গ] কাল ১৯৬৬। স্থান ইন্দোনেশিয়া। সামরিক আদালতে বিচার চলছিল। সেখানকার কমিউনিস্ট নেতা নজোটো-র। সেদিন ছিল রায় ঘোষণার দিন। রায় ঘোষিত হ'ল : প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন নজোটো। দণ্ড ঘোষণার পরে অকম্পিত কণ্ঠে তাঁর অন্তিম বিবৃতি পাঠ করলেন তিনি, যা শেষ করলেন রবীন্দ্রনাথের এই দুটি কলি দিয়ে :

"আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায় বারে বারে
ডাক দিয়ে যায় ন'তুন পাতার দ্বারে দ্বারে।"

রবীন্দ্রনাথকে বুকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে মুখে নিয়ে, মুক্তি-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার, মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষার, অকুতোভয়ে আত্মদান করার এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে স্বদেশে এবং বিদেশে। কেবল ঘরের কাছের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেই নয়, সুদূর আফ্রিকা ও অন্যান্য দেশের জাতীয় ও সামাজিক মুক্তিযুদ্ধেও রয়েছে এমন অনেক গৌরময় নজির—কিছু আমাদের জানা, কিছু অজানা। আর কেবল গত অতীতেই নয়, চলমান বর্তমানে এবং অনাগত ভবিষ্যতেও রবীন্দ্রনাথ যেমন ছিলেন, যেমন আছেন, তেমনি থাকবেন বিপ্লবী সংগ্রামীদের মৃত্যুঞ্জয় সহ-সংগ্রামী।

১২।৫।৮৭

পুলিশের খাতায় '৩নং দাগী' রবীন্দ্রনাথ

অনেকের মুখে মুখে প্রশ্ন শোনা যায় : কেবল অহিংস স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গেই নয়, এমন কি বিপ্লবীদের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের যোগ ছিল এবং তিনি তাঁদের নানা ভাবে সাহায্যও করতেন আর এই কারণে রাজদ্রোহী হিসাবে এবং রাজদ্রোহীদের আশ্রয়দাতা হিসাবে পুলিশের খাতায় রবীন্দ্রনাথের নামও ছিল, এ কি নিছক অনুমান, না বাস্তব ঘটনা ?

জিজ্ঞাসু বন্ধুদের জানাতে চাই, এটা মোটেই কারো অনুমান নয়, নিরেট বাস্তব ঘটনা। রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসু ও গবেষকদের লেখায়, স্বদেশী যুগের স্মৃতিচারণা ও ইতিহাসে, মহাফেজখানার নথিপত্রে, এমনকি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের নিজের কথাতেও এমন অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে যা এই উক্তির সমর্থনে উদ্ধৃত করা যায়।

সম্প্রতি প্রয়াত চিন্মোহন সেহানবীশের অচির-প্রকাশিত গবেষণা-গ্রন্থ 'রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজ'-এ এই জাতীয় অনেক ঘটনা একত্রে সংকলিত হয়েছে। ঐ গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রতি আমি উৎসুক পাঠকবন্ধুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। এখানে আমি নমুনা হিসাবে কয়েকটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ করছি।

এই শতকের প্রথম দশকের দ্বিতীয়ার্ধে অরবিন্দ ছিলেন 'অনুশীলন সমিতি'র নেতা এবং বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের নায়ক। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিল তাঁর শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতির সম্পর্ক। পুলিসের খাতায় এর উল্লেখ পাওয়া যায় এইভাবে : "অরবিন্দ ঘোষের বন্ধু বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হলেন ঐ দলের অভিজাত প্রবক্তা।" (দ্রষ্টব্য : 'হোম/পলিটিক্যাল প্রসিডিংস ডিপজিটস,' নভেম্বর ১৯০৯)।

এখানেই শেষ নয়। ঐ সময়েই পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল এফ সি ডেলি এক সার্কুলার মারফৎ কলকাতার পুলিস কমিশনার সমেত সমস্ত পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্টদের উপরে নির্দেশ জারি করলেন : "রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের গতিবিধি ও ক্রিয়াকলাপের উপরে ঘনিষ্ঠ নজর রাখুন।" যাঁদের উপর নজর রাখতে হবে, তাঁদের একটি তালিকাও ঐ নির্দেশের সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল, যার মধ্যে ছিল রবীন্দ্রনাথেরও নাম। (দ্রষ্টব্য : 'ইস্টার্ন বেঙ্গল অ্যাণ্ড আসাম, পলিটিক্যাল ব্রাঞ্চ কনফিডেন্সিয়াল সার্কুলার্স ফর ১৯০৮-০৯')।

এই নির্দেশ যে অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রখ্যাত ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের 'ইণ্ডিয়া থ্রু দি এজেস' নামক গ্রন্থের এই অনুচ্ছেদটিতে : "সাহিত্যিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন বাঙালি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রবীন্দ্রনাথকে বলেন

একদিন যখন তিনি তাঁর একটি ব্যক্তিগত কাজে জোড়াসাঁকো থানায় পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখন একজন কনস্টেবল দরজায় এসে তাঁকে সালাম ঠুকে জানালো, 'তিন নম্বর দাগী রবীন্দ্রনার্থ ঠাকুর কাল রাত কো ঘর পৌছা।'

"কবি যখন এই গল্পটি আমায় বলছিলেন তখন তাঁর ঠোঁটে ছিল বাঁকা হাসি। তিনি আরও বললেন, 'আমার মনে হয় ওদের খাতায় এখনও আমার নামে দাগটা লেগে আছে'।"

কবির এই সন্দেহ যে অমূলক ছিল না তার প্রমাণ পাওয়া যায় সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকায় (২।১২।৭৭) প্রকাশিত শিশির কর-এর লেখা 'রবীন্দ্রনাথের পেছনেও টিকটিকি' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে।

কেবল রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই নয়, তাঁর 'শান্তিনিকেতন' নিয়েও পুলিসের কম মাথা-ব্যথা ছিল না। পূর্ববঙ্গ ও আসামের শিক্ষা-অধিকর্তার এই গোপন সার্কুলারটি তার একটি প্রমাণ :

"আমার গোচরে এসেছে যে, বাংলার বীরভূম জেলায় বোলপুরে শান্তিনিকেতন তথা ব্রহ্মচর্যাশ্রম নামে পরিচিত প্রতিষ্ঠানটি সরকারি কর্মচারীদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য সম্পূর্ণ অনুপযোগী। আমি অবগত হয়েছি এই প্রদেশের কিছু সরকারি কর্মচারী তাঁদের সন্তানদের সেখানে পাঠিয়েছেন। আমি তাঁদের সতর্ক করে দেওয়া প্রয়োজন মনে করি তাঁরা যেন তাঁদের সন্তানদের ফিরিয়ে নিয়ে আসেন এবং ভবিষ্যতে সেখানে আর পাঠানো থেকে বিরত থাকেন ; যারা এই সতর্কবাণীর পরেও সেখানকার ছাত্র থাকবে, তাদের ভবিষ্যৎ বিপন্ন হবার সম্ভাবনা।"

আর এটাই একমাত্র প্রমাণ নয়। ১৯২৫ সালের ভারতের গোয়েন্দা-প্রধান স্যার ডেভিড পেট্রি রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর শান্তিনিকেতন সম্পর্কে যে দীর্ঘ নোট লেখেন, তাতে বলা হয় : "এটা অবশ্যই সুপরিকল্পিত যে ১৯২০-২১ সালে (!) তিনি 'নাইটহুড' ত্যাগ করেন ; এইভাবে তিনি হয়ে ওঠেন একজন অসহযোগী এবং সরকারের অবিচল বিরোধী। ...আমার কোনও সন্দেহ নেই যে, শান্তিনিকেতনের আবহাওয়া একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যা বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ—ব্রিটিশ-বিরোধী ও রাজানুগত্যহীন ...। ...আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব যাতে ভারতীয় মাতাপিতা তাঁদের সন্তানদের সেখানে না পাঠান কিংবা, কেউ সেখানে এক টাকাও না দান করেন।" ('হোম/পলিটিক্যাল ফাইল', ১৯২৫)।

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের এই অপচেষ্টা যে বেশ কিছুটা সফল হয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় লণ্ডনস্থ 'ইণ্ডিয়া অফিস'-এর হোজ-কে লেখা অ্যাঙ্গাস ফ্লেচার-এর এই চিঠি থেকে : "ট্যাগোরের বিদ্যালয় সম্পর্কে আপনার পত্রের জন্য ধন্যবাদ। এক মার্কিন মহিলা এ

বিদ্যালয়ে ৫০ হাজার ডলার পাঠাবেন বলে মনস্থ করেছিলেন। আপনার পত্রের কল্যাণে আমরা তাঁকে বিরত করতে সক্ষম হয়েছি।" (ঐ)

এ কথা সুবিদিত যে, সে যুগের বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী পন্থা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের তীব্র বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও, তাঁদের নিষ্ঠা, বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গের প্রতি তার ছিল গভীর শ্রদ্ধা এবং অনেক বিপ্লবীকে তিনি জেনেশুনেই নিযুক্ত করেছিলেন শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন ও পল্লী সংগঠনের কাজে। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'অনুশীলন সমিতি'র সদস্য কালীমোহন ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ আইচ, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষিতিমোহন সেন, হীরালাল সেন, মনীন্দ্রচন্দ্র রায় প্রমুখের নাম। 'অনুশীলন সমিতি'র আর একজন বিপ্লবী যাঁকে পাঠানো হয়েছিল জার্মানিতে, ইউরোপে অবস্থানকারী ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে, সেই কেদারেশ্বর গুহকেও তিনি নিযুক্ত করেছিলেন শ্রীনিকেতনের কাজে। ডঃ ভূপেন্দ্র দত্তকেও তিনি দিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে অধ্যাপকের পদ! তাঁর আশ্রয়গ্রাহকদের মধ্যে কেবল স্বদেশী বিপ্লবীরাই ছিলেন না, ছিলেন বিদেশী বিপ্লবীরাও, যেমন চীনের লিম ঙ্গো চিয়াং প্রমুখ।

পুলিশের খাতায় রবীন্দ্রনাথের এই নিয়োগগুলির উল্লেখ করা হয়েছে এইভাবে: "শান্তিনিকেতনের কর্তৃপক্ষের কাছে নিশ্চয়ই কেদারেশ্বর গুহ এবং ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের অতীত ইতিহাস সুপরিজ্ঞাত ছিল; এঁদের নিয়োগ থেকেই ঐ প্রতিষ্ঠানের চরিত্র সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।" ('হোম/পলিটিক্যাল ফাইল ১৮১/২৫, ১৯২৫')। আরও: "গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুযায়ী ঢাকা অনুশীলন সমিতি'র নেতা নরেন্দ্রনাথ সেন যিনি ছিলেন ১৯১৬ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত 'স্টেট প্রিজনার', তিনি শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন ১৯২৫-এর মে মাসে। ১৯২ -এর সেপ্টেম্বর থেকে আজও পর্যন্ত তিনি ফেরার আছেন। কালীমোহন ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ আইচ, হীরালাল সেনগুপ্ত, মণীন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ প্রাক্তন বিপ্লবীরা সকলেই কাজ করছেন শান্তিনিকেতনে বা শ্রীনিকেতনে। শান্তিনিকেতনে চীনা ভাষার অধ্যাপক লিম ঙ্গো চিয়াং সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি কাজ করেন চীনা বিপ্লবী এবং ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে।" (ঐ)

গোয়েন্দা দপ্তরের অন্য একটি দলিলে বলা হয়েছে "রাসবিহারী বসুর সঙ্গে যাঁর চিঠিপত্রের লেনদেন আছে, সেই নৃপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর অধ্যক্ষ পদে যোগদানের জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। ....সেই ১৯২৩ সাল থেকে সুধাকান্ত চৌধুরী কমিউনিজম-এর প্রতি আকৃষ্ট। এম. এন. রায়ের 'অ্যাডভান্স গার্ড' পত্রিকা যাদের কাছে আসে, তিনি তাঁদের অন্যতম।" ('হোম/পঃ ফঃ, ২৪/২৭ ১৯২৯')।

আশা করি এর পরে আর কারো সংশয় নেই যে রাজদ্রোহী হিসাবে এবং

রাজদ্রোহীদের আশ্রয়দাতা হিসাবে রবীন্দ্রনাথ পুলিশের কাছে ছিলেন কী বিরাট সমস্যা।

পরিশেষে আর একটি মাত্র গোয়েন্দা রিপোর্টের বিবরণ দিয়ে আজকের এই নিবন্ধ শেষ করব। এই রিপোর্টটি থেকে বোঝা যাবে যে, গোয়েন্দারা যে সব সময়ে তাদের রিপোর্ট সত্য বিবৃত করতেন বা রবীন্দ্রনাথের কথা ও কাজের সৎ ব্যাখ্যা দিতেন, তা নয়। অনেক সময়ে তাঁরা তাঁদের রিপোর্টে নিছক আষাঢ়ে গল্পও ফেঁদে বসতেন, যেমন গোয়েন্দা অফিসার পি সি ব্যামফোর্ড-এর এই রিপোর্টটি। ১৯২৭ সালের ৭ আগস্ট তিনি রিপোর্ট দেন।

"১৯২৪ সালের জানুয়ারি মাসে কলিকাতা পুলিসের স্পেশাল ব্রাঞ্চ জানতে পারে যে, বার্লিন থেকে এম এন রায় কর্তৃক প্রেরিত মস্ত একদফা অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক সামগ্রীর এক চালান ভারতে যাচ্ছে সাংহাই হয়ে। ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা জানতে পারি যে জাপানে রাসবিহারী বসু ও ভারতে শচীন সান্যাল দুজনেই গভীরভাবে লিপ্ত রয়েছেন এই ষড়যন্ত্রে। ভারতবর্ষ থেকে অমূল্য ব্যানার্জী এপ্রিল মাসে সিঙ্গাপুর পৌঁছান ঐ চালান হাতে নিতে। এরই সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন জনৈক কে আর সবেরওয়ালা, যিনি বর্তমানে জাপানে রাসবিহাবিহারীর সঙ্গে জড়িত রয়েছেন ঐ সব কাজে। ঐ ব্যাপারটি খুবই আগ্রহোদ্দীপক যে, ডঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙলাদেশের মহামহিম লাট বাহাদুরের কাছে তদবির করেছেন ঐ সবেরওয়ালাকে ভারতে এসে তাঁর প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে দেওয়ার অনুমতির জন্য। ১৯২৪ সালের এপ্রিল মাসে খুবই বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়েছে যে, সুভাষ বসুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত সত্যেন মিত্র ব্যবস্থা করেছেন ডায়মণ্ড হারবারে এক চালান অস্ত্র পাওয়ার। সুভাষ বসু দুজন বলশেভিক এজেন্টের সহায়তায় ঐ অস্ত্র ভারতে আমদানির ব্যবস্থা করছেন। ....ঐ বলশেভিক এজেন্ট দুজন বোমা তৈরির ব্যাপারে ওস্তাদ এবং কিছু বাঙালীকে ঐ বিদ্যা শেখাতে প্রস্তুত। ঐ উদ্দেশ্যে যে বাড়িগুলি ব্যবহারের কথা বিবেচনা করা হয়েছে, তার মধ্যে আছে কবির এক আত্মীয় সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি। ডঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সবেরওয়ালার মধ্যে যোগাযোগের সূত্রে ঠাকুরবাড়ির এই উল্লেখ খুবই আগ্রহোদ্দীপক।" (দ্রষ্টব্য : 'রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজ', পৃঃ ৪৭)।

অতএব, অস্ত্র আমদানি, বলশেভিকদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র এবং বোমা তৈরির পিছনেও যে রবীন্দ্রনাথের মদত ছিল, তাঁতে আর সন্দেহ কি!

২.৩.৮৭

জাতীয় সংহতির সংজ্ঞা ও স্বরূপ

সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথই প্রথম যিনি উপলব্ধি করেছিলেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যাকে বলা হয় 'নেশন', ভারত কখনো তা নয়, কখনো তা হতে পারে না এবং হবার জন্য চেষ্টাও করা উচিত নয়। "মহামানবের সাগরতীরে" এই ভারতবর্ষকে তিনি দেখেছিলেন নানা ভাষা ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী নানা মানব-সমষ্টির মিলনতীর্থ হিসাবে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা যায়, বিভিন্ন জাতিসত্তার অভিন্ন স্বদেশ হিসাবে। এবং এই কারণেই পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্রের অনুরোধে তিনি যখন তাঁর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক ভবনটির নামকরণে সম্মত হলেন তখন সেটির নাম দিলেন "মহাজাতি সদন"—"জাতি-সদন" বা অনুরূপ কিছু নয়।

ভাবলে ভুল হবে যে, একের মধ্যে এই বহুর মিলন এবং যুগপৎ বহুর মধ্যে এই একের জাগরণের যে রূপ—ভারতবর্ষের এই রূপের উৎস কেবল রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসেই। আদৌ তা নয়, এর উৎস এই উপমহাদেশের সুদীর্ঘ ইতিহাসে, চিরবহমান বাস্তব-বিকাশে। কত কাল ধরে, কত পথ বেয়ে, কত মানব-গোষ্ঠী এসেছে এই দেশে। নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেও অংশীদার হয়েছে একটি নির্বিশেষ স্বদেশ-বোধের তথা ভারতীয়ত্বের। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, অন্ততঃ একবার বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ সক্ষম হয়েছে এই বৈশিষ্ট্য রক্ষার তাগিদকে বিপথ-চালিত করে, তাকে ভারতীয়তার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে, এই মহান দেশের অঙ্গচ্ছেদ করতে এবং সেই সঙ্গে নানা মানব-ধারার মহাসঙ্গম রূপে তার যে ভাবমূর্তি, তা ক্ষুন্ন করতে! দুঃখের বিষয়, আশংকার বিষয়, আজ আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এমন কিছু আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করেছে যা কোন বিশেষ জনসমষ্টির কোন বিশেষ স্বার্থকে একান্ত গুরুত্ব দিয়ে আঘাত হানছে ভারতের সমস্ত জনসমষ্টির নির্বিশেষ স্বার্থকে—জাতীয় সংহতিকে। স্বভাবতই আমাদের গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার যে আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থায় এমন কিছু আছে কিনা যা এই ধরনের আন্দোলনের জন্য অন্ততঃ অংশতঃ দায়ী।

এখানে উল্লেখ্য যে উপরে আমি যে 'জাতীয় সংহতি' কথাটি ব্যবহার করেছি, তা এই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে যে আমি বুঝি গোটা ভারতের জনসংখ্যাকে একটি মাত্র জাতি বলে মনে করি। মোটেই তা নয়। ভারতের মোট জনসংখ্যা নানা জাতিসত্তা নিয়ে গঠিত; ভারত একটি বহুজাতিক দেশ। ইংরেজি 'নেশন' কথাটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়: 'জাতি' এবং 'রাষ্ট্র'; আমি এখানে 'জাতীয় সংহতি' কথাটি ব্যবহার করেছি 'রাষ্ট্রীয় সংহতি' অর্থে, যার মানে একই কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সমগ্র

ভারতের সমস্ত জাতিসত্তার সংহতি। এদিক থেকে ভারতের ক্ষেত্রে জাতীয় সংহতির মানে হল বহুজাতিক সংহতি, তথা আন্তর্জাতিক সংহতি।

ভারত যে একটা একজাতিক দেশ নয়, একটা বহুজাতিক দেশ, এই উপলব্ধি ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের নেতাদের মনে এসেছিল সেই বিশের দশকের শুরুতেই। তাই তখন ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের যে সংবিধান কংগ্রেস-নেতৃত্ব রচনা করেছিলেন, তাতে প্রকাশ্যেই যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির প্রতি স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। এবং সেটা ছিল সঠিক দিকেই পদক্ষেপ, কেননা একজাতিক দেশের জন্য যেমন বাঞ্ছনীয় এক-কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা, তেমনি বহুজাতিক দেশের জন্য বাঞ্ছনীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। কিন্তু এই স্বীকৃতি-দান সত্ত্বেও কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে প্রস্তাবিত ক্ষমতা-বণ্টনের ক্ষেত্রে সেই নীতির বিকৃতি সাধন করা হয়েছিল—রাজ্যের হাতে গুরুত্বহীন কয়েকটি ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে বাদবাকি সমস্ত ক্ষমতাই কেন্দ্রীভূত করা হয়েছিল কেন্দ্রের হাতে। বাস্তবিক পক্ষে সেটা ছিল যুক্তরাষ্ট্রীয় মোড়কে একটি এক-কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা। স্মরণীয় যে, এই প্রস্তাবটি কেবল মুসলিম লিগ-পন্থী মুসলমানদেরই নয়, অনেক জাতীয়তাবাদী মুসলমানকেও স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে দূরে ঠেলে দিল এবং ভবিষ্যৎ পাকিস্তান আন্দোলনের সূত্রপাত করল।

পরবর্তীকালে ভারত যখন স্বাধীন হল এবং গ্রহণ করল নতুন সংবিধান, সেই সংবিধানও আপাত দৃষ্টিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় হলেও মর্মগতভাবে তা হল এক-কেন্দ্রীয়। সমস্ত ক্ষমতাকে ভাগ করা হল চারটি তালিকায়—কেন্দ্রীয়, রাজ্য, যুগ্ম এবং অবশিষ্ট। কেন্দ্রীয় তালিকার ক্ষমতাগুলি ভোগ করবে কেন্দ্র; রাজ্যতালিকার ক্ষমতাগুলি ভোগ করবে রাজ্য; যুগ্ম তালিকার ক্ষমতাগুলি যদিও ভোগ করতে পারে কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয়েই কিন্তু দুয়ের মধ্যে বিরোধ হলে তা ভোগ করবে একা কেন্দ্র; চতুর্থ তালিকায় কোনো নির্দিষ্ট ক্ষমতার উল্লেখ না করে কেবল বলা হল যে উল্লিখিত তিনটি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি এমন সমস্তক্ষমতাকেই ধরতে হবে এই তালিকার অন্তর্গত বলে এবং এই ক্ষমতাগুলি সবই ভোগ করবে একক ভাবে কেন্দ্র। বলা বাহুল্য, এই ক্ষমতা-বণ্টন এমনভাবে করা হয়েছে যে, কয়েকটি মাত্র স্বল্প গুরুত্বসম্পন্ন ক্ষমতা বাদ দিয়ে প্রায় সমস্ত ক্ষমতারই একক মালিকানা পেয়েছে কেন্দ্র কেবল তাই নয়, অর্থের ক্ষেত্রে রাজ্যগুলিকে এমনভাবে কেন্দ্রের উপরে নির্ভরশীল করা হয়েছে, যা তাদের পক্ষে মর্যাদা-হানিকর। এ তো গেল স্বাভাবিক অবস্থার কথা। অস্বাভাবিক অবস্থায় কেন্দ্র পারে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বাহ্যিক আবরণটুকু পর্যন্ত ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নগ্ন এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে। এই জন্যই প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হুইয়ার মন্তব্য করেছেন, ভারতীয় সংবিধানকে এক-কেন্দ্রিকতার লক্ষণাক্রান্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা না বলে, বলা উচিত যুক্তরাষ্ট্রীয়তার লক্ষণাক্রান্ত এক-কেন্দ্রিক ব্যবস্থা।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এমন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা কখনো প্রতিফলিত

করতে পারে না ভারতের বহুজাতিক বাস্তবতাকে, পূরণ করতে পারে না বিভিন্ন জাতিসত্তার প্রত্যাশা ও প্রয়োজন। এ থেকেই জন্ম নেয় কেন্দ্র-বিরোধী ক্ষোভ। অবস্থার আরো অবনতি ঘটে যখন দলীয় রাজনীতির প্রয়োজনে কেন্দ্রের শাসক দল এমন কিছু করে যা আঘাত করে রাজ্যের আত্মাভিমানকে, বঞ্চিত করে রাজ্যকে তার প্রাপ্য থেকে। প্রথমটির দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে ভিন্ন-দলীয় রাজ্য মন্ত্রিসভাকে বাতিল করার ঘটনা। দ্বিতীয়টির দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজ্যকে প্রাপ্য অর্থ ও সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার ঘটনা। অবশ্য অবনতি ঘটাবার ব্যাপারে রাজ্য সরকারগুলিও যে সম্পূর্ণ নির্দোষ তা মোটেই নয়, বিশেষ করে যেসব রাজ্যে রয়েছে কেন্দ্রের শাসক দলের বিরোধী কোনো দলের সরকার। অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের অক্ষমতা ও অপদার্থতা আড়াল করতে তারা দোষ চাপিয়ে দেয় কেন্দ্রের কাঁধে, সৃষ্টি করে কেন্দ্র-বিরোধী বিক্ষোভ। কেন্দ্র এবং রাজ্যের এই পারস্পরিক বিরূপ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেশ জুড়ে সৃষ্টি করে এমন এক অস্বাভাবিক পরিবেশ, যার মধ্যে গড়ে ও বেড়ে ওঠে এমন সমস্ত শক্তি যা কালক্রমে আঘাত হানে ভারতের সমন্বয়-সাধনা ও রাষ্ট্রীয় সংহতির উপরে। কখনো এই আঘাত আসে ধর্মগত সাম্প্রদায়িকতার রূপ ধরে, কখনো বর্ণগত উন্মত্ততার রূপ ধরে, কখনো বা আঞ্চলিকতাবাদের রূপ ধরে! বলা বাহুল্য, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসম বিকাশ এই শক্তিগুলিকে ক্রমাগত ইন্ধন যোগায়।

এই পরিস্থিতিতে আমাদের দেশের বিভিন্ন জাতিসত্তার সমন্বয়-সাধনাকে সার্থক করে তোলার জন্য, রাষ্ট্রীয় সংহতিকে অভেদ্য করে তোলার জন্য, অবিলম্বে প্রয়োজন কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে একটি সুসম্পর্কের পরিবেশ গড়ে তোলা এবং তার জন্য যদি দরকার হয়, রাষ্ট্র নৈতিক কাঠামোয় উপযুক্ত রদবদল করা। এ ব্যাপারে আশা করি, অনেকেই একমত হবেন যে, একটি এক-কেন্দ্রিক রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামো প্রতিফলিত করে না একটি বহুজাতিক দেশের প্রকৃতি ও তার দাবি। বহুর মধ্যে এক-কে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রথমেই চাই একটি প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক কাঠামো। অবশ্য, সেটাই একমাত্র নয়। সেই সঙ্গে আঞ্চলিক, সাম্প্রদায়িক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে অসম বিকাশের বৈষম্যের অবসান ঘটাবার জন্য চাই দ্রুতগতি ও ব্যাপক ব্যবস্থাবলী। মনে রাখা দরকার, এই অসম বিকাশ কেবল অর্থনীতিগত নয়, সেই সঙ্গে সংস্কৃতিগতও। একই ভারতে বহুজাতির বিকাশ এবং বহুজাতির মধ্যে একই ভারতীয়ত্বের প্রকাশ—এরই রাজনৈতিক অভিব্যক্তি হল রাষ্ট্রীয় সংহতি আর তারই শর্ত হল রাষ্ট্র-কাঠামোয় পরিবর্তন এবং বিবিধ ক্ষেত্রে অসম বিকাশের নিরাকরণ।

বিজাতীয় এই "জাতীয়" কথাটি

ভারতের চলিশতম 'স্বাধীনতা দিবস' সাড়ম্বরে উদযাপিত হয়ে গেল! এই উপলক্ষে সবচেয়ে বেশিবার যে কথাটি উচ্চারিত হল, সেটি 'জাতীয় সংহতি'। অসংখ্য অনুষ্ঠানে বিঘোষিত হল জাতীয় সংহতি রক্ষার অঙ্গীকার। কিন্তু আমার মনে হয়, উদ্দেশ্য মহৎ হলেও উচ্চারণটি সঠিক নয়! এই 'জাতীয়' বিশেষণটি আমাদের ভাবনায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, যা আমাদের আচরণে প্রতিফলিত হয়, এবং উদ্দেশ্যসাধনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

'জাতি', 'জাতীয়' কথা দুটিকে আমরা ব্যবহার করি ইংরেজি 'নেশন' এবং 'ন্যাশনাল'-এর প্রতিশব্দ হিসাবে। কিন্তু ইংরেজিতে 'নেশন' তথা 'ন্যাশনাল' ব্যবহৃত হয় দুটি অর্থে : 'জাতি' তথা 'জাতীয়' এবং 'রাষ্ট্র' তথা 'রাষ্ট্রীয়' অর্থে। কিন্তু বাংলায় আমরা সাধারণতঃ 'জাতি' এবং 'রাষ্ট্র' কিংবা 'জাতীয়' এবং 'রাষ্ট্রীয়' কথা দুটিকে বুঝি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে। আর যেহেতু ইংল্যাণ্ডে 'এক জাতি এক রাষ্ট্র', সেই হেতু জাতি এবং রাষ্ট্র কে একই অর্থে ব্যবহার করলেও সেখানে কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু আমাদের হয়, কারণ ভারত এক রাষ্ট্র হলেও, এক জাতি নয়। সেইদিক থেকে আমাদের বরং 'জাতীয় সংহতি' কথাটি ব্যবহার না করে, ব্যবহার করা উচিত 'রাষ্ট্রীয় সংহতি' কথাটি।

স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম পর্বে অবশ্য আমাদের নেতাদের মনে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা এমন একটা ধারণা সৃষ্টি করে দিতে পেরেছিল যে একটা জনসমষ্টি যদি একটা জাতি না হয়—এক ভাষা ও সাহিত্য, এক রীতি-নীতি ও ঐতিহ্য এবং একটি ভূমিখণ্ডের অধিকারী না হয়, তাহলে তার স্বাধীনতা তো দূরের কথা এমনকি স্বায়ত্ত-শাসনেও অধিকার জন্মায় না, আর তাই তখন তাঁরা উঠেপড়ে লেগে গিয়ে-ছিলেন এটা প্রমাণ করতে যে, ভারতের অধিবাসীরাও একটা জাতি। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী একখানা বিরাট গ্রন্থ লিখেছিলেন, 'ভারত : একটি উদীয়মান জাতি'।

রবীন্দ্রনাথই বোধহয় প্রথম ভারতীয় যিনি এ সত্য উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভারতবাসীরা কোনোদিনই এক জাতি ছিল না, এবং কোনোদিনও এক জাতি হবে না। তিনিই বোধহয় প্রথম ভারতীয় যিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, জাতি হওয়ার সঙ্গে স্বাধীন হওয়ার কোনো সম্পর্ক এখানে নেই, বরং বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের প্রতিমা এই ভারতভূমিই একদিন অধিকারী হবে তার স্বাধিকারের, তার স্বাধীনতার। তিনি দেখেছিলেন, পশ্চিমের 'নেশন' এসে ভেঙে পড়ল 'নো-নেশন'-এর দেশ এই

ভারতবর্ষে। কিন্তু তাই বলে নিজেকে 'নেশন'-এ পরিণত করে তার মুখোমুখি হওয়া ভারতের পক্ষে বাস্তবও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের সাধনাই হল ভারতের পথ, ভারতের ব্রত। সেদিক থেকে 'জাতীয়' কথাটি বিজাতীয়। আর তাই আমাদের লক্ষ্য জাতীয় সংহতি নয়, রাষ্ট্রীয় সংহতি—বহুজাতীয় রাষ্ট্রীর সংহতি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, আধুনিক অর্থে 'নেশন' বা 'জাতি'-র উন্মেষ ও বিকাশ ধনতন্ত্রের উন্মেষ ও বিকাশের সঙ্গে ওতঃপ্রোত। উদীয়মান ধনিক শ্রেণী গোটা দেশ থেকে খুশিমত কাঁচামাল ও মজুর সংগ্রহ করার জন্য এবং গোটা দেশ জুড়ে উৎপন্ন পণ্যের বাজার গড়ে তোলার জন্য, সামন্ততন্ত্রের আমলের বহুধাবিভক্ত দেশকে পরিণত করে একটা জাতিতে এবং জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে জাতীয়তাবাদে। দু-তিন শতাব্দী আগে পশ্চিমের বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে ইংল্যাণ্ডে, এই ব্যাপারটাই ঘটেছিল এবং এই শতাব্দীর প্রাক্কালে ও প্রারম্ভে পূর্বের এই জাপানেও ঘটে তারই পুনরাবৃত্তি। সে দেশগুলিতে এই প্রক্রিয়া সম্ভব ও সফল হয়েছিল, তার কারণ সেখানকার অধিবাসীরা ছিল মোটামুটি একই ভাষা ও ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী।

আমাদের দেশেও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ এবং তার পৃষ্টপোষিত স্বদেশী সামন্তবাদের প্রতিপ্রেক্ষিতে একই পথে এ দেশের ধনিক শ্রেণী এবং তাদের পৃষ্টপোষিত কংগ্রেস-নেতৃত্বও সচেষ্ট হয়েছিলেন একই রকমের জাতীয়তাবাদের উদ্বোধনে। তাই স্লোগান দেওয়া হয়েছিল, 'এক জাতি, এক প্রাণ, একতা।' জনগণের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল এক অভিন্ন ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ চিত্র। এর ফলে নানা ভাষাভাষী, নানা ঐতিহ্যবাহী ভারতবাসীদের মধ্যে এক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী 'ভারতীয়তা'র উদ্ভব ঘটল বটে, কিন্তু তা আর যাই হোক 'জাতীয়তা' নয়। আর কেমন করেই বা হবে? বহু জাতির দেশ এই ভারতবর্ষে কেমন করে গড়ে উঠবে এক-জাতীয় উপলব্ধি? তা বাস্তবও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। কেননা তা করতে গেলে কালক্রমে দেখা দেবে এক নতুন ধরনের আধিপত্যবাদ। আর ঠিক এই কারণেই ভারতের অগ্রজ ধনিকগোষ্ঠী এবং তার পৃষ্টপোষিত কংগ্রেস-নেতৃত্ব যতই জিদ দেখাতে লাগলেন এক-কেন্দ্রিক ভারতের অনুকূলে, ততই বিভিন্ন অঞ্চলের অনুজ ধনিকরা এবং তাদের পৃষ্টপোষিত পার্টিগুলির পক্ষ থেকে দাবি উঠতে লাগলো প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের, তথা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর। এই স্বার্থ-বিরোধেরই সুযোগ গ্রহণ করল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলা হল অর্থনৈতিক স্বার্থ-বিরোধের সঙ্গে ধর্ম-সাম্প্রদায়িক, আঞ্চলিকতাবাদী, ভেদবুদ্ধির যোগসাজসে। এইভাবেই খণ্ডিত হল ভারতবর্ষ, প্রাদুর্ভূত হল পাকিস্তান।

দুঃখের বিষয়, মাতৃভূমির এই অঙ্গচ্ছেদের পরেও শাসক শ্রেণী এবং তার পার্টির

দৃষ্টিভঙ্গিতে মূলগত কোনো পরিবর্তন ঘটল না! আপাতদৃষ্টিতে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো গৃহীত হল বটে, কিন্তু তার সারা দেহ জুড়ে রয়ে গেল এক-জাতীয়তা তথা এক-কেন্দ্রিকতার ছাপ। রাজ্যগুলিকে দেওয়া হল না আত্ম-কর্তৃত্বের যথেষ্ট সুযোগ এবং সম্ভাব্য জাতিসত্তাগুলির আত্ম-বিকাশের যথেষ্ট অবকাশ। প্রথম ক্ষেত্রে তবু কিছুটা দেওয়া হল, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সবটাই প্রায় তুলে রাখা হল সংশ্লিষ্ট জাতিসত্তার পক্ষে লড়াই করে আদায় করে নেবার জন্য। অথচ কে না জানে যে, অসম বিকাশের এই দেশে কালক্রমে আত্মপ্রকাশ করবে নতুন নতুন জাতিসত্তা এবং দাবি করবে আত্ম-প্রতিষ্ঠা? সংবিধানে যদি আগে থেকেই দেখে দেওয়া হত এই স্বয়ংক্রিয় স্বীকৃতি-দানের ব্যবস্থা, তাহলে, সত্যিকারের আত্ম-বিকাশের দাবিকে বিপথ-চালিত করা যেত না, বিভেদবাদ, তথা বিচ্ছিন্নতাবাদের দিকে, যেমন এখন করা যাচ্ছে। মনে রাখা দরকার, সব আন্দোলনই বিভেদকামী বা বিচ্ছিন্নতাবাদী নয়; বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই, একদিকে ন্যায্য দাবির প্রতি শাসক দলের ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি এবং অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক বা আঞ্চলিক প্রতিক্রিয়ার চক্রান্তমূলক ক্রিয়াকলাপ একটি ন্যায্য আন্দোলনকে বিপথে ঠেলে দেয়।

আশ্চর্যের বিষয় যে, এই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি কেবল শাসক দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এমনকি বিরোধী পক্ষের দলগুলিও কমবেশি এই দৃষ্টিভঙ্গির শরিক। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে এই উভয় পক্ষের নেতাদের মুখেই একাধিক কথার নির্বিচার ব্যবহার, যেমন—যারা সমস্ত ভারতবাসীকে একই জাতি বলে মনে করে, তাদের বলা হয় 'জাতীয়তাবাদী', এবং যারা তা মনে করে না, তাদের বলা হয় 'জাতীয়তাবিরোধী' এবং তারপরে 'জাতীয়তাবাদ'কে দেশপ্রেমের সঙ্গে সমার্থবাচক ধরে নিয়ে 'জাতীয়তা-বিরোধী-কে বলা হয় 'দেশদ্রোহী'। আসলে কিন্তু সমস্ত ভারতবাসী এক জাতি নয় এবং জাতীয়তা-বিরোধীরাও দেশদ্রোহী নয়। রবীন্দ্রনাথ তো জাতীয়তা-বিরোধী ছিলেন, কিন্তু তিনি কি দেশদ্রোহী? কিংবা কমিউনিস্টরা?

সেইজন্যই আমার সনির্বন্ধ প্রস্তাব 'জাতীয় সংহতি' কথাটির 'জাতীয়' বিশেষণটি বাদ দিয়ে সেখানে ব্যবহার করা হোক 'রাষ্ট্রীয়' বিশেষণটি এবং 'জাতীয়তাবাদী' এবং জাতীয়তা-বিরোধী' কথা দুটিকে নির্বিচারে যথাক্রমে 'দেশপ্রেমিক' এবং 'দেশদ্রোহী' অভিধায় অভিহিত না করে, প্রয়োগ করা হোক যথোচিত অর্থে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে বিজাতীয় এই 'জাতীয়' কথাটি বহু বিভ্রান্তি ও বিপত্তির মূলে—অতএব যথাসাধ্য পরিত্যাজ্য।

জাতি, জাতীয়তাবাদ এবং দেশপ্রেম

"বিজাতীয় এই 'জাতীয় কথাটি'' শীর্ষক একটি লেখায় আমি প্রস্তাব করেছি, বহুল প্রচলিত "জাতীয় সংহতি'' কথাটির পরিবর্তে ব্যবহার করা হোক "রাষ্ট্রীয় সংহতি" কথাটি, অর্থাৎ এই বিশেষ ক্ষেত্রে "জাতীয়'' বিশেষণটির পরিবর্তে ব্যবহার করা হোক "রাষ্ট্রীয়'' বিশেষণটি। কেন এই প্রস্তাব করেছিলাম, তা সংক্ষেপে হলেও, সুস্পষ্টভাবে আমি ঐ, লেখাটিতে বিবৃত করেছি। আমার দুর্ভাগ্য যে, কেউ কেউ আমার বক্তব্যটিকে সঠিক ভাবে গ্রহণ না করে আমার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ উত্থাপন করেছেন ঃ "জাতীয়" কথাটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করে আমি নাকি দেশপ্রেমের প্রতি অমর্যাদা দেখিয়েছি ; মার্কস-এঙ্গেলস-এর শিক্ষা থেকে সরে গিয়েছি ; জনমানসে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে তাদের বিপথে চালাবার চেষ্টা করেছি, ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এই প্রত্যেকটি অভিযোগকেই আমি মনে করি অসত্য ও অসার বলে।

আমার ঐ লেখাটার আসল উপলক্ষ্য হল 'স্বাধীনতা-দিবস' এবং উপজীব্য হল ভারতের রাষ্ট্ররূপ সম্পর্কে কংগ্রেস-নেতৃত্বের চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গি। আমার বক্তব্য হল, বহুজাতিক এই ভারত সম্পর্কে মূলতঃ একজাতিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করার জন্যই কংগ্রেসে নেতৃত্ব বাহ্যতঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বজায় রেখেও, কার্যতঃ রাজ্যগুলিকে যথোচিত ক্ষমতা দেয়নি। কেবল তাই নয়, বিকশিত জাতিগুলির জন্য কিছু কিছু ক্ষমতার সংস্থান রাখলেও, বিকাশমান জাতিসত্তাগুলির জন্য এমন কোনো স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার সংস্থান রাখেনি, যার সাহায্যে তারা আপনা-আপনি তাদের আত্মস্বীকৃতি ও আত্মবিকাশের সুযোগ পেতে পারে—সেটা তাদের আদায় করে নিতে হয় সংগ্রামের মাধ্যমে। আমি বলতে চাই জাতীয়তা বিকাশে ধনিক শ্রেণীর ভূমিকার কথা এবং কালক্রমে বিকশিত জাতিগুলির অগ্রজ ধনিক গোষ্ঠীর সঙ্গে বিকাশমান জাতিগুলির অনুজ ধনিক গোষ্ঠীর স্বার্থ সংঘাতের কথা। কিভাবে এই সংঘাতকে জটিল করে তোলা হয় ধর্মগত ও অন্যবিধ সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা, এবং বিপথচালিত করা হয় বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের দিকে, তার কথা। এ কথা বলার তাৎপর্য এই যে, আমার বিশ্বাস, যদি বিকশিত জাতিগুলিকে সংবিধানে যথোচিত ক্ষমতা দেওয়া হ'ত এবং বিকাশমান জাতিসত্তাগুলির জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত স্বীকৃতি ও স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের উপযুক্ত সংস্থান রাখা হ'ত, তাহলে জনগণের মধ্যে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদ সংক্রামিত করা যেত না, বরং যারা সে অপচেষ্টা করত, তারাই বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। প্রসঙ্গতঃ আমি বলতে চাই, যেহেতু 'জাতীয় সংহতি' কথাটির মধ্যে একজাতিকতার বিভ্রান্তি সৃষ্টির অবকাশ রয়েছে, সেই হেতু 'জাতীয়' শব্দটির জায়গায় 'রাষ্ট্রীয়' শব্দটি বসানো হোক। হিন্দিতে তাই করা হয়েছে। আমি আরো বলেছিলাম সাধারণতঃ একটা রেওয়াজ আছে যে, যারা

বিশ্বাস করে গোটা ভারত একটা জাতি, তাদের 'জাতীয়তাবাদী' বলা এবং কেবল তাদেরই 'দেশপ্রেমিক" বলে নন্দিত করা, এবং যারা তা বিশ্বাস করে না, তাদের 'জাতীয়তা-বিরোধী' অতএব 'দেশদ্রোহী' বলে নিন্দিত করা। কিন্তু এটা ঠিক নয়, জাতীয়তাবাদীরাও যেমন দেশপ্রেমিক, জাতীয়তা বিরোধীরাও তেমন দেশপ্রেমিক হতে পারেন, যেমন রবীন্দ্রনাথ এবং কমিউনিস্টরা। সুতরাং এই অভিধাগুলি সতর্কভাবে প্রয়োগ করা উচিত।

অভিযোগকারীদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, কেবল আমিই নই, সি পি আই-সি পি আই (এম) নির্বিশেষে সমস্ত মার্কসবাদীই এই বিষয়গুলিতে একমত যে :

(১) ভারত একজাতিক রাষ্ট্র নয়, একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র। (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য মার্কসবাদী না হয়েও রবীন্দ্রনাথ এবং ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদও একই মত পোষণ করেন। দ্রষ্টব্য : যথাক্রমে 'On Nationalism' এবং ' ndia : A Multinational State')

(২) এই বহুজাতিক রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতিকে সুদৃঢ় ও সুস্থিত করার জন্য চাই প্রত্যেকটি জাতি ও জাতিসত্তার সর্বাঙ্গীন বিকাশের সুসমন্বিত সংস্থান—প্রত্যেকটি বিকশিত জাতির যেমন থাকবে নিজ রাজ্য ও যথোচিত ক্ষমতা, তেমনি প্রত্যেক বিকাশমান জাতিসত্তারও থাকবে সংশ্লিষ্ট রাজ্যটির মধ্যে যথোচিত স্বয়ংশাসনের অধিকার (বাস্তবিক পক্ষে আমাদের এখানে একই সঙ্গে রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতার দাবি, এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মধ্যেই গোর্খাদের 'অটোনমি'-র স্বীকৃতি এই সঠিক মার্কসবাদী অবস্থানেরই প্রতিফলন)।

(৩) জাতীয়তাবাদীরাই কেবল দেশপ্রেমিক এবং যারা জাতীয়তাবাদী নয়, তারা দেশদ্রোহী—এ কথা ঠিক নয়। যারা জাতীয়তাবাদী নয়, তারাও দেশপ্রেমিক যেমন আমি বলেছি, রবীন্দ্রনাথ বা কমিউনিস্টরা জাতীয়তাবাদী নন, অথচ মহৎ দেশপ্রেমিক।

(৪) জাতির উন্মেষ ও বিকাশ ধনতন্ত্রের উন্মেষ ও বিকাশের সঙ্গে ওতঃপ্রোত। যেহেতু সামন্ততন্ত্রের তুলনায় ধনতন্ত্র শ্রেয় এবং সামন্ততন্ত্রের অবসানের উপরেই ধনতন্ত্রের তথা জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার, সেই হেতু সামন্ততন্ত্রের তুলনায় এটি একটি উচ্চতর পর্যায়ে উত্তরণ, অতএব তখনকার মতো প্রগতিশীল এবং এই কারণে সে সময়ে মার্কসবাদীদের পক্ষে অবশ্যই সমর্থনীয়।

(৫) তবে এমন একটা সময় আসে, যখন প্রতিযোগিতামূলক ধনতন্ত্রের প্রবেশ করে একচেটিয়ামূলক ধনতন্ত্রে এবং জাতীয়তাবাদ পরিণত হয় সাম্রাজ্যবাদে (যার উগ্রতম রূপ হচ্ছে 'ফ্যাসিবাদ' বা 'নাৎসিবাদ'), তখন তা হয়ে পড়ে চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল ; তখন কমিউনিস্টরা অবশ্যই তার বিরোধিতা করবে এবং তার বিরুদ্ধে লড়াই করবে সর্বশক্তি দিয়ে ; অন্যভাবে বলা যায়, তখন সাম্রাজ্যবাদী জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টরা ঝাঁপিয়ে পড়বে মুক্তিকামী জাতীয়তাবাদের সংগ্রামে।

(৬) ধনতন্ত্র নিজের দেশে সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটালেও সে যখন নিজের দেশ

ছাড়িয়ে অন্য দেশে আত্মবিস্তার করে, অর্থাৎ সে যখন সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়, তখন কিন্তু সে তার পদানত পরাধীন দেশগুলিতে সামন্ততন্ত্রের ভাঙন ঘটিয়ে, সেখানে স্থানীয় ধনতন্ত্রের অভ্যুদয়ে সাহায্য করে না; কেননা তা করলে স্থানীয় ধনিকেরা হয়ে উঠবে তার প্রতিদ্বন্দ্বী। বরং সে উলটো, স্থানীয় ধনতন্ত্রের অভ্যুদয়ে বাধার সৃষ্টি করে —যেমন করেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আমাদের এই দেশে।

(৭) অতীতে যখন আধুনিক শ্রমিক শ্রেণী এবং তার পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি, সংগঠিত হয়নি, তখন ধনিক শ্রেণী সামন্ততন্ত্রের (এবং পরাধীন দেশে সাম্রাজ্যবাদের) অবসান ঘটাবার জন্য আপসহীন সংগ্রাম চালিয়ে যেত। কিন্তু বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার এবং জাতীয় স্তরে শ্রমিক শ্রেণী এবং তার পার্টি (ও ফ্রন্ট) সংগঠিত হওয়ায় ধনিক শ্রেণী আর আপসহীনভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যায় না; একটা পর্যায়ে এসে আপস করে নেয়, কেননা সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যেতে থাকলে কমিউনিস্ট পার্টি ও তার মিত্র পার্টিগুলির নেতৃত্বে শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষকসমাজে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কেবল সামন্তবাদের ও সাম্রাজ্যবাদের অবসানই ঘটাবে না, ধনতন্ত্রের উপরেও চরম আঘাত হানবে এবং এগিয়ে যাবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে। সুতরাং অতীতে যখন সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অভিযানে (অর্থাৎ গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে) শেষ পর্যন্ত নেতৃত্ব দিত ধনিক শ্রেণী, আজ তারা তা দেয় না। তাই এই অভিযানে নেতৃত্ব দানের দায়িত্বও একটি পর্যায়ে বহন করতে হবে শ্রমিক শ্রেণী ও তার পার্টিকে। যেমন আমাদের দেশে। এখানে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের একটি পর্যায় পর্যন্ত এসে ধনিক শ্রেণী এবং তার পৃষ্টপোষিত কংগ্রেস-নেতৃত্ব আপস করে নিল সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে এবং শরিকানা করে নিল সামন্তবাদের সঙ্গে, ফলে দেশ রাজনৈতিক দিক থেকে স্বাধীন হল বটে, কিন্তু গণতান্ত্রিক বিপ্লব রয়ে গেল অসম্পূর্ণ। তাই সেই অসম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সুসম্পূর্ণ করে, দেশকে সমাজতান্ত্রিক উত্তরণের লক্ষ্যে পরিচালিত করার দায়িত্ব পালন করতে হবে কৃষক ও অন্যান্য শোষিত, পীড়িত জনসংখ্যার সহযোগে শ্রমিক শ্রেণীকে—গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টের সহযোগে কমিউনিস্ট পার্টিকে।

[২]

ইংরেজি 'নেশন' এসেছে ল্যাটিন 'নেশিও' থেকে এবং বাংলা 'জাতি' সংস্কৃত 'জন' থেকে। 'নেশিও' এবং 'জন' দুটি ধাতুই জন্মসূচক। 'নেশন' তথা 'জাতি' কথাটিরও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ তাই। এমন একটি জনসংখ্যা যারা একই পূর্বপুরুষ থেকে জাত। এই কারণেই একদা রক্তের অভিন্নতাকে গণ্য করা হত জাতির অন্যতম বৈশিষ্ট বলে। তার পরে এক সময় এল যখন রক্তের অভিন্নতার স্থান গ্রহণ করল ধর্মের অভিন্নতা। কিন্তু আধুনিককালে 'নেশন' বা 'জাতি' বলতে আমরা যে জনসমষ্টিকে

বুঝি, রক্তের অভিন্নতা বা ধর্মের অভিন্নতা কোনোটাই তার বৈশিষ্ট্য নয়। তাহলে সেই জনসমষ্টির বৈশিষ্ট্য কি?

মার্কসবাদের মর্ম অনুযায়ী লেনিন যে নীতি নির্দেশ করেন, তদনুসারে স্তালিন 'নেশন' বা জাতির সংজ্ঞা দেন এইভাবে: "জাতি হচ্ছে একটি অভিন্ন ভাষা, ভূখণ্ড, অর্থনৈতিক জীবন এবং মনস্তাত্ত্বিক গড়ন—যা অভিব্যক্তি পায় একটি অভিন্ন সংস্কৃতিতে—তার ভিত্তিতে গঠিত, ঐতিহাসিকভাবে উন্মেষিত, একটি সুস্থিত জনসমষ্টি।" অতএব দেখা যাচ্ছে, রক্তের অভিন্নতা বা ধর্মের অভিন্নতা নয়, ভাষার অভিন্নতা, বাসভূমির অভিন্নতা, অর্থনৈতিক জীবনের অভিন্নতা, মনস্তাত্ত্বিক গড়ন তথা সংস্কৃতির অভিন্নতাই হ'ল জাতির বৈশিষ্ট্য। বলা বাহুল্য, এবংবিধ অভিন্নতা একটি আকস্মিক ঘটনা হতে পারে না; তা আবশ্যিকভাবেই হবে ঐতিহাসিক পরম্পরার সুস্থিত পরিণতি। এই সঙ্গে উল্লেখ্য, উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির কোনো একটিও পরিহার্য নয়, সবকটিই অপরিহার্য। অতএব, একটি মাত্র বৈশিষ্ট্যেরও অভাব থাকলে, সংশ্লিষ্ট জনসমষ্টি কোনো মতেই জাতিত্বে উন্নীত হতে পারে না।

জাতি বলতে আমরা এখন যা বুঝি, ধনতন্ত্রের আগে তার অস্তিত্ব ছিল না, থাকতেও পারে না। সামন্ততন্ত্রের যুগে দেশ ও তার জনসংখ্যা থাকে বহু ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগের প্রায় সর্বময় কর্তৃত্ব থাকে এক একজন সামন্ত প্রভু বা জমিদারের হাতে। রাজশক্তিও থাকে সামন্ততান্ত্রিক এবং তার প্রথম ও প্রধান কাজ হয় সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিরক্ষা। ইতিমধ্যে উদ্ভব ঘটে ধনতন্ত্রের এবং সেই সঙ্গে ধনিকশ্রেণীর নবজাত ধনতন্ত্রে প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের জন্য উদীয়মান ধনিক শ্রেণীর চাই সারা দেশজুড়ে বাজার। আর এই দেশ জোড়া বাজারের বিস্তারের জন্য চাই সামন্ততান্ত্রিক ভাগ বিভাগের তথা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান। তাই ধনিক শ্রেণী আহ্বান জানায় গোটা দেশের জনগণকে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে উপড়ে ফেলে এক জাতি হিসাবে অভ্যুত্থানে। এইভাবেই আসে 'এক জাতি, এক প্রাণ, একতা'র স্লোগান। আসে জাতীয়তাবাদ এবং কালক্রমে ঘটে জাতির আত্মপ্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা। এই জন্যই মার্কসবাদীদের মতে, "জাতি হচ্ছে একটি বিশেষ ঐতিহাসিক যুগের ব্যাপার—উদীয়মান ধনতন্ত্রের যুগের ব্যাপার। সামন্ততন্ত্রের বিলোপ এবং ধনতন্ত্রের বিকাশের প্রক্রিয়াটি আবার একই সঙ্গে জনসংখ্যার জাতিতে পরিণত হবার প্রক্রিয়াও বটে।"...."ধনিকশ্রেণী গ্রহণ করে নেতৃত্বের ভূমিকা। তরুণ ধনিকশ্রেণীর প্রধানসমস্যা হচ্ছে বাজারের সমস্যা। ....বাজারই হচ্ছে প্রথম পাঠশালা, যেখানে ধনিকশ্রেণী জাতীয়তাবাদের হাতে খড়ি দেয়।

—'দেশের মানুষকে' আহ্বান জানায় এবং 'পিতৃভূমি'র আওয়াজ তোলে।....'দেশের মানুষও' সাড়া দেয়, পতাকার চারপাশে এসে জড়ো হয়, কেননা তারাও তো অত্যাচারিত ও অসন্তুষ্ট। এই ভাবেই শুরু হয় জাতীয় আন্দোলন।" (দ্রষ্টব্য: Stalin, Works, Vol-2 P. 303-313)।

তা হলে এই হচ্ছে জাতি, জাতীয়তা বা জাতীয় আন্দোলন—ধনতন্ত্রের উন্মেষ ও বিকাশের সঙ্গে যার উন্মেষ ও বিকাশ ওতপ্রোত, স্বদেশে আত্মপ্রতিষ্ঠার যুগে যা থাকে পরম প্রগতিশীল কিন্তু কালক্রমে স্বদেশের বাইরে আত্মপ্রসারের তৎপরতায় যা পরিণত হয় সাম্রাজ্যবাদে (তথা ফ্যাসিবাদে) এবং হয়ে ওঠে চরম প্রতিক্রিয়াশীল। আর এইখানেই জাতীয়তাবাদ এবং দেশপ্রেমের মধ্যে পার্থক্য। জাতীয়তাবাদ একটি নির্দিষ্ট যুগসাপেক্ষ—ধনতান্ত্রিক যুগসাপেক্ষ; ধনতন্ত্রের উদয়ের সঙ্গে তার উদয় এবং ধনতন্ত্রের বিদায়ের সঙ্গে তার বিদায়। কিন্তু দেশপ্রেম যুগ-নিরপেক্ষ। সেই আদি যুগে যখন যাযাবর মানুষ একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসতি স্থাপন ক'রে সেখানে বসবাস শুরু করল তখন থেকেই তার সূচনা। তারপর দাস যুগ থেকে সামন্ত যুগ, সামন্ত যুগ থেকে ধনতান্ত্রিক যুগ, ধনতান্ত্রিক যুগ থেকে সমাজতান্ত্রিক যুগ অবধি 'দেশ' কথাটির অর্থও যেমন বিস্তার লাভ করেছে, তেমন বিস্তার লাভ করেছে দেশপ্রেমের পরিধিও। দূর ভবিষ্যতে সাম্যবাদের যুগে যখন ভেঙে পড়বে রাষ্ট্র ব্যবস্থা, উঠে যাবে রাষ্ট্রীয় সীমানা, তখন দেশ এবং বিশ্ব, দেশপ্রেম এবং বিশ্বপ্রেম হয়ে যাবে একাকার। দেশপ্রেমের এই আবহমান ধারায় তা জাতীয়তাবাদের সহগামী হয় একটি মাত্র ক্রান্তিকালীন পর্যায়ে—ধনতন্ত্রের প্রগতিশীল পর্যায়ে। এবং এই সময়ে কমিউনিস্ট দেশপ্রেমিকরা আর জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিকরা হাতে হাত দিয়ে অগ্রসর হয়।

"এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে" যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রাদুর্ভাব ও প্রতিষ্ঠা ঘটে তখন সমস্ত ভারতবাসী আসমুদ্র হিমাচল এক অভিন্ন সুবিশাল উপ-মহাদেশের অধিবাসী হলেও, ভাষা, অর্থনৈতিক জীবন, মানসিক গড়ন তথা সংস্কৃতির দিক থেকে অভিন্ন ছিল না। সকলেই ভারতবাসী ছিল, ভারতীয় ছিল, ঠিকই, কিন্তু একই জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল না—ছিল বহু জাতিসত্তায় বিভক্ত। কালক্রমে ভারতেও গড়ে উঠল স্বদেশী ধনতন্ত্র, স্বদেশী ধনিকশ্রেণী। এই নবজাত ধনতন্ত্রের বিকাশের জন্য তাদেরও চাই ক্রমবর্ধমান বাজার। এখানেই দেখা দিল দ্বন্দ্ব। একে তো বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ এবং তার পৃষ্ঠপোষিত স্বদেশী সামন্তবাদের শোষণে জনগণের ক্রয়শক্তি, তথা দেশের বাজার সীমিত, তার উপরে আবার যতটাও বা ছিল, তার উপরেও একচ্ছত্র আধিপত্য ভোগ করত বৃটিশ ধনিকশ্রেণী। তারা কিছুতেই ভারতীয় ধনিকদের জন্য স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেবে না নিজেদের বাজারের কোনো অংশ। রাষ্ট্র ক্ষমতা তাদের হাতে; আইনি-বেআইনি যাবতীয় উপায়ে তারা সক্রিয় হল নবজাত ভারতীয় ধনতন্ত্রকে তার আঁতুড়েই বিনাশ করতে। নিরুপায় ভারতীয় ধনিকেরা তখন আবেদন জানালো জনগণের কাছে—দেশের স্বার্থের নামে। সেই আবেদন স্বাভাবিকভাবেই সাড়া দিল ভারতের জনগণ, যারা উদ্বুদ্ধ হল এক ব্রিটিশ-বিরোধী ভারতীয়তায়, আন্দোলনে সামিল হল কংগ্রেসের নেতৃত্বে, দাবী করল স্বায়ত্তশাসন এবং স্বদেশী শিল্প প্রসারের অধিকার। ক্রমে ক্রমে এই দাবি পরিণত

হল স্বাধীনতার দাবিতে। বিভিন্ন জাতিসত্তার অন্তর্গত ভারতবর্ষের জনগণের মধ্যে এইভাবে উদ্ভূত হল এক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভারতীয়তা বোধ।

এই ভারতীয়তা আর যাই হোক, একজাতিকতা নয়, বহুজাতিকতা-ভিত্তিক ঐক্যবোধ। কিন্তু ইতিমধ্যেই কিছু শক্তি সঞ্চয় করে ভারতের উদীয়মান বুর্জোয়া গোষ্ঠী নিজেকে ভাবতে শুরু করেছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবর্তমানে বহু-বিস্তৃত ভারতীয় বাজারের একচ্ছত্র উত্তরাধিকারী হিসাবে এবং কংগ্রেস নেতৃত্বও জনগণের সামনে তুলে ধরতে শুরু করেছে একটি এক-কেন্দ্রিক স্বাধীন ভারতের চিত্র। এদিকে স্বাধীনতা-আন্দোলনের কল্যাণে এবং দু'দুটি বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে কেবল প্রথম যুগের ধনিকেরাই বৃহৎ ধনিকে পরিণত হয়নি, সেই সঙ্গে বিভিন্ন জাতিসত্তার মধ্যেও গড়ে উঠেছে নতুন নতুন ধনিক গোষ্ঠী এবং দেখা দিয়েছে অগ্রজ বৃহৎ ধনিক গোষ্ঠীর সঙ্গে অনুজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধনিক গোষ্ঠীর স্বার্থের সংঘাত, বাজার নিয়ে বিরোধ। এই অনুজ ক্ষুদ্র ধনিক গোষ্ঠীগুলির ভয় হল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসানে ভারতে যদি প্রতিষ্ঠিত হয় এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা, তা হলে গোটা ভারতের বাজারে আধিপত্য করবে ঐ অগ্রজ বৃহৎ ধনিক-গোষ্ঠী, এবং তারা হয়ে পড়বে একেবারে কোণঠাসা। তাই তারা দাবি করল ভাষা-ভিত্তিক (তথা জাতিসত্তা-ভিত্তিক) রাজ্য গঠন এবং রাজ্যের হাতে যথাসম্ভব অধিক ক্ষমতা সহ একটি যথার্থ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন। এই দাবির প্রতি বৃহৎ ধনিক-গোষ্ঠী এবং কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরোধিতার ফলে বিভিন্ন জাতিসত্তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধনিক-গোষ্ঠীর মধ্যে দেখা দিল বিক্ষোভ এবং তা সঞ্চারিত হল সেই সেই জাতিসত্তার জনগণের মধ্যে।

এই বিক্ষোভের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং মুসলিম লিগ। ঐতিহাসিক কারণেই ভারতের অগ্রজ বৃহৎ ধনিক গোষ্ঠীর সকলেই ছিল হিন্দু বা পার্সি যাদের হিন্দু বলেই ধরা হয়। ধর্মের দিক থেকে হিন্দুর পরেই মুসলিমরা সংখ্যাবহুল এবং কয়েকটি প্রদেশে তারা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। উদীয়মান মুসলিম ধনিকদের জন্য বাজার সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্ররোচনায়, মুসলিম লিগ দাবি করল মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলি নিয়ে স্বতন্ত্র এক রাষ্ট্র—পাকিস্তান। এবং তা পেয়েও গেল। ধর্ম যে জাতিসত্তার বৈশিষ্ট্য নয়, মুসলিমরাও যে নানা জাতিসত্তায় বিভক্ত, পাকিস্তানের পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহই তার প্রমাণ। সে কথা যাক। কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে, এককেন্দ্রিকতার প্রতি কংগ্রেসের পক্ষপাতও এর জন্য কিছুটা দায়ী। কমিউনিস্ট পার্টিরও কিছুটা নৈতিক দায়িত্ব আছে, কিন্তু সেটা অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে।

ত্রিশের দশকের গোড়ার দিকেই অবশ্য কংগ্রেস নেতৃত্ব অনিচ্ছা সত্ত্বেও নীতিগত-ভাবে ভাষাগত (অর্থাৎ জাতিগত ভিত্তিতে, প্রদেশ গঠনের এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান

প্রবর্তনের দাবি মেনে নিয়েছিল তবে প্রদেশগুলির জন্য খুবই সীমিত ক্ষমতার সংস্থান-সহ। বস্তুত পক্ষে পরাধীন ভারতবর্ষে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে কার্যতঃ এই নীতিকে আংশিকভাবে রূপ দেওয়া হয়েছিল। পরে অঙ্গচ্ছিন্ন স্বাধীন ভারতে ১৯৫০ সালে যে নতুন সংবিধান গৃহীত হয়, তদনুসারে ভাষার (তথা জাতিসত্তার) ভিত্তিতে অঙ্গরাজ্যগুলি পুনর্গঠিত হয় এবং সেগুলির হাতে কিছু ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়। কিন্তু যেমন পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু গোঁজামিল দেওয়া হয়, তেমনি বাহ্যতঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো চালু করলেও কার্যতঃ রাজ্যগুলিকে প্রাপ্য ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করা হয়। পরবর্তীকালে আন্দোলনের মাধ্যমে অন্ধ্র প্রভৃতি নতুন নতুন রাজ্য গঠন করতে হয় এবং রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে ক্ষমতা পুনর্বণ্টনের ব্যাপারটি সম্পর্কে একটি কমিশন নিয়োগ করতে হয়।

কিন্তু অসম বিকাশের দরুন ভারতের সমস্ত জাতিসত্তা তো সমভাবে এবং একই সময়ে বিকাশ লাভ করেনি, যেমন সব জাতিসত্তার মধ্যে ধনিক শ্রেণী যুগপৎ গড়ে ওঠেনি। ভারতের সংবিধানে বিকশিত জাতিগুলির জন্য রাজ্য এবং সীমিত ক্ষমতার সংস্থান থাকলেও, বিকাশমান জাতিসত্তাগুলির জন্য কোনো স্বয়ংক্রিয় স্বীকৃতিদানের সংস্থান নেই এবং তা না থাকার জন্যই এই উদীয়মান জাতিসত্তাগুলির তা আদায় করতে হয় আন্দোলনের মাধ্যমে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, যথাসময়ে এই ন্যায্য দাবি মেনে না নেওয়ার সুযোগেই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি এই রকমের আন্দোলনকে বিপথ চালিত করতে সক্ষম হয় বিভেদপন্থা ও বিচ্ছেদবাদের দিকে। দল-নির্বিশেষে মার্কসবাদীরা চায় অভেদ্য ও অজেয় রাষ্ট্রীয় সংহতি এবং সেই জন্যই এক দিকে দাবি করে রাজ্যের হাতে অধিকতর ক্ষমতা এবং উদীয়মান জাতিসত্তার জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্যের অভ্যন্তরে আঞ্চলিক স্বয়ংশাসন ('রিজিওনাল অটোনমি')।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, এক সময়ে ভারতের কমিউনিস্টরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার সংস্থান সহ জাতীয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার সমর্থন করত এবং এরই ভিত্তিতে মুসলিম-প্রধান জাতিসত্তাগুলি ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে পাকিস্তান গঠনের দাবিকে সমর্থন করেছিল। কিন্তু তাও করেছিল এই ভ্রান্ত প্রত্যাশায় যে, এই অধিকার মেনে নিলে মুসলিম জনগণের হিন্দু আধিপত্যের ভয় দূর হবে এবং তারা এই অধিকার প্রয়োগ করবে না, যেমন বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার থাকা সত্ত্বেও সুবিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ স্ত্রী বা স্বামী তা প্রয়োগ করে না। ফলে স্বেচ্ছাকৃত মিলনের ফলে সংহতি হবে সুদৃঢ় ও সুস্থিত। কমিউনিস্টদের এই অবস্থানের ভিত্তি ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানের যান্ত্রিক প্রয়োগ এবং দারুণভাবে ভ্রান্ত উপলব্ধি। জারের রুশ সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় সীমানার অন্তর্ভুক্ত ছিল তার নিজের দেশ রাশিয়া এবং তার পদানত প্রায় দেড় ডজন বৃহৎ জাতিসত্তা এবং বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র জাতিসত্তা। এই বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সমস্ত জাতিসত্তাগুলি কেবল রাজনৈতিক ভাবেই রুশ সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা শাসিত হত না অর্থনৈতিক দিক থেকেও হত শোষিত এবং ভাষাগত ও

সাংস্কৃতিক দিক থেকেও হত অবদমিত। কমিউনিস্টরা তাই সমস্ত বৃহৎ জাতিসত্তাগুলির জন্য দাবি করেছিল রুশ সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার সংস্থান-সহ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলির জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার সংস্থান-ছাড়া আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। এবং বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত সংবিধানে বিধৃত করা হয় এই দ্বিবিধ অধিকারই। আমাদের এই স্বাধীন ভারতে কিন্তু এমন কোনো বিশেষ জাতি বা রাজ্য নেই, যা বাদবাকি জাতি বা জাতিসত্তাগুলিকে শাসন, শোষণ বা অবদমন করছে। অর্থাৎ এখানে যেমন সাম্রাজ্যবাদী অধি-জাতিও নেই, তেমনি উপনিবেশতুল্য অধীন জাতিসত্তাও নেই। সুতরাং এখানে কারো বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার অধিকারের কথাই উঠতে পারে না। আরেকটি কথা, সোভিয়েত সংবিধানে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার অধিকার থাকা সত্ত্বেও, ব্যতিক্রম হিসাবে ছাড়া, সেই অধিকার যে সেখানে প্রযুক্ত হয়নি, তার কারণ সেখানে ধনিক শ্রেণীকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করেছে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি এবং সচেষ্ট হয়েছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সংস্থাপনে। ফলে বিভিন্ন ধনিক গোষ্ঠীর মধ্যে বাজার নিয়ে সংঘাত এবং পরিণামে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার প্রবণতাও সেখানে নেই। শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ তো বিচ্ছিন্নতায় নয়, সংহতিতে। কিন্তু ভারতের অবস্থা আগেও যেমন ছিল মূলতঃ ভিন্ন, এখনো তাই আছে। এখানে ধনিক শ্রেণীরই আধিপত্য, এবং তাদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ রোধ করার ক্ষমতা শ্রমিক শ্রেণী বা তার পার্টির নেই। অতএব, এখানে সংবিধানে বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার থাকলে, তা ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হবারই আশংকা।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, রাষ্ট্রীয় সংহতিকে অবশ্যই করে তুলতে হবে অভেদ্য ও অজেয় এবং সেই জন্যই রাজ্যগুলিকে দিতে হবে আরো ক্ষমতা, বিকাশমান জাতিসত্তাগুলিকে দিতে হবে স্বশাসনের অধিকার এবং সেই সঙ্গে বড়-ছোট নির্বিশেষে সমস্ত জাতি বা জাতিসত্তার শ্রমিক শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের লক্ষ্যে। মনে রাখতে হবে, শ্রমিক শ্রেণীর সংহতি এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাই হল রাষ্ট্রীয় সংহতির অমোঘ ও চূড়ান্ত রক্ষাকবচ।

২।৯,৮৬

পুনশ্চ জাতি এবং জাতীয়তাবাদ

'জাতি' ও 'জাতীয়তাবাদ' নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা ও সমালোচনা থেকে আমার ধারণা হয়েছে যে, কথা দুটির অর্থ নিয়ে কেবল মত-বিভেদই নেই, মত-বিভ্রান্তিও আছে। এর অনেকটা কারণ এই যে, দুটি কথাই ব্যবহৃত হয় একাধিক অর্থে। ইংরেজি 'কাস্ট' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে 'জাতি' কথাটির ব্যবহার বাদ দিলেও বাংলা 'জাতি' কথাটি ইংরেজি 'নেশন' কথাটির মত ব্যবহৃত হয় 'জাতি' এবং 'রাষ্ট্র' দুটি অর্থেই। অন্যদিকে, 'জাতীয়তাবাদ' কথাটির প্রয়োগ করা হয় কখনো একটা 'মতবাদ' বোঝাতে; কখনো একটা 'বোধ' বা 'অনুভূতি' বোঝাতে। মতবাদ হিসাবে এটা বিদেশ-জাত অর্থাৎ বিদেশীয়, কেননা ইংল্যাণ্ডের জন স্টুয়ার্ট মিল এর প্রবর্তক। কিন্তু বোধ বা অনুভূতি হিসাবে এটা সর্বদেশীয় কেননা সব দেশেই ইতিহাসের একটি বিশেষ যুগে এর আবির্ভাব ঘটে। এই দুটি কথা নিয়ে সাধারণ ভাবে আমি যে যে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি, নিচে আমি একে একে সেগুলির উত্তর দিতে চেষ্টা করব।

প্রথম প্রশ্ন : জাতীয়তাবাদ কি বিদেশী ?

উত্তর : নিশ্চয়ই নয়, অনুভূতি হিসাবে জাতীয়তাবাদ খাঁটি স্বদেশী। স্বাধীন দেশে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ও বিস্তার ঘটে বিদ্যমান সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে উদীয়মান ধনতন্ত্রের সংগ্রামের মাধ্যমে। আর পরাধীন দেশে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ও বিস্তার ঘটে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ এবং তার পৃষ্ঠপোষিত স্বদেশী সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে স্বদেশী উদীয়মান ধনতন্ত্রের সংগ্রামের মাধ্যমে। কেন এবং কি ভাবে, তা আমি আগেই আমার লেখায় ব্যাখ্যা করেছি। এতএব পুনর্ব্যাখ্যান নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং প্রত্যেক দেশেই জাতীয়তাবাদ সেখানকার স্বদেশজাত, অর্থাৎ স্বদেশী।

উল্লিখিত প্রশ্নটি উঠেছে আমার "বিজাতীয় এই 'জাতীয়' কথাটি" শীর্ষক লেখাটির শিরোনাম ও বক্তব্যের ভুল বোঝা থেকে। লক্ষণীয় যে, এখানে বলা হয়েছে, 'জাতীয়' কথাটির কথা, জাতীয়তাবাদের কথা নয় এবং এই কথাটির পরিহার দাবি করা হয়েছে একটি মাত্র বিশেষ ক্ষেত্রে—'জাতীয় সংহতি'র ক্ষেত্রে এবং প্রস্তাব করা হয়েছে যে, আমাদের দেশ এই ভারতের বেলায় 'জাতীয় সংহতি' না বলে বলা হোক 'রাষ্ট্রীয় সংহতি'। কেন, তাও আমি আমার লেখায় বলেছি। ইংরেজিতে 'নেশন্'-এর মানে দু'টি—জাতি এবং রাষ্ট্র। কিন্তু যেহেতু ইংল্যাণ্ড একটি জাতি নিয়ে গঠিত, তাকে জাতি এবং রাষ্ট্র দুইই বলা যায়। তবে ভারত একটি জাতি নিয়ে গঠিত নয়, বহু জাতি নিয়ে গঠিত; তাই তাকে কেবল

রাষ্ট্র বলা যায়। জাতি বলা যায় না। যেখানে ইংল্যাণ্ডের সংহতি মানে একটি রাষ্ট্রের মধ্যে একটি জাতির সংহতি, সেখানে ভারতের সংহতি মানে একটি রাষ্ট্রের মধ্যে বহু জাতির সংহতি। সুতরাং, ইংল্যাণ্ডের বেলায় 'জাতীয় সংহতি' কথাটি সুপ্রযুক্ত হলেও ভারতের ক্ষেত্রে নয়; এখানে প্রয়োগ করা সমীচীন 'রাষ্ট্রীয় সংহতি' কথাটি। 'জাতীয়' কথাটির বিজাতীয় প্রয়োগটিকে এখানে অন্ধভাবে অনুকরণ করলে এবং তদনুযায়ী আচরণ করলে তা হবে আমাদের দেশের পক্ষে ক্ষতিকর; যেমন ইংল্যাণ্ডে সংহতির অন্যতম শর্ত হ'ল একটিমাত্র কেন্দ্রে সমস্ত ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ, যে, জিনিস ভারতে করতে গেলে সেটা সংহতির সহায়ক না হয়ে হবে সংহারক। তাই আমার প্রস্তাব, ভারতের সংহতির বেলায় এই বিভ্রান্তিকর 'জাতীয়' বিশেষণটি পরিহার করে ব্যবহার করা হোক, 'রাষ্ট্রীয়' বিশেষণটি।

কেউ কেউ আশংকা প্রকাশ করেন, তা করলে নাকি সর্বনাশ হয়ে যাবে। তাঁরা কিন্তু বলেননা যে-হিন্দি ভাষা ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার ভাষা, এমনকি রাষ্ট্র-ভাষা, সেই ভাষায় অনেককাল ধরেই চালু আছে 'রাষ্ট্রীয় সংহতি' কথাটি; তাতে যদি ইতিমধ্যে সর্বনাশ হয়ে গিয়ে না থাকে, তাহলে বাংলা ভাষায় ঐ কথাটি চালু করলে কী সর্বনাশ হতে পারে? কেউ কেউ আবার বলেন, রাষ্ট্র ভাগ হয়ে গেলেও জাতি থেকে যায়, যেমন পশ্চিম জার্মানি ভাগ হয়ে গেলেও জার্মান জাতি থেকে গেছে। সেই দিক থেকে 'রাষ্ট্রীয়' কথাটি ব্যবহার না করে 'জাতীয়' কথাটিই ব্যবহার করা ভাল। এঁদের নিহিত বক্তব্য সম্ভবতঃ এই যে, ভারতীয়রা এক জাতি; আজ তারা ভারত এবং পাকিস্তান দুই রাষ্ট্রে ভাগ হয়ে গেলেও একই জাতি থেকে গিয়েছে; সুতরাং আমাদেরও 'জাতীয়' কথাটি চালিয়ে যাওয়া উচিত। যুক্তিটি আমার বোধগম্য হ'ল না। এঁরা কি তা হলে 'জাতীয় সংহতি বলতে বোঝাতে চান 'ভারত-পাকিস্তান' সংহতি ?

দ্বিতীয় প্রশ্ন: ধনতন্ত্রের উন্মেষ ও বিকাশের সঙ্গে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও বিকাশ যদি ওতপ্রোত হয়, তা হলে জাতীয়তাবাদও কি ধনতন্ত্রের মত প্রতিক্রিয়াশীল নয়?

উত্তর: প্রশ্নকর্তারা, বোধহয় ধরে নেন যে, ধনতন্ত্র সব সময়েই প্রতিক্রিয়াশীল এবং তা থেকে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, 'প্রতিক্রিয়াশীল ধনতন্ত্রের সঙ্গে ওতপ্রোত হওয়ায় জাতীয়তাবাদও প্রতিক্রিয়াশীল। কিন্তু ধনতন্ত্রও যেমন সব সময়ে প্রতিক্রিয়াশীল নয়, জাতীয়তাবাদও তেমন সব সময়ে প্রতিক্রিয়াশীল নয়। বরং একটা পর্যায় পর্যন্ত উভয়েই কেবল প্রগতিশীলই নয়, বৈপ্লবিকও বটে। গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পাদনের লক্ষ্যে উদীয়মান ধনতন্ত্র যখন সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটাবার জন্য সংগ্রাম করে, তখন তা ধনতন্ত্রের বিকাশ ও বিস্তার সাধনের জন্য হলেও, নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক। ধনতন্ত্রের বিকাশ ও বিস্তার সাধন তখন কেবল ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ নয়, মুষ্টিমেয় জমিদার শ্রেণী বাদে সমাজের সমস্ত শ্রেণীর স্বার্থ। এই বিপ্লবের ফলে কেবল বৈষয়িক উৎপাদন-

শক্তিই বাধামুক্ত হয় না, বাধামুক্ত হয় সাংস্কৃতিক সৃজন শক্তিও। কৃষক জমি পায়, শ্রমিক-কর্মচারী কাজ পায়, আর তা ছাড়াও পায় ভোটের অধিকারসহ অন্যান্য গণতান্ত্রিক অধিকার। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎসমুখ খুলে যায়, ঘটে নতুন নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবন। কূপমণ্ডুক চেতনা বৃহত্তর পরিধিতে মুক্তিলাভ করে। দূর হয় নিকট। এই সংগ্রামের মাধ্যমেই উন্মেষ ও বিকাশ লাভ করে জাতীয় চেতনা তথা জাতীয়তাবাদ। এই পর্যায়ে জাতীয়তাবাদের ভূমিকা সুনিশ্চিত ভাবেই প্রগতিশীল ও বৈপ্লবিক। আর তা ছাড়া, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বদেশী জাতীয়তাবাদ যখন মুক্তি সংগ্রামে ব্যাপৃত হয়, তখনও যে তা প্রগতিশীল ও বৈপ্লবিক তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কিন্তু এই পর্যায় চিরস্থায়ী হয় না। কালক্রমে প্রতিযোগিতামূলক ধনতন্ত্র পরিণতি লাভ করে একচেটিয়া ধনতন্ত্রে। তথা সাম্রাজ্যবাদে। নিজের দেশের গণ্ডী পার হয়ে তা হাত বাড়ায় অন্য দেশে, লুন্ঠন করে সে দেশের স্বাধীনতা ও সম্পদ। এই আগ্রাসী ধনতান্ত্রিক দেশের জাতীয়তাবাদ তখন পরিণত হয় সাম্রাজ্যবাদী জাতীয়তাবাদে— প্রায় দু'শ বছর ধরে আমরা ছিলাম যার ভুক্তভোগী। সেই সাম্রাজ্যবাদী জাতীয়তা-বাদের উগ্রতম রূপই হল নাৎসিবাদ বা ফ্যাসিবাদ। এই সাম্রাজ্যবাদী জাতীয়তাবাদ স্পষ্টতই চরম প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রতিবিপ্লবী। যেহেতু রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক অন্তর্বস্তু হচ্ছে ধনতন্ত্র এবং ধনতন্ত্রের প্রবণতা হচ্ছে একচেটিয়াবাদের দিকে, সেই হেতু জাতীয়তাবাদের মধ্যে নিহিত থাকে সাম্রাজ্যবাদের তথা নাৎসিবাদ বা ফ্যাসীবাদের সম্ভাব্য বিপদ। এই কারণেই সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে উদীয়মান ধনতন্ত্রের সংগ্রামে এবং সাম্রাজ্যবাদী জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে স্বদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে কমিউনিস্টরা জাতীয়তাবাদীদের ঐকান্তিক সহযোদ্ধা হলেও তাঁরা নিজেদের 'জাতীয়তাবাদী' (Nationalist) বলেন না; বলেন 'দেশপ্রেমিক' ('Patriot')।

তৃতীয় প্রশ্ন: যদি রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদী না হন, তা হলে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে অন্দোলনে তাঁর ভূমিকার ব্যাখ্যা কি?

উত্তর: আসমুদ্র হিমাচল এই দেশের সমস্ত অধিবাসীই একটি জাতি—এই বিশ্বাসই যদি হয় জাতীয়তাবাদ, তা হলে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই জাতীয়তাবাদী নন। তাঁর মতে, ভারত অতীতে কোনো দিন জাতি ছিল না, ভবিষ্যতেও কোনো দিন জাতি হবে না। তাঁর কথাই উদ্ধৃত করা যাক: "It was upon this remote portion of humanity.... that the Nation of the West burst in.... But this time, we had to deal.... with a Nation—we, who are no nation ourselves" (Nationalism, pp 45,). আবার "India has never had a real sense of nationalism" (p 64). If we cherish the desire of paying our all to

buy a political nationality it will be as absurd as if Switzerland had staked her existence on her ambition to build up a navy powerful enough to compete with that of England" (p 55)

এই যদি হয় রবীন্দ্রমানসের প্রকাশ তাহলে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনে তাঁর উদ্দীপ্ত ভূমিকা, তাঁর উদ্দীপনাসঞ্চারী সঙ্গীতসমূহ, তাঁর স্বদেশী সমাজের কর্মসূচী—এ সবের ব্যাখ্যা কি? এ সবের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় বাঙালির একজাতিকতায় রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসে এবং সাম্রাজ্যবাদের খড়্গাঘাতের বিরুদ্ধে তা রক্ষায় তাঁর ব্যগ্রতায়। এই বিশ্বাস ও ব্যগ্রতাই অভিব্যক্তি পেয়েছে তাঁর 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' প্রভৃতি গানে। 'রাখীবন্ধন' অনুষ্ঠানে এবং স্বদেশী সমাজের পরিকল্পনায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথেরও আগে এই বাঙালি জাতীয়তা যাঁর মানসচক্ষে প্রতিভাত হয়েছিল তিনি বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর 'বন্দেমাতরম' শুরুতে ছিল এই বাঙালি জাতীয়তারই মন্ত্র। স্মরণীয় যে, মূল বন্দেমাতরম সঙ্গীতে বাংলার তৎকালীন জনসংখ্যা 'সপ্তকোটি' কণ্ঠের এবং তাদের 'দ্বিসপ্ত কোটি ভুজের' কথাই বলা হয়েছিল। পরে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের শিখায় জলে উঠলো মারাঠি জাতীয়তা, পাঞ্জাবি জাতীয়তা ইত্যাদি। আর এই ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়তা পরিণতি লাভ করল এক অভিন্ন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতাকামী ভারতীয়তায়, যার রণ-সংগীত হিসাবে গৃহীত হ'ল 'বন্দেমাতরম্', আর সেই সঙ্গে 'সপ্ত কোটি' হল 'ত্রিংশ কোটি' (তৎকালীন ভারতের জনসংখ্যা) এবং 'দ্বিসপ্ত কোটি" হ'ল 'দ্বাত্রিংশ কোটি'।

আমি যেমন বুঝেছি, রবীন্দ্রনাথের ভারত হচ্ছে 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সাধক', রাজনীতির ভাষায় যাকে বলা যায়, 'বহু জাতির মধ্যে সংহতির সাধক'। তাঁর জনগণমন-অধিনায়ক সঙ্গীতে বিভিন্ন জাতিসত্তার বাসভূমি 'পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, মারাঠা, দ্রাবিড়, উৎকল, বঙ্গ' কি যথেষ্ট অর্থবহ নয়। তাঁর 'মহাজাতি সদন' নামকরণ কি যথেষ্ট ইঙ্গিতবহ নয়?

অতএব এটা পরিষ্কার যে, বঙ্গভঙ্গ রোধের আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকার ব্যাখ্যা খুঁজতে কষ্ট-কল্পিত ভারতীয় জাতীয়তাবাদের শরণ নেবার প্রয়োজন নেই, স্বতঃপ্রকট বাঙালি জাতীয়তাবোধই যথেষ্ট। আর এই জাতীয়তাবোধের স্বীকৃতি ও সুরক্ষার জন্য 'জাতীয়তাবাদ' অপরিহার্য নয়; যা অপরিহার্য, তা হ'ল 'দেশপ্রেম' এবং এই দেশপ্রেম জাতীয়তাবাদযুক্তও হতে পারে, আবার জাতীয়তাবাদ মুক্তও হতে পারে। এই দ্বিতীয়টিই হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের বেলায়।

উল্লিখিত বড় বড় প্রশ্নগুলি ছাড়া আরো কয়েকটি ছোট ছোট প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। যেমন (১) 'জাতি' যদি ধনতন্ত্রের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়, তা হলে প্রাক-ধনতান্ত্রিক যুগে 'জাতি' কথাটির উল্লেখ লক্ষ্য করি কেন? 'জাতি'র প্রতি আহ্বান

শুনি কেন ? (২) কমিউনিস্টরা যদি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী না হন, তা হলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে স্তালিন 'আমরা রাশিয়ানরা' বলে তাঁর বক্তৃতা শুরু করতেন কেন ? এবং (৩) সমস্ত ভারতীয়ই তো ভারতমাতার সন্তান, তা হলে তাঁরা এক জাতি নয় কেন ?

১ নং প্রশ্নের উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, প্রাক-ধনতান্ত্রিক যুগে 'জাতি' ('নেশন') কথাটি ব্যবহৃত হত 'রেস' অর্থে ; 'ফিকটের জার্মান জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ'-এও ঐ অর্থেই কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। "Being detersmines thinking". প্রাক-ধনতান্ত্রিক যুগে একটি দেশের মানুষ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে পরস্পরবিচ্ছিন্ন ভাবে এবং রাস্তাঘাটশূন্য যোগাযোগ-বিহীন অবস্থায় থাকত। তাতে জাতিত্ববোধ গড়ে উঠতে পারে না। ধনতন্ত্রই এই পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়ে জাতিত্ববোধের বাস্তব অবস্থা সৃষ্টি করে। প্রাক-ধনতান্ত্রিক 'সাম্রাজ্য' যেমন আধুনিক 'সাম্রাজ্য' থেকে আলাদা, তেমনি প্রাক-ধনতান্ত্রিক 'জাতি' ও আধুনিক 'জাতি থেকে আলাদা।

২ নং প্রশ্নের জবাবে আমার বক্তব্য এই যে, দীর্ঘ প্রায় দুই দশক ধরে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশনা ভবনে সম্পাদনা ও অনুবাদের দায়িত্বে থেকে এবং পরবর্তীকালে ১৪ খণ্ডে প্রকাশিত 'স্তালিন রচনাবলী'র প্রথম সম্পাদকের কর্তব্য পালন করেও, এমন একটি বক্তৃতা বা লেখা আমার নজরে পড়েনি, যেখানে স্তালিন 'আমরা রাশিয়ানরা' বলে আত্মপরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমরা সোভিয়েত জনগণ'। রাশিয়া হ'ল সোভিয়েত ইউনিয়নের বহু রাজ্যের মধ্যে একটি রাজ্য, রাশিয়ানরাও বহু জাতির মধ্যে একটি জাতি। স্তালিন নিজে জর্জিয়ান জাতির লোক। জারের আমলের রাশিয়ার আধিপত্য চূর্ণ করেই বর্তমান সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা। সে ক্ষেত্রে 'আমরা রাশিয়ানরা' বলে বক্তৃতা করলে সেখানকার বহুজাতির সংহতি শক্তিশালী না হয়ে বরং ব্যাহত হ'ত। উল্লেখযোগ্য যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে সোভিয়েত সংগ্রামকে ওঁরা বর্ণনা করেন 'দেশপ্রেমিক যুদ্ধ' বলে, 'জাতীয়তাবাদী যুদ্ধ' বলে নয়।

৩নং প্রশ্নটি সম্পর্কে আমার উত্তর এই যে, 'বিশ্বপিতা' বা 'ধরিত্রীমাতার' 'সন্তান- হয়েও যে কারণে সমস্ত বিশ্ববাসী এক জাতি নয়, সেই একই কারণে 'ভারত মাতা'র সন্তান হয়েও সমস্ত ভারতবাসী এক জাতি নই।

এই প্রসঙ্গ এই পর্যন্তই।

২৩|৯,৮৬

সংস্কৃতির স্বরূপ সন্ধানে

পুরনো প্রশ্নগুলিই আবার নতুন করে উত্থাপিত হ'ল: 'সংস্কৃতি' মানে কি? 'অপসংস্কৃতি' বলতেই বা কি বোঝায়? 'নব সংস্কৃতি' কথাটারই বা তাৎপর্য কি।

কেউ কেউ অবশ্য আপত্তি তোলেন, 'অপসংস্কৃতি' শব্দটিরই বিরুদ্ধে। বলেন, যা ভাল, তাই তো 'সংস্কৃতি'; অতএব, 'অপসংস্কৃতি' কথাটাই স্ববিরোধী। আমার মতে এই আপত্তি অকারণ। শরীরের সুস্থ অবস্থাকে বলা উচিত 'স্বাস্থ্য'; তবু আমরা 'সুস্বাস্থ্য', 'কুস্বাস্থ্য' বলি কেন? অতএব, 'সংস্কৃতি'র ক্ষেত্রেও 'শুভ' বা 'অপ' ব্যবহার করলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় না। সুতরাং যে কথাটা যেমন ভাবে চালু আছে, তেমন ভাবেই ব্যবহার করা হাক।

গোড়াতেই সবিনয়ে বলে নিতে চাই যে, উত্থাপিত প্রশ্নগুলি সম্পর্কে কর্তৃত্ব নিয়ে কিছু বলার অধিকার আমার নেই। আমার উদ্দেশ্য এই প্রশ্নগুলি নিয়ে একটি আলোচনার সূচনা করা। প্রত্যাশা, হয়ত সেই আলোচনার মাধ্যমে বেরিয়ে আসবে সঠিক ও সন্তোষজনক বক্তব্যসমূহ।

যত দূর মনে পড়ে, জার্মানির মহাকবি গ্যেটে কোথাও বলেছিলেন 'Art is Art because it is not Nature'. শিল্পকে শিল্প বলি কারণ তা 'প্রকৃতি' নয়। কথাটা ঠিক। মাটি শিল্প নয়, কিন্তু মাটির মূর্তি শিল্প। পাখির কাকলি শিল্প নয়, কিন্তু তার অনুকরণে মানুষের সুর শিল্প। আকাশে সূর্যের ছটা শিল্প নয়, কিন্তু তাঁর চিত্ররূপ শিল্প। 'আলোর নাচন পাতায় পাতায়' শিল্প নয়, কিন্তু কথার মাধ্যমে তার প্রকাশ শিল্প। হরিণের নৃত্যভঙ্গিমা শিল্প নয়, কিন্তু মানুষের নৃত্য ভঙ্গিমা শিল্প। প্রকৃতিতে যা যেমন ভাবে থাকে, যেমন ভাবে ঘটে, যেমন ভাবে অনুষ্ঠিত হয়. তা তেমনভাবে শিল্প নয়, 'প্রকৃতি'। মানুষ যেভাবে তাকে রূপায়িত করে, প্রকাশিত করে, অনুকৃত করে, তা প্রকৃতি নয় শিল্প।

গ্যেটের কথাটিকে একটু প্রসারিত করে আমরা বলতে পারি, সংস্কৃতিকে 'সংস্কৃতি' বলি কারণ তা 'প্রকৃতি' নয়। কেবল কারুশিল্প. চারুশিল্প, কথাশিল্পই নয়, 'সংস্কৃতি' বলতে আমরা বুঝি আরও অনেক অনেক কিছু। আমরা বুঝি মানুষের জীবিকা অর্জনের ধরণ-ধারণ, সমাজ বন্ধনের রূপ ও রীতি, প্রথা ও প্রতিষ্ঠান, উৎসব ও অনুষ্ঠান, জিজ্ঞাসা ও দর্শন, বিজ্ঞান ও উদ্ভাবন, সংগ্রাম ও সাধনা, ব্যর্থতা ও সাফল্য ইত্যাদি ইত্যাদি। এক কথায় বলা যায়, নিজেদের ক্রমবর্ধমান ও ক্রমবিকাশমান অভাববোধের তাগিদে প্রকৃতির উপরে সংস্কার সাধনের এবং সাধিত সংস্কার-সমূহের

উত্তরোত্তর উন্নতি বিধানের জন্য মানুষের যে অবিরাম বহুমুখী প্রয়াস, তারই ফলশ্রুতি হল 'সংস্কৃতি'—যা বিধৃত করে কেবল অতীতের উত্তরাধিকারই নয়, বর্তমানের সংযোজন ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনাও

মার্কস বলেছেন 'Man changes Nature and while changing Nature, he changes himself'. 'মানুষ প্রকৃতিকে পরিবর্তন করে এবং প্রকৃতিকে পরিবর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও পরিবর্তন করে।' আর উপরে যা বলা হয়েছে, তা থেকে এটা পরিষ্কার যে, এই দ্বিবিধ পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় ও পরিণতিতে যা কিছুর সৃষ্টি ও পুষ্টি ঘটে, তাই সংস্কৃতির উপাদান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই উপাদানগুলিও আবার দ্বিবিধ—ভিত্তিগত এবং সৌধগত। যেমন জীবন ধারণের তথা জীবিকা অর্জনের পদ্ধতি ও প্রকরণ হ'ল ভিত্তিগত উপাদান এবং তার উপরে গড়ে ওঠা চারু ও কারু শিল্প, প্রথা ও প্রতিষ্ঠান দর্শন ও সাহিত্য, বিধি ও বিধান ইত্যাদি হ'ল সৌধগত।

একটা দৃষ্টান্তের সহায্যে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করা যাক। আদিম মানুষ জীবিকা অর্জন করত শিকারের মাধ্যমে। সুতরাং শিকার করাটাই ছিল তাদের সংস্কৃতির মৌল বা ভিত্তিগত উপাদান। এই শিকার করতে গিয়ে তাদের গলা দিয়ে অনুকরণ করতে হ'ত পশুর ডাক, পাখির কাকলি, ঝরনার কলধ্বনি। এর ফলে তাদের স্বরে এলো সুর, জন্ম হল সঙ্গীতের। শিকারে সাফল্যের আনন্দে তারা মেতে উঠতো গোটা শিকার-কাণ্ডটির পুনরনুষ্ঠানে। এ থেকে জন্ম হ'ল অভিনয় ও নৃত্যের। দাবানলের অঙ্গার দিয়ে তারা গুহার গায়ে আঁকতো জন্তু-জানোয়ারের ছবি! এই ভাবেই এলো চিত্রকলা। ক্রমে ক্রমে মানুষ শিখলো চামড়া ও বাকল দিয়ে গা ঢাকতে, মাটি দিয়ে পাত্র গড়তে। এলো কারু শিল্প; এই কৌম জীবনধারাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতো বিবিধ ধ্যান-ধারণা এবং প্রথা ও অনুষ্ঠান; এইসব কিছুর যোগফলই হল তাদের সংস্কৃতির সৌধ বা উপরি-কাঠামো।

উপরে কথাটা বলা হলেও, এখানে তার পুনরুল্লেখ প্রয়োজন। বহিঃপ্রকৃতির পরিবর্তন ঘটাতে গিয়ে মানুষ পরিবর্তন ঘটায় তার মস্তিষ্কেও তথা আন্তর প্রকৃতিতেও কেননা মস্তিষ্কই নিয়ন্ত্রণ করে তার আন্তর-প্রকৃতি। ফলে সে হয়ে ওঠে আরও 'মানুষ'। সুতরাং, 'সংস্কৃতি' কেবল বহিঃপ্রকৃতির সংস্কার সাধনেরই নয়, মানুষের আন্তর প্রকৃতিরও সংস্কার সাধনের ফলশ্রুতি। বরং বলা উচিত, 'সংস্কৃতি' কেবল প্রকৃতির উপরে মানুষের জয়যাত্রারই ইতিহাস নয়, মানুষের 'মানুষ হয়ে ওঠারও ইতিহাস'।

এ পর্যন্ত আমি 'সংস্কৃতি' কথাটিকে ব্যবহার করেছি তার সাধারণ অর্থে। তাই তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছি ভিত্তিগত ও সৌধগত উভয়বিধ উপাদান সমূহকে।

কিন্তু বিশেষ অর্থে 'সংস্কৃতি' বলতে ধরা হয় কেবল সৌধগত উপাদানগুলিকেই। সংকীর্ণ অর্থে 'সংস্কৃতি' কথাটা ব্যবহার করা হয় কেবল নৃত্য, গীত ও অভিনয়, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে, বড়জোর, সেই সঙ্গে চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও সাহিত্য বোঝাতে। আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বলতে তো বোঝানো হয় শুধু প্রথমোক্ত তিনটি অনুষ্ঠানকেই। বিশেষ অর্থেই হোক সংকীর্ণ অর্থেই হোক বা চলতি আটপৌরে অর্থেই হোক, এবং তার উপস্থাপনা যে মাধ্যমেই হোক, তাতে প্রকাশ পায় একটি বিশেষ ভঙ্গি একটি বিশেষ ভাব। আর এখানেই প্রশ্ন ওঠে : তা সুস্থ না অসুস্থ? সুসংস্কৃতি না অপ-সংস্কৃতি।

আগেই বলা হয়েছে, বহিঃপ্রকৃতির পরিবর্তন সাধনের সঙ্গে মানুষের আন্তর প্রকৃতিতে যে পরিবর্তন সাধিত হয়, তার প্রকাশই হ'ল সংস্কৃতি। তা হলে এই আন্তর প্রকৃতির পরিবর্তন বলতে কি বোঝায়? আমরা জানি, মানুষের প্রকৃতিতে আছে (১) জান্তবতা (Animality) এবং (২) যৌক্তিকতা (Rationality) এই জান্তবতার মধ্যে পড়ে যৌন ক্ষুধা, যুযুৎসা, জিঘাংসা ইত্যাদি। আর যৌক্তিকতার মধ্যে পড়ে জান্তবতার নিয়ন্ত্রণ, ভালমন্দ বিচার, শুভ ও সৃজনশীল প্রয়াস ইত্যাদি। জান্তবতা মানুষ পেয়েছে তার পূর্ববর্তী প্রাণীদের, প্রত্যক্ষতঃ 'এপ'-এর, কাছ থেকে উত্তরাধিকার হিসাবে। আর যৌক্তিকতা মানুষ পেয়েছে বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামের ফলে অর্জিত সম্পদ হিসাবে, যার কল্যাণে ঘটে তার আন্তর পরিবর্তন, অর্থাৎ জান্তবতার প্রাধান্য থেকে যৌক্তিকতার প্রাধান্যে উত্তরণ। এই উত্তরণের পথ স্বভাবতই দীর্ঘ ও দুরূহ। যেমন রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "তরুলতা জন্মিয়াই তরুলতা, পশুপক্ষী জন্মিয়াই পশুপক্ষী কিন্তু মানুষ শত চেষ্টার পরে তবে মানুষ।" এই দীর্ঘ ও দুরূহ চেষ্টার, তথা সংগ্রাম ও সাধনার, ফলশ্রুতিই হলো সংস্কৃতির রূপ ও বাণী।

এই আলোচনার আলোকে আমরা বুঝতে পারি সুসংস্কৃতিই বা কি আর অপ-সংস্কৃতিই বা কি। বিবিধ সাংস্কৃতিক মাধ্যমের মধ্য দিয়ে—নৃত্য, গীত, অভিনয় চিত্রকলা ভাস্কর্য, সাহিত্য ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে—প্রদর্শিত বা পরিবেশিত হয় বিভিন্ন ভঙ্গি বা ভাব, বিভিন্ন রূপ বা বাণী। যদি তাতে প্রকাশ বা প্রেরণা পায় মানুষের যৌক্তিক বৃত্তিগুলি, যদি তা পাথেয় ও প্রেরণা যোগায় উত্তরণের সাধনায়, তা হলে তা নিঃসংশয়ে সুসংহত। কিন্তু যদি তাতে প্রশ্রয় ও প্ররোচনা পায় তার জান্তব প্রবৃত্তিগুলি যদি তা রসদ ও উত্তেজনা যোগায় যৌক্তিকতা থেকে জান্তবতায় অধঃপতনে তা হলে নিশ্চয়ই তা অপসংস্কৃতি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, যদি সুসংস্কৃতি এবং অপসংস্কৃতি পরিবেশিত হয় মিলিয়ে মিশিয়ে, তবে তা তার প্রতিক্রিয়ার বিচারে নিছক অপসংস্কৃতিই নয়, নিকৃষ্ট রকমের অপসংস্কৃতিও বটে। এর কারণ অন্তত তিনটি। প্রথমতঃ জান্তব প্রবৃত্তিগুলি মানুষের দীর্ঘতম অতীতের উত্তরাধিকার এবং আজও দারুণ সক্রিয়। কিন্তু যৌক্তিক বৃত্তিগুলি

মানুষের সদ্য-লব্ধ সম্পদ এবং এখনও স্বল্প বিকশিত। সুতরাং প্রথমোক্ত প্রবৃত্তিগুলি যত সহজে ও তাড়াতাড়ি সাড়া দেয়, দ্বিতীয়োক্ত বৃত্তিগুলি তেমন দেয় না। দ্বিতীয়তঃ, দ্বিবিধ সংস্কৃতির সংমিশ্রণ মানুষকে কেবল বিভ্রান্তই করে না, উদভ্রান্তও করে। মানুষের বিচারশক্তিকে শিথিল ও অক্ষম করে দেয়। এবং সর্বশেষে, দুধের সঙ্গে মদ মেশালে যেমন দুধটাও হয়ে যায় মদ, তেমনি সুসংস্কৃতির সঙ্গে অপসংস্কৃতির মিলন ঘটালে 'সু-টাও হয়ে যায় অপসংস্কৃতি।

[২]

'সংস্কৃতিকে' যেমন বিশেষিত করা যায় 'সুসংস্কৃতি' এবং 'অপসংস্কৃতি' হিসাবে, তেমনি তাকে বিশেষিত করা যায় এবং 'প্রগতিশীল' বা 'প্রতিক্রিয়াশীল' হিসাবেও। আর আমার মনে হয়, এই দ্বিতীয়ভাবে বিশেষিত করাটাই বেশি বিজ্ঞান সম্মত, কেননা এ ক্ষেত্রে সংস্কৃতির গতিধর্মিতা যেভাবে প্রকাশ পায়, প্রথম ক্ষেত্রে তা সেভাবে পায় না। উপস্থিত আমি এই দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণটি থেকেই সংস্কৃতি প্রসঙ্গে আলোচনা করবো।

অতএব শুরুতেই ব্যাখ্যা করে নেওয়া দরকার সংস্কৃতির বেলায় 'প্রগতিশীল, এবং 'প্রতিক্রিয়াশীল' বিশেষণ দুটির তাৎপর্য কি।

আগেকার আলোচনার জের টেনে বলা যায়, যে সংস্কৃতি মানুষের জান্তবতা থেকে যৌক্তিকতায় উত্তরণের সাধনা ও সংগ্রামকে প্রকাশ ও প্রণোদিত করে, তাই 'প্রগতিশীল', আর যে সংস্কৃতি তা না করে প্রকাশ ও প্রণোদিত করে তার বিপরীত-মুখী প্রবণতা ও প্রয়াসকে, তাই 'প্রতিক্রিয়াশীল'। কিন্তু এইভাবে বললে, যদিও ভুল হয় না, তবু তা হয় ভাসা-ভাসা, তথা অসম্পূর্ণ! এতে প্রকাশ পায় না সংস্কৃতির এই গতিবৈচিত্র্যের অন্তর্নিহিত কারণ তথা উপাদানসমূহ। তাই আমাদের প্রবেশ করতে হবে আরও গভীরে—সংস্কৃতি 'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে' এবং তার গতিপথ অনুসরণে।

একদিন যে মানুষ ঘুরে বেড়াতো বন থেকে বনান্তরে শিকারের অন্বেষণে আজ সে পাড়ি দিচ্ছে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে রহস্যের উদঘাটনে। আদিম প্রাণসত্তা থেকে মানুষের উদ্বর্তনে লেগেছিল কোটি কোটি বছর, তেমনি অরণ্যচারী মানুষের মহাকাশচারী মানুষে উত্তরণেও লেগেছে হাজার হাজার বছর। প্রথমটির উদ্বর্তনের ধারাযেমন আবিষ্কার করেছেন ডারউইন, দ্বিতীয়টির উত্তরণের ধারা তেমন আবিষ্কার করে ছেন মার্কস। মার্কস দেখিয়েছেন, জীবন-ধারণের তথা জীবিকা অর্জনের

প্রয়োজনে মানুষ লিপ্ত হয় সামাজিক উৎপাদনে। এই সামাজিক উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় মানুষ ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবেই প্রবেশ করে পরস্পরের সঙ্গে নির্দিষ্ট সম্পর্কে। এরই রূপায়ণ ঘটে একটি নির্দিষ্ট সমাজব্যবস্থায়। ক্রমে ক্রমে সেই সমাজব্যবস্থাটিতে বিরোধ উপস্থিত হয় বর্ধিষ্ণু উৎপাদন-শক্তি এবং উপস্থিত উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে। এই বিরোধের ফলে কিছুকাল ধরে তার মধ্যে ঘটে ধাপে ধাপে পরিবর্তন বা বিকাশ, তার পরে একটা ঝটকা পরিবর্তন বা বিপ্লব এবং তার স্থান গ্রহণ করে নতুন এক সমাজব্যবস্থা। আগের চেয়ে এই সমাজব্যবস্থা উন্নততর, কেননা তা বাধামুক্ত করে দেয় রুদ্ধ উৎপাদনশক্তিকে। এইভাবেই মানুষের উত্তরণ ঘটেছে আদিম সম-সমাজ থেকে ক্রীতদাস সমাজে, সেখান থেকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজে, সেখান থেকে ধনতান্ত্রিক সমাজে এবং এখন প্রবেশ করেছে সমাজতান্ত্রিক সমাজে।

মার্কস আরও দেখিয়েছেন, বৈষয়িক জীবনে উৎপাদন পদ্ধতিই সাধারণভাবে নির্ধারণ করে সামাজিক, রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক জীবন-প্রক্রিয়াসমূহকে। বিকাশের একটি বিশেষ পর্যায়ে উৎপাদনের বৈষয়িক শক্তিগুলি উৎপাদন-সম্পর্কসমূহের সঙ্গে সংঘাতে আসে। তখন শুরু হয় সামাজিক বিপ্লবের এক পর্যায়। অর্থনৈতিক বনিয়াদের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সুবিরাট উপরি-কাঠামোটিও কমবেশি দ্রুতগতিতে রূপান্তরিত হয় কিন্তু অর্থনৈতিক বনিয়াদটি যেমন আপনা-আপনি পরিবর্তিত হয় না, তার সাংস্কৃতিক উপরি-কাঠামোটিও তেমনি আপনা-আপনি রূপান্তরিত হয় না। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে বিরোধ ঘটে দুটি শ্রেণীর মধ্যে—একটি শ্রেণী চায় উপস্থিত অবস্থা বজায় রাখতে, অন্যটি চায় তাকে আমূল বদলে দিতে। প্রথমোক্ত শ্রেণীর প্রয়াস ও প্রবণতা যেমন প্রতিফলিত হয় তার সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মে, দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর সংগ্রাম ও সাধনাও তেমন প্রতিফলিত হয় তার সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মে। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ্য, সংস্কৃতি কেবল দর্পণই নয় দিশারীও বটে। তা কেবল প্রতি-ফলিতই করে না, গতিনির্দেশও করে। আর এই প্রতিফলনের রূপ এবং গতিনির্দেশের দিকই নির্ধারণ করে তা প্রগতিশীল না প্রতিক্রিয়াশীল। যদি তা প্রতিফলিত ও প্রণোদিত করে পরবর্তী সমাজব্যবস্থায় উত্তরণমুখী সংগ্রাম ও সাধনা, তাহলে তা 'প্রগতিশীল সংস্কৃতি'; আর তা যদি প্রতিফলিত ও প্রণোদিত করে উত্তরণ-বিমুখী প্রয়াস ও প্রবণতা তা হলে তা 'প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতি।' এক কথায়, যে সংস্কৃতি 'সম্মুখ পানে চলিতে চালাতে নাহি জানে', তা 'প্রতিক্রিয়াশীল' আর যে সংস্কৃতি তা জানে এবং মানে, তা 'প্রগতিশীল'।

সেই আদিম যুগ থেকেই যেমন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তেমন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও কাজ করে এসেছে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার শক্তিসমূহ। তবু যে মানুষের উত্তরণ ঘটেছে এক সমাজ থেকে উন্নততর আরেক সমাজে, সেটাই অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে,

প্রতিক্রিয়ার বাধাকে পরাস্ত করে শেষ পর্যন্ত প্রতিবারেই জয়ী হয়েছে প্রগতির শক্তি। আর তাই আজ আমরা একদিকে যেমন পেয়েছি বিপুল বৈষয়িক সম্পদের, উত্তরাধিকার, অন্যদিকে তেমন পেয়েছি বিপুল সাংস্কৃতিক সম্পদের ঐতিহ্য। সেই ক্রীতদাস যুগের সাংস্কৃতিক অবদান সম্পর্কে মার্কস বলেছেন, "ক্রীতদাসপ্রথা ছাড়া আমরা পেতাম না গ্রীক রাষ্ট্র, গ্রীক শিল্পকলা এবং গ্রীক বিজ্ঞান ; ক্রীতদাসপ্রথা ছাড়া আমরা পেতাম না রোম সাম্রাজ্য। কিন্তু 'হেলেনিজম' (HELLENISM) এবং রোম সাম্রাজ্যকে ভিত্তি হিসাবে না পেলে, আমরা পেতাম না আধুনিক ইউরোপ। ....এই দিক থেকে আমরা বলতে পারি : প্রাচীনকালের ক্রীতদাসপ্রথা না থাকলে, আমরা পেতাম না আধুনিক সমাজতন্ত্র।" ক্রীতদাসপ্রথা সম্পর্কে যদি এ কথা সত্য হয়, তবে সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্র সম্পর্কে এ কথা যে আরও কত সত্য, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সামন্ততন্ত্রের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি কী বিপুল সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য, তা পরিমাপ করার জন্য আমাদের আর বিদেশের দিকে তাকাতে হবে না। আমাদের দেশে গীতে, নৃত্যে, নাট্যে, সাহিত্যে, দর্শনে, চিত্রকলায় ভাস্কর্য ও স্থাপত্যে জ্যোতির্বিদ্যা ও অন্যান্য বিজ্ঞানের চর্চায় এখনও আমরা প্রত্যক্ষ করি তার উজ্জ্বল সাক্ষ্য। আর ধনতন্ত্রের যুগের অবদান তো অপরিমেয়। 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'-তেই মার্কস-এঙ্গেলস দিয়েছেন তার মহাকাব্যসুলভ বর্ণনা।

তবু কিন্তু উল্লিখিত যুগগুলিতে প্রতিক্রিয়ার বাধাগুলিকে ছোট করে দেখলে ভুল করা হবে—বিশেষ করে আজকের যুগে, যখন ধ্বংস-ভয়-ভীত বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদ যেন-তেন-প্রকারেণ প্রতিহত করতে চাইছে মুক্তি আন্দোলন ও সমাজতন্ত্রের বিশ্ব-বিস্তারকে। একদিকে সে নিজেকে আপাদমস্তক সজ্জিত করছে পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রে, প্রস্তুত হচ্ছে নক্ষত্র-যুদ্ধের জন্য, অন্যদিকে সে বহুজাতিক বিনিয়োগের স্বর্ণ শৃঙ্খলে রুদ্ধ করতে চাইছে প্রতিবাদী জাতিসমূহের কণ্ঠস্বর এবং সেই সঙ্গে সংস্কৃতির প্রত্যেকটি মাধ্যমের অপ-ব্যবহারের মারফৎ বেপরোয়াভাবে চেষ্টা করছে জনগণকে অপসংস্কৃতির নেশায় আসক্ত করে তাদের সংগ্রামী মনোভাবকে অবশ করে দিতে, প্রতিরোধ শক্তিকে পঙ্গু করে দিতে। শেষ পর্যন্ত বিশ্ব-ধনতন্ত্রের এই অপচেষ্টা ব্যর্থ হবে বলে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে, তার জন্য মূল্য দিতে হবে অপরিমেয়। তাই এক দিকে যেমন অপ্রতিরোধ্য করে তুলতে হবে বিশ্বশান্তি আন্দোলন, প্রত্যাখ্যান করতে হবে বহুজাতিক বিনিয়োগের প্রলোভন, অন্যদিকে তেমন আপসহীন সংগ্রাম চালাতে হবে, অপসংস্কৃতির প্রত্যেকটি প্রকাশ ও প্রত্যেকটি প্রদর্শনীর বিরুদ্ধে। দারুণ দুর্ভাবনার ব্যাপার এই যে, এমন কি যাঁরা নিজেদের দাবি করেন বামপন্থী বলে, তাঁরাও বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি, বহুজাতিক বিনিয়োগ এবং অপসংস্কৃতির সম্প্রচারের মধ্যে যোগসূত্রটি দেখতে পান না, কিংবা দেখতে চান না। বিশ্বযুদ্ধের বিরুদ্ধে বিশ্বশান্তির জন্য আন্দোলনের শরিক হয়েও তাঁরা আশ্রয় দেন বহুজাতিক বিনিয়োগকে, প্রশ্রয় দেন অপসংস্কৃতির আস্ফালনকে। 'পরম প্রগতিশীল' বলে আত্মপরিচয়দানকারীরা যখন লিপ্ত হন চরম

প্রতিক্রিয়াশীল কাজে, তখন তা হয় আরও মারাত্মক, কেননা অসতর্ক ও বিশ্বাসপ্রবণ জনগণ তখন সহজেই হয় প্রতারিত ও প্রভাবিত।

এবারে আমার সর্বশেষ প্রসঙ্গে—অর্থাৎ 'নব সংস্কৃতি' প্রসঙ্গে যাবার আগে আমি সাংস্কৃতিক উপরি-কাঠামো সম্বন্ধে আরও একটি কথা বলে নেব। উপরে আমি যা বলেছি, তা থেকে এই ধারণা করা ভুল হবে যে, সংস্কৃতির ভূমিকা বুঝি নিষ্ক্রিয়—শুধু দর্পণ বা দিক নির্দেশক হিসাবেই তার অবস্থান এবং অর্থনীতিই একমাত্র সক্রিয় ও সর্ব-নিয়ন্তা। ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। সংস্কৃতি কেবল অর্থনৈতিক বনিয়াদকে প্রতিফলিতই করে না, সেই সঙ্গে তাকে প্রভাবিতও করে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, প্রাক-ফরাসী বিপ্লবের এবং প্রাক-রুশ বিপ্লবের সাহিত্য কেবল সেই যুগের সামাজিক অবস্থাকে প্রকাশিতই করেনি, সেই সঙ্গে বিপ্লব সংঘটনে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে বিপ্লবোত্তর সমাজ গঠনকে প্রভাবিত করেছে। সুতরাং সংস্কৃতি এবং অর্থনীতি—দুয়েরই আছে সক্রিয় ভূমিকা যদিও এ কথা অনস্বীকার্য, অর্থনীতির ভূমিকাই আধিপত্যশীল, কেননা মূলতঃ অর্থনীতিতেই পরিবর্তন-প্রক্রিয়ার সূচনা হয় এবং অর্থনৈতিক রূপান্তরেই সেই পর্বের সমাপ্তি এবং নতুন এক পর্বের সূত্রপাত ঘটে।

এখন প্রসঙ্গ 'নব সংস্কৃতি।' 'নব সংস্কৃতি' বলতে আমি বোঝাতে চাই এমন এক যুগের সংস্কৃতি, যে যুগ এখনও অনাগত কিন্তু ভবিষ্যতে আসবেই—যদিও সেই ভবিষ্যৎ অতি সুদূর। সেই অতি সুদূর যুগের অবশ্যম্ভাবী সংস্কৃতিকেই আমি অভিহিত করেছি, 'নব সংস্কৃতি' বলে কেননা সর্বাঙ্গীণ অর্থেই সেই সংস্কৃতি হবে অভিনব। মার্কস বলেছেন, "সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার সর্বশেষ স্ববিরোধী রূপ হ'ল বুর্জোয়া উৎপাদন-সম্পর্কসমূহ। ...সুতরাং এই সমাজব্যবস্থাই হ'ল মানব-সমাজের প্রাগৈতিহাসিক পর্যায়ের সর্বশেষ অধ্যায়।" তার পরে আসবে সমাজতন্ত্রের নিম্নতর পর্যায় এবং উচ্চতর পর্যায় অর্থাৎ সাম্যবাদের যুগ। আর এই সাম্যবাদের যুগেই সমাজের তথা সংস্কৃতির ঘটবে নবজন্ম। মানুষ দ্বিজ হবে। এঙ্গেলস-এর ভাষায়, 'এবং তখন মানুষের প্রাগিতিহাসের হবে শেষ আর ইতিহাসের হবে শুরু।' আজকের এই ধনতান্ত্রিক সমাজে অবস্থান করে আমরা কেবল কল্পনাই করতে পারি সেই অনাগত যুগের সমাজ ও সংস্কৃতির চিত্র পারি না তার চাক্ষুস বর্ণনা দিতে।

আমরা কল্পনার নেত্রে দেখতে পারি এমন এক সমাজ যেখানে যাবতীয় উৎপাদনের উপায় ও উপকরণের ফল ও ফসলের সমান মালিকানা প্রত্যেকটি মানুষের, যেখানে দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদিত হয় অপরিমেয় পরিমাণে এবং বিনামূল্যে বণ্টিত হয় সকলের মধ্যে, যেখানে উৎপাদন ও বণ্টন পরিচালিত হয় স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে, যেখানে এঙ্গেলস-এর কথায় "মানুষের থাকবে না কোনো অভাব—একমাত্র শ্রম করার

সুযোগের অভাব ছাড়া !" আর যেহেতু সেখানে থাকবে না কোনো শ্রেণীশোষণ তথা শ্রেণীশাসন, তাই থাকবে না কোনো সীমান্ত—বিশ্বমানব পরিণত হবে একটি বিশ্ব-পরিবারে। সেই বাস্তব পরিস্থিতিতে—শ্রেণীহীন সমাজে, সীমান্তহীন দেশে, দিগন্তহীন পৃথিবীতে, বৈষয়িক অভাবমুক্ত, অতএব দ্বেষ ও হিংসামুক্ত, এক কথায় জান্তব তাড়নামুক্ত, মানুষ গড়ে তুলবে এক সত্যিকারের মানব-সংস্কৃতি। জ্ঞানের সন্ধানে মানুষ পাড়ি দেবে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে, 'নব নব পূর্বাচলে, আলোকে আলোকে।' মহাসাগরের বুকে দূরাগত জাহাজের অস্পষ্ট মাস্তুলের মতো আমরা কেবল সেই অনাগত অথচ অবশ্যম্ভাবী সমাজ ও সংস্কৃতির অস্ফুট আভাসকে অগ্রিম অভিনন্দনই জানাতে পারি; পারি না তার বিশদ বিবরণ দিতে। ···জয় হোক সেই অগ্রসরমান আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের।

৬।১।৮৭

শত বর্ষের আলোয় ভারতের জাতীয় কংগ্রেস

শতবর্ষ পরেও কোনো সংগঠনের পক্ষে দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হিসাবে প্রাধান্য ভোগ করা একটা বিরল ঘটনা। কংগ্রেসের ভাগ্যে কিন্তু এই বিরল ঘটনাটাই ঘটেছে। তেমনি যে-আকারে নেতারা সাফল্য অর্জন করতে চেয়েছেন, প্রায় ঠিক সেই আকারেই তা অর্জন করাও একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার। কংগ্রেস-নেতৃত্ব কিন্তু এই দুঃসাধ্য ব্যাপারটাও সাধন করেছেন। তাঁরা চেয়েছিলেন সমাজ-বিপ্লব ছাড়াই রাষ্ট্র-ক্ষমতার অধিকার। এবং তাঁরা তা পেয়েছেন, এবং এখনো অবধি ধরেও রেখেছেন। বর্তমান নিবন্ধের প্রথম অংশে আমি উপস্থিত করব এই সংগঠনের শতবর্ষব্যাপী পদচারণার একটি নিছক পথচিত্র এবং দ্বিতীয়টিতে তার নেতৃত্বের একটি সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন।

১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকে ব্যাখ্যা করা যায় না ১৮৫৭ সালের গণ-বিদ্রোহের পটভূমিকা এবং তৎ-পরবর্তী ঘটনা প্রবাহকে বাদ দিয়ে। ১৮৫৭ সালে এই বাংলার ব্যারাকপুরের ব্যারাকে-ব্যারাকে জলে ওঠে সে স্ফুলিঙ্গ, তাই ক্রমে পরিণত হয় দেশজোড়া দাবানলে। এই দাবানলকে মার্কস অভিহিত করেছেন "ভারতের প্রথম মুক্তি-যুদ্ধ" বলে। এই দাবানল নেবাতে হিংস্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কত সহস্র ভারতীয়দের রক্তের কত নদী-উপনদী বইয়ে দিয়েছিল, ইতিহাসে দেয় তার রক্তাক্ত সাক্ষ্য।

কিন্তু আগুন নিবে গেলেও উবে গেল না তার উত্তাপ। সেই উত্তপ্ত দিনের উদ্দীপ্ত পৃষ্ঠপটে এগিয়ে এলেন সুরেন্দ্রনাথ। প্রতিষ্ঠা করলেন 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' যার মধ্যে সমবেত হতে লাগলেন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা। ঘর-পোড়া গোরু যেমন সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়, যেমনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদও ভয় পেয়ে গেল এই প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাবে। সাম্রাজ্যবাদ জানত, ১৮৫৭ সালের দেশ জোড়া অভ্যুত্থানে যদি থাকত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নেতৃত্ব তাহলে তাকে দাবিয়ে দেওয়া হত প্রায় অসাধ্য।

'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'-এর মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ দেখতে পেল সেই সম্ভাব্য নেতৃত্বের আভাস। অগণিত অশিক্ষিত মানুষ যদি সংগঠিত হয় সুশিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে এবং 'চ্যালেঞ্জ' জানায় সাম্রাজ্য-শক্তিকে, তাহলে তা হয়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্য, অপরাজেয়। অবসরপ্রাপ্ত ধুরন্ধর 'সিভিলিয়ান' হিউম শলাপরামর্শ করলেন বড়লাট ডাফরিনের সঙ্গে। প্রতিষ্ঠা করলেন জাতীয় কংগ্রেস। উদ্দেশ্য 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'-এর স্বাধিকার-কামী নেতৃত্ব থেকে শিক্ষিত সমাজকে সরিয়ে নিয়ে আসা ব্রিটিশ অভিভাবকত্বাধীন

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে। আপাততঃ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল বটে, কিন্তু শেষ রক্ষা হল কি?

শুরু হল কংগ্রেসের আবেদন নিবেদনের যুগ। ইংরেজরা যেসব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, তার অন্তত কিছুটাও যাতে ভারতীয়রাও পায়, তারজন্য সবিনয়, সশ্রদ্ধ আবেদন নিবেদন। কিন্তু উপর-তলায় যখন চলছে একদিকে প্রার্থনা ও অন্যদিকে প্রত্যাখ্যানের পালা, তখনি নিচের তলায় জ্বলছে ক্ষোভের আগুন। এই কলকাতা তখন ভারতের রাজধানী এবং এই বাংলার তরুণদের তখন অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষা। সাম্রাজ্যবাদ ভাবল বাংলাকে যদি ভেঙে দেওয়া যায় দুই ভাগে, তবে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামও হবে অঙ্কুরেই বিনষ্ট।

জারি হল বঙ্গ-ভঙ্গের হুকুমনামা। সঙ্গে সঙ্গে সারা বাংলা জুড়ে শুরু হল বঙ্গ-ভঙ্গ রোধের প্রচণ্ড আন্দোলন। সেই আন্দোলনে বাণী যোগালেন রবীন্দ্রনাথ, বারুদ যোগালেন অরবিন্দ। বাংলা মায়ের দামাল ছেলেরা ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই আগ্নেয় সংগ্রামে। বাংলার ঢেউ বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে আলোড়ন তুলল অন্যান্য প্রদেশে। পাঞ্জাব থেকে এলেন লালা লাজপৎ, মহারাষ্ট্র থেকে বাল গঙ্গাধর তিলক। হতে এগিয়ে ছিলেন বিপিন পাল। শুরু হল লাল-বাল-পাল যুগ। সংগ্রামীর আত্মদানে, শহীদের রক্ত স্নানে কংগ্রেসের ঘটে গেল রূপান্তর।

১৯১৪ সালে শুরু হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং জার্মান সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে সাম্রাজ্যের লড়াই—প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ। ভারতের বিপ্লবীরা স্বদেশে এবং বিদেশে প্রস্তুত হতে লাগলেন এই সুযোগে ব্রিটিশ শক্তির উপরে সশস্ত্র আঘাত হেনে দেশকে স্বাধীন করার জন্য। বিদেশে প্রতিষ্ঠিত হল আজাদ হিন্দ সরকার। স্বদেশে প্রতিষ্ঠিত হল বিভিন্ন বিপ্লবী কেন্দ্র। কিন্তু ইতিমধ্যে কংগ্রেসের নেতৃত্বে এসে গিয়েছেন বিদেশ-প্রত্যাগত গান্ধীজী। তাঁর নেতৃত্বে কংগ্রেস গ্রহণ করল যুদ্ধে ব্রিটিশ শক্তিকে সমর্থন করার প্রস্তাব। গান্ধীজী নিজে হলেন 'রিক্রুটিং সার্জেণ্ট'। গান্ধীজী এবং তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃত্বের আশা ছিল, যুদ্ধে ইংরেজকে সাহায্য করলে যুদ্ধের পরে বিজয়ী ইংরেজ ভারতকে উপহার দেবে স্বায়ত্ত শাসন।

কিন্তু যুদ্ধের পরে স্বায়ত্ত শাসনের দাবির প্রতি লজ্জাহীন পরিহাসে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতকে উপহার দিল জালিয়ানওয়ালাবাগ, নৃশংসভাবে হত্যা করল শত শত নিরস্ত্র শান্তিপূর্ণ মানুষকে; পাঞ্জাবের উপরে চাপিয়ে দিল পাশবিক সন্ত্রাসের শাসন। সারা ভারত জ্বলে উঠল সেই দানবিক বীভৎসতায়। রবীন্দ্রনাথ জ্বলন্ত অবজ্ঞাভরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন ব্রিটিশ প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি।

ইতিমধ্যে ১৯১৭ সালে ঘটে গিয়েছে রুশ বিপ্লব। তার ঢেউ লেগেছে দেশে দেশে—আমাদের দেশেও। বিপিন পাল অভিনন্দন জানিয়েছেন নবজাত সোভিয়েত রাষ্ট্র-শক্তিকে। ভারতের শ্রমিক শ্রেণী সংঘটিত করছে ধর্মঘটের পর ধর্মঘট। কমিউনিস্টদের তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে কলকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজে। সারা দেশ জুড়ে আন্দোলনের উত্তাপ। অবশেষে ১৯২১ সালে গান্ধীজী ডাক দিলেন অসহযোগ আন্দোলনের।

সেই ডাকে অভূতপূর্ব ভাবে সাড়া দিল আসমুদ্র-হিমাচল সমগ্র দেশ। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ নির্বিশেষে ঝাঁপিয়ে পড়ল লক্ষ লক্ষ মানুষ। অকথ্য অত্যাচারেও দমিত হল না সেই অকুতোভয় আন্দোলন। প্রমাদ গুনল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। ....কিন্তু চৌরিচোরার হিংসাকাণ্ডের অজুহাত দেখিয়ে গান্ধীজী প্রত্যাহার করে নিলেন সেই আন্দোলন। জনগণের পুঞ্জিত আবেগ অভিব্যক্তি পেল ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায়।

অতঃপর কংগ্রেসের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করল সুস্পষ্ট দুটি চিন্তাধারা—একটি বামপন্থী ও অন্যটি দক্ষিণপন্থী। ১৯২৮ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনে বামপন্থীদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত হল পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব। কিন্তু গান্ধীজীর বিরোধিতায় তা স্থগিত রাখা হয় এক বছরের জন্য। এই সময়ে নানা প্রান্তে শুরু হল জঙ্গী আন্দোলনের তৎপরতা। হিংসার সাহায্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসান ঘটানোর চেষ্টার অভিযোগে সারা দেশে গ্রেফতার করা হল কমিউনিস্ট নেতাদের। শুরু হল মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা। এই পটভূমিকায় ১৯৩০ সালে অনুষ্ঠিত হয় লাহোর কংগ্রেস এবং সেখানে গৃহীত হয় পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব।

সেই প্রস্তাবে কোনো সাড়া এল না ইংরেজদের কাছ থেকে। এমনকি তার অন্যতর বিকল্প হিসাবে গান্ধীজী কর্তৃক ঘোষিত এগারো-দফা প্রস্তাবটিও উপেক্ষিত হল মৌন অবজ্ঞায়। অভিমানাহত গান্ধীজী এবারে ঘোষণা করলেন আইন অমান্য আন্দোলন। আবার সারা দেশ জুড়ে ফেটে পড়ল সেই সংগ্রামী আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ। শুরু হল অগণিত নর-নারীর উদ্দীপ্ত সংগ্রাম। পালটা এল সাম্রাজ্যবাদের দানবিক দমন-পীড়ন। শত শত মানুষের হত্যাকাণ্ড, হাজার হাজার মানুষের কারাদণ্ড। এই পটভূমিকায় স্বাক্ষরিত হল গান্ধী-আরুইন চুক্তি। ১৯৩৫ সালে এল নতুন ভারত-শাসন আইন। এই আইনের অধীনে ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস যোগদান করল নির্বাচনে এবং এগারোটি প্রদেশের মধ্যে অধিকাংশ প্রদেশেই হাতে পেল প্রাদেশিক সরকার।

তারপরে এল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ভারতের প্রতিনিধি-স্থানীয় কংগ্রেস-নেতৃত্বের সঙ্গে কোনো পরামর্শ না করেই ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে দিল যে, ভারতও

ব্রিটেনের পক্ষে একটি যুদ্ধরত দেশ। প্রতিবাদে কংগ্রেস সরকারগুলি পদত্যাগ করল তাদের অধীনস্থ প্রদেশগুলি থেকে।

তারপর শুরু হল যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়। জার্মানি আক্রমণ করল সোভিয়েত ইউনিয়নকে। কংগ্রেস-নেতৃত্ব ঘোষণা করলেন, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে চাই আমরাও আর সেই সংগ্রামকে সার্থক করার জন্য চাই স্বাধীনতা। প্রত্যুত্তরে সাম্রাজ্যবাদ গ্রেপ্তার করল সমস্ত নেতাকে। শুরু হল গোটা দেশ জুড়ে "ভারত ছাড়ো" আন্দোলন। ধ্বনি উঠল "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে!" সেই আন্দোলনে ভেঙে পড়ল হিংসা আর অহিংসার প্রাচীর। এখানে সেখানে ঘোষিত হল আঞ্চলিক স্বাধীনতা!

ইতিমধ্যে সবাইকে চমৎকৃত করে, ভারত থেকে অন্তর্হিত হয়ে সুভাষচন্দ্র জার্মানি হয়ে পৌঁছে গেছেন জাপান। সেখানে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সহযোগিতায় গড়ে তুলেছেন আজাদ হিন্দ ফৌজ। বুকে জলন্ত দেশ প্রেম, মুখে "দিল্লি চলো" আহ্বান, সুভাষচন্দ্রের 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' অভিযান শুরু করল ভারতের পথে।

ওদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের হাতে পরাস্ত ও পর্যুদস্ত হল জার্মান বাহিনী এবং সেই সঙ্গে সূচিত হল ফ্যাসিবাদের উপরে মিত্র-শক্তির জয়। যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় ও পরিণতিতে কেবল জার্মান-জাপানী-ইতালীয় ফ্যাসিবাদই পরাজিত হল না, সেই সঙ্গে সাংঘাতিকভাবে আহত হল ব্রিটিশ তথা বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদও।

এই পরিস্থিতিতে ব্রিটিশের হাতে বন্দী আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারকে কেন্দ্র করে ফেটে পড়ল শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত, ছাত্র-যুবা-মহিলাদের দেশজোড়া জঙ্গী আন্দোলন। নিজামশাহীর বিরুদ্ধে তেলেঙ্গানায় সশস্ত্র সংগ্রাম। বোম্বাইতে নৌ-বিদ্রোহ, জব্বলপুরে সেনা-বিদ্রোহ এবং রাজকীয় বিমানবাহিনীতে প্রকাশ্যে অবাধ্যতা। এই পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বাধ্য হল রাষ্ট্র-ক্ষমতা হস্তান্তর করতে। সেই সঙ্গে তারা কার্যকরী করল আরো একটি সিদ্ধান্ত—ভারতবর্ষের দ্বিখণ্ডীকরণের সিদ্ধান্ত। ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হল কংগ্রেসের হাতে, পাকিস্তানে মুসলিম লিগের হাতে।

এইভাবে ১৯৪৭ সালে ১৫ই আগস্ট কংগ্রেসের ৬২ বছর বয়সে সমাপ্ত হল কংগ্রেসের নেতৃত্বে এই উপমহাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম। তারপর শুরু হল স্বাধীন ভারতে কংগ্রেস-নেতৃত্বের ধারণা অনুযায়ী তথাকথিত সমাজতন্ত্রের রূপায়ণ। পরবর্তী ৩৮ বছরের ইতিহাস সাম্প্রতিক; অতএব পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। আজ শুধু একটাই প্রশ্ন: যে ভারতের স্বপ্ন বুকে ধরে জীবন দিয়েছেন শত শত শহীদ, যৌবন দিয়েছেন হাজার হাজার বীর ও বীরাঙ্গনা, ত্যাগ ও লাঞ্ছনা বরণ করেছেন লক্ষ লক্ষ নর-নারী, সেই স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণ ঘটেছে কি কিংবা ঘটার সম্ভাবনা আছে কি কংগ্রেস নেতৃত্বের পরিচালনায়?

[২]

পাঠক লক্ষ্য করেছেন, এই নিবন্ধের প্রথম অংশটি আমি শেষ করেছি একটি প্রশ্ন দিয়ে। প্রশ্নটি এই : যে ভারতের স্বপ্ন বুকে নিয়ে জীবন দিয়েছেন শত শত শহীদ, যৌবন দিয়েছেন হাজার হাজার বীর ও বীরাঙ্গনা, ত্যাগ ও লাঞ্ছনা বরণ করেছেন লক্ষ লক্ষ নরনারী, সেই স্বপ্নের ভারত আমরা পেয়েছি কি কংগ্রেসের নেতৃত্বে?

আশা করি, এই প্রশ্নের উত্তরে আমি যদি সরবে বলি, "না, পাইনি", তবে কেউই বড় বেশি একটা আপত্তি করবেন না। সবাই আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, এই খণ্ডিত এবং আরও খণ্ডন-শঙ্কিত ভারত তাঁরা চাননি; তাঁরা চাননি এমন এক ভারত, স্বাধীনতার প্রায় চল্লিশ বছরেও যেখানে বেড়ে চলেছে বিদেশী ও স্বদেশী শোষণ এবং ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান, যেখানে এখনও এক অবিশ্বাস্য রকমের বিপুল জনসংখ্যা থেকে গিয়েছে দারিদ্র্যসীমার নিচে এবং অক্ষর-জ্ঞানের বাইরে, যেখানে এখনও চালু আছে জনগণের অধিকার-হরণের বহুবিধ বিধান ও ব্যবস্থা।

কেন এমন হল? এ প্রশ্ন, আজ প্রায় সবার মুখে মুখে। তবে প্রশ্নটা সর্বজনীন হলেও, আমার আশঙ্কা, উত্তরটা হবে না সর্বসম্মত। কেউ দায়ী করবেন একে, কেউ ওকে। তবে আমার মনে হয়, প্রধান দায়িত্ব সেই দলেরই, বিশেষ করে তার নেতৃত্বেরই, যাঁরা পরিচালনা করেছেন জাতীয় আন্দোলন এবং প্রায় একটানা ভাবে পরিচালনা করে আসছেন স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র-ক্ষমতা। বলা বাহুল্য, আমি কংগ্রেসের, বিশেষ করে তার নেতৃত্বের, কথাই বলছি। অতএব আমি এখন অগ্রসর হব এই কংগ্রেস নেতৃত্বেরই মূল্যায়নে—সীমিত পরিসরে যা সংক্ষিপ্ত এবং কিছুটা অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য।

নেতৃত্বের কথা বলতে গেলে, বলতে হয় সংগঠনের কথা, তার কর্মসূচী এবং তদনুযায়ী পরিচালিত আন্দোলনের কথা। কিন্তু কংগ্রেসের সূত্রপাত যদিও হয় ১০৮৫ সালে, তার সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলার প্রথম প্রস্তাব গৃহীত হয় বিশ বছর পরে ১৯০৬ সালের কলিকাতা অধিবেশনে। কর্মসূচী বলতে তেমন কিছু ছিল না—বড় দিনের ছুটিতে সাড়ম্বরে সম্মেলন করা এবং বিটিশ সরকারের কাছে সবিনয়ে কিছু আবেদন-নিবেদন করা ছাড়া। আন্দোলনের ব্যাপার তো এসেছে অনেক পরে পরবর্তী দশকের মাঝামাঝি বিদেশ-প্রত্যাগত গান্ধীজী কংগ্রেসের নেতৃত্বে আসার পরে।

তার মানে, এর আগে কি দেশে হয়নি কোনো আন্দোলন? নিশ্চয়ই হয়েছে—ভারতের সুদীর্ঘ স্বাধীনতা-আন্দোলনের সমগ্র ইতিহাসে সেই একমাত্র আন্দোলন, যাতে কোনো পর্যায়েই করা হয়নি কোন আপস, যা শেষ হয়েছিল বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের পরাজয়ে, তথা স্বদেশী সংগ্রামীদের বিজয়ে। আমি বলছি বঙ্গ-ভঙ্গ রদ

করার গৌরবময় আন্দোলনের কথা, যে আন্দোলনের ত্রিবেণী প্লাবনে আত্ম-নিবেদন করেছিলেন নরম, মধ্যম ও চরম—সব পন্থার দেশপ্রেমিকরা, যে আন্দোলনে একাকার হয়ে গিয়েছিল বিবেকানন্দের স্বদেশ-মন্ত্র, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-সঙ্গীত, হেমচন্দ্র কানুনগোর আগ্নেয় বিস্ফোরণ। এবং সব কিছু ছাপিয়ে উঠেছিল বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম!"

কিন্তু সে আন্দোলন তো পরিচালিত হয়নি কংগ্রেস-নেতৃত্বের পরিচালনায়। ব্যক্তিগতভাবে কোনো কোনো নেতা এখানে সেখানে কম-বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করলেও এবং কংগ্রেস-কর্মীরা প্রায় সর্বত্র অংশগ্রহণ করলেও এই আন্দোলন কোনোও অর্থেই ছিল না কংগ্রেসি আন্দোলন। ভঙ্গ-বঙ্গের দু'টি রাজধানী, কলকাতা ও ঢাকা ছিল এই আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র এবং জেলাগুলিতে কর্মরত ছিল অসংখ্য 'সমিতি'; এই আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন এই সমস্ত সমিতির নেতৃবৃন্দ। এই জন্যই ১৯০৯ সালে হাওড়ায় এক সভায় অরবিন্দ এই সমিতিগুলিকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন "আমাদের জাতীয় জীবনের গৌরব" বলে। এবং যেহেতু এই আন্দোলন প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ ছিল বাংলার মধ্যে, সেই হেতু ১৯১০ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ-এর ঘোষণার পরে তৎকালীন কংগ্রেস-সভাপতি পণ্ডিত বিষণ নারায়ণ দর প্রশংসা-ভরে মন্তব্য করেছিলেন, "আধুনিক ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবিধানিক সংগ্রামে এটা হ'ল বাংলার মহান জয়।" কংগ্রেস-নেতৃত্ব এই আন্দোলনের মুগ্ধ দর্শক, কিন্তু পথ-নির্দেশক নন।

প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে, রুশ বিপ্লবের আগে পর্যন্ত পরাধীন দেশগুলিতে যেসব স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালিত হত, সেগুলি আবশ্যিকভাবেই হ'ত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। এই আন্দোলনের সৈনিকরা অবহিত থাক আর না থাক, এর অর্থনৈতিক মর্মবস্তু হচ্ছে বিদেশী পুঁজিবাদের পরিবর্তে স্বদেশী পুঁজিবাদের প্রতিষ্ঠা এবং সেই উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে দেশীয় ধনিকদের হাতে, তাদের নেতৃত্বাধীন সংগঠনের হাতে, রাষ্ট্রক্ষমতার স্থানান্তর ঘটানো। ভারতে জাতীয় কংগ্রেসই হল সেই সংগঠন। একদা যা স্থাপিত হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদের 'সেফটি ভালভ' হিসাবে, সেই কংগ্রেসই রূপান্তরিত হয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সংগঠনে। গোড়ার দিকে নবজাত ভারতীয় ধনিক শ্রেণী ছিল দুর্বল, কুণ্ঠিত এবং ভীরু। তাই কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনেও তাদের দাবিগুলির উল্লেখ থাকত বিনীত, বিনম্র ও অর্ধোচ্চার ভাষায়। দয়ার দান হিসাবে যা পাওয়া যেত; তাই নিয়েই তাদের থাকতে হ'ত আপাত-সন্তুষ্ট।

এই সময়ে এল বঙ্গ-ভঙ্গ রদের দুরন্ত আন্দোলন। সংগঠকেরা অবহিত না থাকলেও এই আন্দোলনও ছিল মর্মগতভাবে জাতীয়তাবাদী অর্থাৎ স্বদেশী ধনিক শ্রেণীর আত্মপ্রতিষ্ঠার পরিপোষক। বিলাতি বর্জন, স্বদেশী গ্রহণ এবং জাতীয় শিক্ষা

যার অন্যতম অঙ্গ ছিল কারিগরি শিক্ষা, তার প্রবর্তন—বঙ্গভঙ্গ-রদ আন্দোলনের এই সব স্লোগান ও কর্মোদ্যোগ সবই ছিল ভারতীয় ধনিক শ্রেণীর অনুকূল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই আন্দোলনের জঙ্গী রূপ দেখে এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে, তারা সরে রইল দূরে এবং কংগ্রেস-নেতৃত্বও রইলেন নিষ্ক্রিয়। যাই হোক, এই আন্দোলনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-শক্তির পরাজয় এবং সংগ্রামী সংঘ-শক্তির জয় এক দিকে যেমন দেশীয় ধনিক শ্রেণীকে দিল আত্মবিশ্বাস, অন্য দিকে তেমনি জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বকেও করে তুলল সক্রিয়। কিন্তু এই সংঘ শক্তিকে আরও ব্যাপকতর গণ-ভিত্তির উপরে দাঁড় করিয়ে, তাকে প্রয়োজনমত দেশ-জোড়া আন্দোলনে সামিল করা এবং জাতীয়তাবাদের যুগোপযোগী প্রবক্তা হিসাবে কংগ্রেস-নেতৃত্বের আত্মপ্রকাশ করা তখনও বাস্তব হয়ে ওঠেনি। সেটা হল পরবর্তীকালে গান্ধীজীর কল্যাণে। বাস্তবিক পক্ষে, গান্ধীজীর আবির্ভাবের অনতিকালের মধ্যেই কংগ্রেসের নেতৃত্ব এবং গান্ধীজীর নেতৃত্ব হয়ে উঠল একার্থবাচক। অতএব তখন থেকে কংগ্রেস-নেতৃত্বের মূল্যায়ন মানেই হ'ল গান্ধী-নেতৃত্বের মূল্যায়ন, কেননা যাঁরা তাঁর বিরোধিতা করেছেন, তাঁরা হয় জওহরলালের মত শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন আর নয় তো সুভাষচন্দ্রের মত নিজে সরে গিয়ে তাঁর জন্য পথ ছেড়ে দিয়েছেন।

উপরে আমি উল্লেখ করেছি জাতীয়তাবাদের "যুগোপযোগী প্রবক্তা হিসাবে কংগ্রেস-নেতৃত্বের আত্মপ্রকাশের" কথা, যা ঘটেছিল গান্ধীজীর মাধ্যমে। ব্যাপারটা একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন। সব দেশেই জাতীয়তাবাদ পূর্ণ পরিণতি লাভ করে সামন্ততন্ত্রের অবসানে, তথা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের, ওরফে কৃষি-বিপ্লবের, সংঘটনে। কিন্তু পরাধীন দেশে এই গণতান্ত্রিক বিপ্লবের, তথা কৃষি-বিপ্লবের কর্মকাণ্ড আবার যুক্ত হয়ে যায় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঙ্গে, কেননা অধীন দেশের উদীয়মান পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে পরস্পরকে সাহায্য করে দেশীয় সামন্তবাদ এবং বিদেশীয় সাম্রাজ্যবাদ। অতীতে যখন পুঁজিবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে ছিল না সমাজবাদ, ধনিকশ্রেণীর প্রতিস্পর্ধী হিসাবে ছিলনা শ্রমিকশ্রেণী, তখন ধনিক শ্রেণী কৃষক শ্রেণীকে নেতৃত্ব দিয়ে আপসহীন রক্তাক্ত সংগ্রামের মাধ্যমে সামন্তবাদের অবসান ঘটিয়ে সম্পূর্ণ করত গণতান্ত্রিক তথা কৃষি বিপ্লব।

কিন্তু বর্তমানে যখন পুঁজিবাদের, তথা ধনিক শ্রেণীর, চেয়ে আরও আকর্ষণীয় বিকল্প হিসাবে দেখা দিয়েছে সমাজবাদ, তথা শ্রমিক শ্রেণী, তখন শংকিত ধনিক শ্রেণী আর ঝুঁকি গ্রহণ করে না সামন্তবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন রক্তাক্ত সংগ্রামের। তাই ভারতের মত পরাধীন দেশের ধনিক শ্রেণীকেও সন্ধান করতে হয় সামন্তবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে বাদ দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে স্বাধীনতা অর্জনের পথ, অর্থাৎ

গণতান্ত্রিক তথা কৃষি বিপ্লবকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করার পথ। এই পথ অনুসরণ করতে গিয়ে, স্বাভাবিকভাবেই সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কেও অবলম্বন করতে হয় নতুন নীতি, সংগ্রাম এবং আপসের দ্বৈত নীতি—সংগ্রাম কেবল তত দূর পর্যন্ত, যত দূর পর্যন্ত তা রাখা যায় নিজেদের নিয়ন্ত্রণে, এবং তার পরেই আপস। স্বভাবতই সংগ্রাম হবে অহিংস, পরিচালিত হবে "সত্যাগ্রহ" হিসাবে এবং সমাপ্ত হবে শান্তিপূর্ণ বোঝাপড়ায়। এই হ'ল জাতীয়তাবাদের যুগোপযোগী পন্থা, যা নিষ্ঠাভরে গ্রহণ ও সাফল্য সহকারে অনুসরণ করেছিলেন গান্ধীজীর অভিভাবকত্বাধীনে কংগ্রেস-নেতৃত্ব—১৯২১ সালের অসহযোগ এবং ১৯৩১ সালের আইন-অমান্য আন্দোলন যার জাজ্বল্যমান সাক্ষ্য।

কিন্তু গণতান্ত্রিক বিপ্লব তো কেবল ধনিক শ্রেণীর একটি রণকৌশল-গত লাইন মাত্র নয়। এই বিপ্লব একই সঙ্গে একটি বহুমুখী প্রক্রিয়া—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক। এই বিপ্লব সম্পাদনের প্রক্রিয়ায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য ও অঞ্চলগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন জাতিসত্তাগুলির ঘটত স্বাভাবিক বিকাশ এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অভিন্ন সংগ্রামে গড়ে উঠত এক মহাজাতীয় সংহতি; গ্রামাঞ্চল জুড়ে চাষীর হাতে জমির মালিকানা এবং কুটির শিল্পের পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের মাধ্যমে শহরাঞ্চল জুড়ে গড়ে উঠত নতুন নতুন শিল্প-উদ্যোগ, রচিত হ'ত অর্থনৈতিক অগ্রগতির বুনিয়াদ ধর্মমত-নির্বিশেষে জনসাধারণের মধ্যে ভেঙে পড়ত সাম্প্রদায়িক বিরোধ, জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার দেওয়াল, বইতে শুরু করত কুসংস্কারের দূষণ-মুক্ত হাওয়া; শিক্ষার আলো ছড়িয়ে পড়ত দ্রুত বেগে, গড়ে উঠত বহুবর্ণ সংস্কৃতির এক নতুন পরিমণ্ডল। সেক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সফল পরিণতিতে আমরা পেতাম আমাদের সেই পূর্বসূরীদের স্বপ্নে দেখা ভারতবর্ষকে—স্বাধীন, সুসংহত, সমৃদ্ধির পথে অগ্রসরমান, চেতনার আলোয় বিকাশমান, নতুন এক শতদল-সংস্কৃতিতে প্রকাশমান, ভারতবর্ষকে। আমরা যে সেই ভারতবর্ষকে পাইনি, তার প্রধান দয়িত্ব যে কংগ্রের-নেতৃত্বের, তথা গান্ধী-নেতৃত্বের, তা অস্বীকার করা যায় কি?

এই প্রশ্নের উত্তরে কেউ কেউ হয়ত বলবেন, বিপ্লবের ভবিষ্যৎ তো অনিশ্চিত, পথ হিংসাকুটিল ও রক্তপিচ্ছিল। তার চেয়ে নিশ্চয়ই বরণীয় এই প্রায়-নিশ্চিত, অহিংসা-পূত, রক্তপাতহীন এই স্বাধীনতা এবং খণ্ডিত ভারত। এর জবাবে নাই বা তুললাম গান্ধীজীর অহিংসা সম্পর্কে প্রশ্ন, নাই বা তুললাম ভিন্ন-পন্থীদের সহিংস ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামকে ব্রিটিশের সঙ্গে দর কষাকষি করার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের গান্ধীবাদী দৃষ্টান্তের কথা। কিন্তু কেমন করে ভুলে যাই বিশের দশকের মাঝামাঝি

হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় হিংসার তাণ্ডব ও অঢেল রক্তপাতের কথা, যা এমনকি জওহরলালের মতেও, গান্ধীজী কর্তৃক হঠাৎ আন্দোলন বন্ধ করে দেবার ফলে পুঞ্জিত সংগ্রামী আবেগের বিকৃত অভিব্যক্তি? কেমন করে ভুলে যাই ১৯৪৬-এর সাম্প্রদায়িক পাশবিকতা ও ভ্রাতৃরক্তে হোলি খেলার কথা, যে সম্পর্কে আরও বেশি করে খাটে জওহরলালের ঐ ক্ষুব্ধ মন্তব্য? কেমন করে ভুলে যাই ভারত-বিভাগের ফলে সীমান্ত-পারাপারকারী হিন্দু-মুসলমানদের উপরে ভিন্ন-ধর্মী ঘাতকদের নৃশংস হত্যাভিযান ও রক্ত-প্লাবনের কথা? সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রামে নিশ্চয়ই প্রয়োজন হ'ত না এত হিংসার, এত রক্ত ক্ষয়ের অথচ সে পথে আমরা জয় করে নিতে পারতাম আমাদের শহীদদের স্বপ্নের অখণ্ড ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতা।

দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, স্বাধীনতা অর্জনের পরেও কংগ্রেস-নেতৃত্বের এই গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতি বিমুখতা ও বিরোধিতার নীতি অব্যাহত আছে, যদিও এখন প্রধানতঃ রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহারের মাধ্যমেই এই আমূল গণতান্ত্রিক রূপায়ণ সংঘটিত করা সম্ভব। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এই প্রতিক্রিয়াশীল নীতিই প্রকাশ পাচ্ছে সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতায়, যার দরুন আজও চলছে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও পীড়ন এবং বহুজাতিক পুঁজির প্রবেশ ও প্রসার। এই নীতিই প্রকাশ পাচ্ছে জাতিসত্তা-গুলির প্রতি, তথা অঙ্গরাজ্যগুলির প্রতি, কর্তৃত্ববাদী আচরণ, যার সুযোগ নিয়ে কোণে কোণে আত্মপ্রকাশ করেছে বিচ্ছিন্নতাকামী ও বিভেদবাদী শক্তিসমূহ এবং বিপন্ন করে তুলেছে এই খণ্ডিত ভারতেরও রাষ্ট্রীয় সংহতি। এই নীতিই প্রকাশ পাচ্ছে ধর্মের ক্ষেত্রে তথা সামাজিক সমস্যা-সমাধানের ক্ষেত্রে মৌলবাদী ও সনাতন-পন্থীদের কাছে আত্মসমর্পণে। এই যদি হয় পরিস্থিতি, তাহলে যে ভারতকে নিয়ে কংগ্রেস-নেতৃত্ব প্রবেশ করবেন একবিংশ শতাব্দীতে, তা হবে জেট বিমানের 'হাই-টেকনোলজি'-যুক্ত মান্ধাতার আমলের গোরুর গাড়ির মত।

কংগ্রেস-নেতৃত্বের এই নেতিবাচক দিকগুলি তুলে ধরায় কেউ যেন মনে না করেন তার ইতিবাচক দিকগুলির প্রতি আমি অন্ধ। মোটেই নয়। পরাধীন ভারতে ব্যাপক জনগণকে আন্দোলনের মধ্যে টেনে আনা, তাদের মধ্যে মর্যাদাবোধ সৃষ্টি করা, পরিকল্পিত অর্থনীতির আদর্শে জনগণকে সচেতন করা, বিভিন্ন দেশের প্রগতিশীল আন্দোলনের পক্ষে জনগণের মধ্যে সমর্থন সৃষ্টি করা, এবং স্বাধীন ভারতে সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তন করা, পরিকল্পিত অর্থনীতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া, সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রমুখ সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে-মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করা, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতার নীতি ও সেই সঙ্গে

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার নীতি অনুসরণ করা, পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের নিষিদ্ধকরণ ও বিশ্বযুদ্ধের বিরুদ্ধাচরণের আন্দোলনে অংশগ্রহণের মধ্যে বিশ্ব শান্তির লক্ষ্যে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করা ইত্যাদি নিশ্চয়ই কংগ্রেস-নেতৃত্বের ইতিবাচক কৃতিত্ব। এসব সম্পর্কে স্বীকৃতি ও প্রশংসা প্রায় সর্বজনীন। অতএব, "অলমতি বিস্তারেন।" কিন্তু তৎসত্ত্বেও, আমি অবশ্যই বলব যে কংগ্রেস-নেতৃত্বে যদি কোনও গুণগত পরিবর্তন না ঘটে কিংবা, তার অভাবে, যদি কোনো বাম-গণতান্ত্রিক বিকল্প তার স্থান না গ্রহণ করে, তবে ভারতের রাষ্ট্রীয় সংহতির বিপন্মুক্তি জনগণের অর্থ নৈতিক অভাবমুক্তি এবং অজ্ঞতা ও কুসংস্কার থেকে মুক্তি হবে সুদূরপরাহত।

৮।৪।৮৬

গান্ধী-নেতৃত্বের শ্রেণীদর্শন

২রা অক্টোবর গান্ধীজীর জন্মদিন। প্রতিবছর যেমন হয়, এ বছরও তেমনই হবে—সরকারি বেসরকারি নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হবে, সভা-সমাবেশে তাঁর অসমাপ্ত কাজকে সুসমাপ্ত করার সংকল্প ধ্বনিত হবে। আমরাও তাঁর প্রতি জ্ঞাপন করি আমাদের শ্রদ্ধা—তবে তাঁর অসমাপ্ত কাজকে সুসমাপ্ত করার আনুষ্ঠানিক সংকল্প গ্রহণের আগে আন্তরিকভাবে জানতে চাই কি সেই কাজ, বুঝতে চাই সত্য-সত্যই তা সমাপ্য কিনা, এবং সমাপ্য যদি তা হলে সম্ভাব্য কিনা।

বলা বাহুল্য, তাঁর কোনো কাজ অসমাপ্ত আছে কিনা এবং থাকলে, কতটা অসমাপ্ত আছে, তা ভাল ভাবে জানতে হলে আগে জানা দরকার কি কি কাজ তিনি করতে চেয়েছিলেন এবং তার কতটা তিনি করে যেতে পেরেছেন। স্বাভাবিক ভাবেই বুঝে নিতে হবে কি ছিল তাঁর কাজের পিছনে দৃষ্টিভঙ্গি তথা দর্শন। আর তার জন্য প্রয়োজন এই সময়কাল জুড়ে তাঁর কর্মজীবনের সঙ্গে সাগ্রহ পরিচয়। তাই শুরু করছি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কাল থেকে এ দেশে তাঁর কর্মজীবনের সূচনা থেকেই।

শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের সূচনায় বিদেশপ্রত্যাগত গান্ধীজী যখন স্বদেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন, তখন ভারতের জাতীয় আন্দোলন এক নতুন পর্যায়ে পদার্পণে প্রস্তুত। সুরেন্দ্র-অরবিন্দের নেতৃত্বে উদ্বোধিত, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতে উদ্বেলিত, প্রফুল্ল-ক্ষুদিরামের আত্মদানে উদ্দীপিত, শতসহস্র উৎসর্গিত-প্রাণ নর-নারীর অকুতোভয় সংগ্রামে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ পরাহত—ভগ্নবঙ্গ পুনর্মিলিত। বাংলার মাটিতে সাম্রাজ্যবাদের এই পরাজয়ে জাতীয় আন্দোলনের এই অভূতপূর্ব বিজয়লাভে আসমুদ্র-হিমাচল তখন রোমাঞ্চিত, অভ্যুত্থানের আহ্বানের জন্য উচ্চকিত। এই প্রোজ্জ্বল পটভূমিকায় গান্ধীজীর আবির্ভাব এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় সফল সত্যাগ্রহের গৌরবে সাদরে জাতীয় আন্দোলনের তথা কংগ্রেসের নেতৃত্বে তাঁর অভিষেক।

পরনে কটিবস্ত্র, হাতে চরকা, মুখে অহিংসার বাণী—গান্ধীজী জাতীয় আন্দোলনের বল্গা হাতে তুলে নিতে না নিতেই বেজে উঠলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা। সাম্রাজ্যবাদী এই যুদ্ধ কোনো পক্ষের জয়ে বা পরাজয়েই মুক্তিকামী মানুষের বা দেশের নেই কোনো স্বার্থ, তাই লেনিন আহ্বান জানালেন দেশের মানুষকে, দুনিয়ার মানুষকে, ওঠো! জাগো! এই যুদ্ধকে পরিণত করো গৃহযুদ্ধে! নিজের হাতে দখল করো ক্ষমতা! আর অন্যদিকে গান্ধীজী শোনালেন তাঁর অমৃতবাণী: ইংরেজ আজ জার্মান আক্রমণের মুখে বড়ই বিপন্ন; তার এই বিপদের সুযোগ নেওয়া আমাদের অনুচিত;

বরং আমাদের উচিত হবে যথাসাধ্য তাকে সাহায্য করা। এবং কিমাশ্চর্যমতঃপরম? অহিংস গান্ধীজী এই বিশ্বজোড়া হিংসার তাণ্ডবে ভারত থেকে বলির পশুসংগ্রহ করে দেবার জন্য স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 'রিক্রুটিং সার্জেন্ট'-এর পদ এবং জার্মান কামানের খোরাক হবার জন্য ইংরেজের হাতে তুলে দিলেন হাজার হাজার ভারতীয় তরুণকে!....মানুষ বিস্মিত হল, কিন্তু যুগ-যুগ-সঞ্চিত কুসংস্কারে মগ্ন অবতার-পয়গম্বরবাদের বিশ্বাসে বিমূঢ় মানুষ এই ভেবে সান্ত্বনা পেল, কি জানি এ ও হয়তো মহাত্মার মাহাত্ম্য!

যুদ্ধ শেষ হল। লেনিনের নেতৃত্বে পরিচালিত রাশিয়ার মেহনতি মানুষ বিজয়ী বিপ্লবের মাধ্যমে জারতন্ত্রকে চুরমার করে দিয়ে দখল করলো ক্ষমতা। আর আমাদের দেশে গান্ধীজীর নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ পেল প্রচণ্ড ঔদ্ধত্য, দেশের মানুষ পেল মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসনসংস্কার, অসহ্য অত্যাচার—এবং সর্বোপরি জালিয়ান-ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড। প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করলেন সাহিত্যে নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত 'নাইটহুড'। গান্ধীজী কিন্তু প্রতিবাদ করতে কেবল অসম্মতিই প্রকাশ করলেন না, যুদ্ধকালীন অবদানের জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক প্রদত্ত 'কাইজার-ই-হিন্দ' উপাধিটি প্রত্যাখ্যান করার অনুরোধ রক্ষা করতেও তিনি অস্বীকৃতি জানালেন! হিজলী জেলে গুলি চালিয়ে রাজবন্দী হত্যার যে-নির্লজ্জ নজীর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ স্থাপন করেছিল, তারও প্রতিবাদ জানাতে অস্বীকার করেছিলেন গান্ধীজী এবং রবীন্দ্রনাথকে বাধ্য করেছিলেন লিখতে:

"ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত
পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে—
তারা বলে গেল 'ক্ষমা করো সবে',
বলে গেল 'ভালোবাসো—
অন্তর হতে বিদ্বেষ-বিষ নাশো'।
বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও
বাহির-দ্বারে
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে।"

অর্থাৎ, হে ভগবান, গান্ধীজীর মতো অনেক দূত তুমি পাঠিয়েছো; তাঁরা অনেক উপদেশামৃত বর্ষণ করে গিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের মতো উপদেষ্টাদের আজ আমাদের প্রয়োজন নেই; তাই তাঁদের শূন্যহস্তে প্রণাম জানিয়ে বলি, ঢের হয়েছে, এবার আসুন!

গান্ধীজী সাম্রাজ্যবাদকে ক্ষমা করলেও দেশবাসী কিন্তু ক্ষমা করেনি। সভা-সমাবেশে, মিছিলে-বিক্ষোভে গোটা দেশ উত্তাল হয়ে উঠলো। ধর্মঘটে ধর্মঘটে কলকারখানা অচল হয়ে গেল। বাস্তবিক পক্ষে ১৯০৮ সালে বোম্বাইয়ে তিলকের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে যে বিরাট ধর্মঘট হয়, যে ধর্মঘটকে অভিনন্দন জানিয়ে লেনিন তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন এবং লিখেছিলেন, ভারতের শ্রমিকরা এখন শ্রেণী-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত, তারপর থেকে বিশেষ করে গান্ধীজীর নেতৃত্বগ্রহণের পর থেকে শ্রমিক-শ্রেণীর জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণে বেশ একটা ভাঁটার কাল চলছিল। কিন্তু ১৯১৯-২০ সালে সে ভাঁটার কাল কেবল অতিক্রান্তই হল না, দুকূলপ্লাবী জোয়ারে সব ভাসিয়ে নিয়ে গেল। এই পটভূমিকাতেই ১৯২১ সালে কংগ্রেস সম্মেলনে সদ্য-প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্র মৌলানা হজরত মোহানী উত্থাপন করলেন 'পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব'! উপস্থিত প্রতিনিধিদের অবাক করে দিয়ে গান্ধীজী এই প্রস্তাবের বিপক্ষে তীব্র আক্রমণ চালালেন এবং ঘোষণা করলেন, আমাদের লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা নয়, আমাদের লক্ষ্য ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস'। জাতীয় আন্দোলনের অধিনায়কের মুখে এই ঘোষণা সাম্রাজ্যবাদের কাছে উপভোগ্য হতে পারে, কিন্তু ভারতবাসীর কাছে কিছুতেই নয়। তাই বুকের বিক্ষোভ বুকে চাপা দিয়ে ভারতবাসী নীরবে প্রতীক্ষা করতে লাগলো বিস্ফোরণের মুহূর্তটির জন্য।

সেই মুহূর্তটি এসে গেল অচিরেই। খিলাফৎ আন্দোলনের নেতৃত্বের সঙ্গে একযোগে গান্ধীজী ঘোষণা করলেন অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। কেবল তাই নয়, দেশবাসীর কাছে তিনি অঙ্গীকার করলেন একবছরের মধ্যে, ১৯২১ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে, 'স্বরাজ' অর্জনের। জনগণের কণ্ঠে দিলেন তিনটি স্লোগান : 'আল্লাহো আকবার!' 'বন্দেমাতরম্!' এবং 'হিন্দু-মুসলমান কি জয়!' তাদের সামনে রাখলেন তিনটি বয়কট : আইনসভা বয়কট, আদালত বয়কট, স্কুল-কলেজ বয়কট। আর দিলেন তিনটি কাজ : চরকা কাটো, বিলাতি ছাড়ো, খাদি পরো। এক বছরের মধ্যে স্বরাজ্যের স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ উদ্দীপ্ত মানুষ দলে দলে সমবেত হল সেই আন্দোলনে। আদালত থেকে বেরিয়ে এলেন উকিল-ব্যারিস্টাররা, আইনসভা থেকে সভাসদরা স্কুল-কলেজ থেকে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকারা; হিন্দু-মুসলমান, নারী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ মানুষ সর্বস্ব পণ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল স্বরাজের স্বপ্ন-রূপায়ণের দেশজোড়া মহাস্রোতে। প্লাবন যখন আসে তাকে কি বাঁধা যায় কূলের বাঁধনে? বাঁধভাঙ্গা এই জন-জোয়ারও বাঁধা রইল না গান্ধীজীর নির্দেশিত সীমা-শর্তের মধ্যে। কোথাও শুরু হল 'বিলাতি পোড়াও', কোথাওবা 'খাজনা বন্ধ', কোথাওবা শ্রমিক ধর্মঘট, কোথাওবা নিষ্ক্রিয় অসহযোগ আকার নিল সক্রিয় বিদ্রোহে। শুরু হল সাম্রাজ্যবাদের নৃশংস দমন-পীড়ন—লাঠি, গুলি, হত্যা; শত শত হত আহত হাজার হাজার কারারুদ্ধ অগণিত। কিন্তু এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে? প্রমাদ গুনলো সাম্রাজ্যবাদ, যায় বুঝি, সব যায়!....কিন্তু প্রমাদ গুণলেন গান্ধীজীও, এ অশান্তিপূর্ণ জঙ্গী আন্দোলন

তো তিনি চাননি। অবশেষে চৌরিচোরায় পুলিশের গুলিতে নিহত কৃষকদের আহত সহযোদ্ধাদের থানা আক্রমণ ও পুলিস হত্যাকে উপলক্ষ্য করে তিনি প্রত্যাহার করে নিলেন সেই আন্দোলন। আশ্বস্ত হল ইংরেজ, বিস্মিত হল বাকি নেতৃত্ব, বিক্ষুব্ধ হল সাধারণ মানুষ। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী তাদের সেই রুদ্ধ আবেগ পরে আত্মপ্রকাশ করল ভ্রাতৃঘাতী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়।

১৯২৪ সালে সর্বকালে সর্বদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী মহানায়কদের অন্যতম লেনিনের মৃত্যু হল রাশিয়ায়। কংগ্রেসের সম্মেলনে শোক-প্রস্তাব উত্থাপন করতে চাইলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। অহিংসার পূজারী গান্ধীজী নিরস্ত করলেন তাঁকে। সহিংস সংগ্রামের সেনাপতিকে কি করে শ্রদ্ধা জানাতে পারে অহিংস আন্দোলনের পতাকা-বাহী কংগ্রেস? স্মরণীয় যে, লেনিনের মৃত্যু-সংবাদ সাম্রাজ্যবাদের তৎকালীন মুখপত্র 'স্টেটসম্যান' কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল যে স্তম্ভে তার শিরোনাম ছিল 'A BANDIT PASSES AWAY'। গান্ধীজী বা 'স্টেটসম্যান' চান আর না চান বিশের দশকে সমাজতান্ত্রিক তথা কমিউনিস্ট আন্দোলন কেবল কংগ্রেসের বাইরে নয়, কংগ্রেসের ভিতরেও সংহতি লাভ করছিল। কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে শ্রমিক-শ্রেণীর মধ্যে যেমন আত্মপ্রকাশ করছিল সংগ্রামী শ্রেণী-চেতনা, অন্যদিকে তাদেরই উদ্যোগে কংগ্রেসের মধ্যে গড়ে উঠছিল একটি বামপন্থী ধারা। কেবল তাই নয়, নেপথ্যে সারা দেশজুড়ে সুসংগঠিত হচ্ছিল সমাজতন্ত্রের প্রতি উৎসর্গিত এক দুঃসাহসিক যুব-সংগঠন—'হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট-রিপাবলিকান আর্মি'—পূর্বপ্রান্তে যার সেনাপতি ছিলেন সূর্য সেন এবং পশ্চিমপ্রান্তে ভগৎ সিং।

১৯২৮ সাল থেকে ভারতের রাজনৈতিক আকাশে ফুটে উঠতে লাগলো আসন্ন ঝড়ের নিশ্চিত পূর্বাভাস। শ্রমিক আন্দোলনের দুর্বার অগ্রগতি, পৌনঃপুনিক শ্রমিক ধর্মঘটের উত্তাল তরঙ্গ, সাইমন কমিশন বয়কটে শ্রমিক-শ্রেণীর অগ্রণী ভূমিকা ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে বামপন্থীদের জয়লাভ এবং সর্বোপরি 'পূর্ণ স্বাধীনতা ও স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের' দাবিতে কলকাতা কংগ্রেস ৫০,০০০ শ্রমিকের সংগ্রামী মিছিল দেশজুড়ে সূচনা করল এক নতুন অধ্যায়। ১৯২৮ সালে গান্ধীজীর প্রতি-বন্ধকতায় 'পূর্ণ স্বাধীনতার' প্রস্তাব গ্রহণ স্থগিত রাখা হলেও ১৯২৯ সালে কংগ্রেস সেই প্রস্তাব গ্রহণে বাধ্য হয়। ইতিমধ্যে সাম্রাজ্যবাদ আঘাত হানলো শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্বের উপরে—কারারুদ্ধ নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হল সশস্ত্র সংগ্রামের সাহায্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ সাধনের, আদালতকক্ষে তাদের দৃপ্ত বিবৃত উদ্দীপ্ত করল সমগ্র দেশবাসীকে। ১৯৩০ সালে গৃহীত হল স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা—যা মূলত ছিল লাল, সাদা ও সবুজ কিন্তু গান্ধীজীর প্রস্তাব অনুসারে শেষ পর্যন্ত হল গেরুয়া, সাদা ও সবুজ। ১৯৩০ সালে ২৬ জানুয়ারি

মহাসমারোহ ও উদ্দীপনার মধ্যে উড্ডীন হল ভারতের জাতীয় পতাকা। কোটি কণ্ঠে আওয়াজ উঠলো: UP UP THE NATIOAL FLAG! DOWN DOWN THE UNION JACK!

বিস্ময় ও বিষাদের বিষয় এই যে, পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণের পরেও গান্ধীজী এক বিবৃতি মারফৎ ঘোষণা করলেন, "স্বাধীনতার প্রস্তাবে কারো শঙ্কিত হবার কারণ নেই" এবং সেই সঙ্গে তিনি উপস্থিত করলেন একটি 'এগারো দফা দাবিপত্র', যা ব্রিটিশ সরকার মেনে নিলে তিনি স্থগিত রাখবেন পূর্ণ স্বাধীনতার আন্দোলন। এই যখন তাঁর মনোভাব, তখন বামপন্থীদের দ্বারা উপস্থাপিত পালটা সরকার প্রতিষ্ঠা এবং সেই উদ্দেশ্য সামনে রেখে শ্রমিক, কৃষক ও যুবকদের সংগঠিত করার প্রস্তাব যে তিনি প্রত্যাখ্যান করবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি? ১৯৩০ সালের মার্চ মাসে গান্ধীজী বড়লাটকে এক চিঠি লেখেন, "হিংসায় বিশ্বাসী পার্টিটি প্রভাব বিস্তার করছে…আমার অভিপ্রায় একই সঙ্গে ব্রিটিশের সংগঠিত হিংসা ও হিংসায় বিশ্বাসী বর্ধিষ্ণু পার্টিটির অসংগঠিত হিংসা—এই দুয়েরই বিরুদ্ধে আমার অহিংসার শক্তিকে প্রয়োগ করা!' বলাবাহুল্য, হিংসায় বিশ্বাসী বর্ধিষ্ণু পার্টিটি বলতে গান্ধীজী কমিউনিস্ট পার্টিকেই বুঝিয়েছেন।

যাইহোক প্রতীক্ষার পরে প্রতীক্ষা করেও গান্ধীজী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে অনুকূল সাড়া পেলেন না। সুতরাং বাধ্য হয়েই তাকে ঘোষণা করতে হল 'আইন অমান্য আন্দোলন'। কি হবে সেই আন্দোলনের রূপ? গান্ধীজীর মুখেই শুনুন: "আমার অভিপ্রায়, আমার আশ্রম-বাসীদের মাধ্যমে এবং অন্যান্য যাঁরা আমার আশ্রমের আদর্শ মেনে নিয়েছেন এবং তা রূপায়ণের আশ্রমিক পদ্ধতি আয়ত্ত করেছেন, কেবল তাদের মাধ্যমে আন্দোলন শুরু করা।" সুতরাং ৬ এপ্রিল হাত-বাছাই আটাত্তর জন শিষ্যকে নিয়ে তিনি শুরু করলেন তাঁর ঐতিহাসিক ডাণ্ডি অভিযাত্রা, লক্ষ্য লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা করা: তিনি ঘোষণা করলেন "আমাদের পথের রূপরেখা তৈরি। পল্লীতে পল্লীতে বে-আইনি লবণ তৈরি করুন, ভগিনীরা মদের দোকান আফিমের আখড়া ও বিলাতি কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করুন। যুবাবৃদ্ধানির্বিশেষে ঘরে ঘরে প্রত্যেকে তকলি কাটুন, প্রচুর পরিমাণ সুতো তৈরি করুন। বিলাতি কাপড় পুড়িয়ে দিন। হিন্দুরা অস্পৃশ্যতা বর্জন করুন। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, পার্সী, খ্রীষ্টান সকলে অন্তরে অন্তরে মিলিত হোন, ছাত্র-ছাত্রী সরকারি স্কুল-কলেজ থেকে বেরিয়ে আসুন। সরকারি কর্মচারীরা সরকারি চাকুরি থেকে পদত্যাগ করে জনগণের সেবার আত্মনিয়োগ করুন এবং অচিরেই আপনারা দেখতে পাবেন 'পূর্ণ স্বরাজ' আমাদের দরজায় আঘাত করছে।" কিন্তু গান্ধীজীর

পথনির্দেশ সত্ত্বেও গণ-আন্দোলন ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠতে লাগলো। হিংসা-অহিংসার পার্থক্য ঘুচিয়ে দিয়ে গণঅভ্যুত্থান জঙ্গী আকার ধারণ করল! চট্টগ্রামের বীর বিপ্লবীরা অস্ত্রাগার দখল করে নিয়ে চট্টগ্রামকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করল। মেদিনীপুরে স্থাপিত হল পাল্টা সরকার। শোলাপুরে শ্রমিকশ্রেণী স্থাপন করল শ্রমিক-রাজ। দেশজুড়ে এখানে সেখানে শুরু হল কৃষক-অভ্যুত্থান এবং খাজনা-বন্ধ অভিযান। পেশোয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করল, সেখানে মুসলমান পাঠানদের দমন করবার জন্য পাঠানো হল হিন্দু গাড়োয়ালী সেনাবাহিনী, কিন্তু ব্রিটিশ সেনাপতির নির্দেশ উপেক্ষা করে তারা গুলি চালাতে অস্বীকার করল দেশ-প্রেমিক ভাইদের উপরে।.... এ এক নতুন ভারতবর্ষ—অদৃশ্য অপ্রতিরোধ্য, অজেয়। প্রমাদ গুনলো ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ—সাম্রাজ্য রক্ষার আর কোনো উপায় নেই; প্রমাদ গুনলেন আইন অমান্য আন্দোলনের সর্বাধিনায়ক গান্ধীজীও—এ স্বাধীনতা তো তিনি চাননি, এবং এখনো চান না। অহিংসার পূজারী গান্ধীজী, সাম্প্রদায়িক ঐক্যের প্রবক্তা গান্ধীজী ক্ষুব্ধ হলেন ব্রিটিশ সেনাপতির আদেশ উপেক্ষা করে মুসলমান দেশ-প্রেমিকদের উপরে হিন্দু সৈনিকদের গুলি চালাতে অস্বীকার করায়! তিনি বললেন, "সৈনিকের পক্ষে আদেশ অমান্য করা শপথ ভঙ্গ করারই সমান।"

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। না, এখনো আশা আছে শেষ-রক্ষার—কেননা গান্ধীজী তো আছেন। দূত পাঠানো হল গান্ধীজীর কাছে; তিনি ফিরে এসে ব্রিটিশ সরকারকে জানালেন, "কারাগারের নিঃসঙ্গত্বের মধ্যেও তিনি তীব্রভাবে সচেতন যে তিক্ততা এমনভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে; সেই কারণে তিনি যথা-সম্ভব শীঘ্র শান্তি ও সহযোগিতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা চান—যদি সৎভাবে তা করা যায়।.... তাঁর প্রভাব এখনো বিরাট কিন্তু ঢের বেশি বিপজ্জনক ও অনিয়ন্ত্রণযোগ্য শক্তিসমূহ প্রত্যহ বল সঞ্চয় করছে।"....অব্যবহিত পরেই কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন গান্ধীজী স্বয়ং এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যবৃন্দ। শুরু হল সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি-দের সঙ্গে কংগ্রেস নেতৃত্বের আলোচনা—এবং স্বাক্ষরিত হল 'গান্ধী-আরুইন চুক্তি'। পূর্ণ স্বাধীনতা তো দূরের কথা, এমন কি গান্ধীজীর এগারো দফা দাবিপত্রের একটি দাবিও এই চুক্তিতে স্বীকৃতি পেলনা। নব্বই হাজার বন্দীর মধ্যে মুক্তি পেল কেবল গান্ধীজীর কয়েক হাজার 'নিরামিষ' শিষ্য; বাকিরা ভোগ করতে থাকলেন কারা-নির্যাতন; আদেশ অমান্যের জন্য 'কোর্ট মার্শাল' করা হল অবাধ্য সৈন্যদের সূর্য সেন ও তাঁর সহযোদ্ধাদের ফাঁসী এর আগেই হয়ে গিয়েছে, ফাঁসী হল ভগৎ সিং ও তার সহযোদ্ধাদের।

গান্ধী-আরুইন চুক্তি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে সুভাষচন্দ্র লিখেছেন, 'সাধারণভাবে যুব সমাজ দারুণভাবে বিক্ষুব্ধ হল।' জওহরলাল লিখেছেন, 'মাত্র এই জন্যই কি আমাদের জনগণ এক বছর ধরে এমন বীরের মতো আচরণ করেছেন? আমাদের

সব বড় বড় কথা ও কাজের এই কি শেষ পরিণতি? এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে আমাদের কবিগুরুর সেই ব্যাকুল জিজ্ঞাসা :

"বীরের এ রক্তস্রোত
মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি
ধরার ধূলায় হবে হারা?
স্বর্গ কি হবে না কেনা?
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না এত ঋণ?
রাত্রির তপস্যা
সেকি আনিবেনা দিন?

১৯৩৪ সালে গান্ধীজী আনুষ্ঠানিকভাবে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন এবং তার কিছুকাল পরে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে অহিংসার অপলাপ ঘটার কারণ দেখিয়ে তিনি কংগ্রেসের সদস্যপদ পরিত্যাগ করলেন। লক্ষণীয় এই যে "তাঁর যেমনি যাওয়া তেমনি আসা", কেননা সদস্যপদ পরিত্যাগ করার আগেও যেমন তিনি ছিলেন নেতৃত্ব-নিয়ন্তা, পরেও তেমন রইলেন। ১৯৩৫ সালের 'ভারত শাসন আইন' সমগ্রভাবে প্রত্যাখ্যান করা সত্বেও ১৯৩৭ সালে সেই আইনের অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং নির্বাচনে সুবিপুল সাফল্যলাভের কল্যাণে প্রদেশে প্রদেশে সেই আইনের অধীনে শাসন কার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ—এইসব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল গান্ধীজীরই অভিভাবকসুলভ পরামর্শে। কেবল তাই নয় শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পরে বিভিন্ন কংগ্রেস-সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে সংগ্রামী দেশপ্রেমিকদের গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড, বিক্ষোভ-প্রদর্শনকারী শ্রমিকদের উপরে লাঠি ও গুলি চালনা—এসব কিছুই পেয়েছিল গান্ধীজীর নিঃশর্ত সমর্থন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মাদ্রাজ প্রদেশের ঘটনাবলী ও সে সম্পর্কে গান্ধীজীর প্রতিক্রিয়া উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানে রাষ্ট্রদ্রোহের 'অপরাধে' একজন কংগ্রেস সোস্যালিস্ট নেতাকে ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়; বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের উপরে হিংসার তাণ্ডব চালানো হয়। এ সম্পর্কে গান্ধীজীর মতামত জানতে চাইলে তিনি মন্তব্য করেন, সরকার চালাতে হলে এসব অপরিহার্য। হিংসাত্মক প্রচারকার্যের অপরাধে অপরাধীদের উপরে পুলিসের লাঠি ও গুলি চালানোও বোধহয় গান্ধীবাদী অহিংসার অন্তর্ভুক্ত!

১৯২১-২৪ সালের অভিজ্ঞতা তো আগেই হয়েছিল; ১৯৩০-৩৪ সালের অভিজ্ঞতাও হল; তারপরে এলো কংগ্রেসী শাসনের অভিজ্ঞতাও। সুতরাং কংগ্রেসের অভ্যন্তরে শুরু হয়ে গেল বামপন্থীদের জোটবাঁধার এবং সম্ভব হলে কংগ্রেসের নেতৃত্ব-দখলের জোর তৎপরতা। প্রথমে তারা এগোতে লাগলো জওহরলালকে সামনে

রেখে কিন্তু অচিরেই তারা উপলব্ধি করল যে, মুখে যতই বামপন্থী হন না কেন, কাজের বেলায় গান্ধীজীর কাছে আত্মসমর্পণ করাই তাঁর অভ্যাস—তাঁর প্রকৃতি। স্বভাবতই তারা সমবেত হতে থাকলো সুভাষচন্দ্রকে সামনে রেখে এবং কাজের কাজও কিছু হল ; কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থীদের—বামজাতীয়তাবাদী, সোশ্যালিষ্ট ও কমিউনিস্টদের —সংগঠিত শক্তিবৃদ্ধি স্বপ্রকাশ হয়ে উঠলো। নিষ্ক্রিয় ছিলেন না দক্ষিণপন্থীরা, নির্লিপ্ত ছিলেন না গান্ধীজী ; ভিতরে ভিতরে তারাও প্রস্তুত হতে লাগলেন শক্তি পরীক্ষার জন্য।

অবশেষে দু-পক্ষের মধ্যে মোকাবেলা হল ১৯৩৯ সালে কংগ্রেস সভাপতির পদকে কেন্দ্র করে। উল্লেখযোগ্য যে, কংগ্রেসের সংবিধান অনুসারে সভাপতি কেবল নামসর্বস্ব প্রধান নয়, কার্যতও প্রধান এবং কংগ্রেসের সর্বোচ্চ কার্যনির্বাহী সংস্থা 'ওয়ার্কিং কমিটি' তিনিই মনোনীত করেন। বামপন্থীদের সমর্থনে সুভাষচন্দ্র এই পদের জন্য পুনরায় নির্বাচনপ্রার্থী হলেন। অন্যদিকে দক্ষিণপন্থীদের সমর্থনে গান্ধীজীর প্রকাশ্য পৃষ্ঠপোষকতায় ঐ পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন পট্টভি সীতারামায়া। ১৯৯ ভোটের ব্যবধানে সুভাষচন্দ্র সীতারামায়াকে পরাস্ত করে বিপুল উত্তেজনার মধ্যে পুনরায় সভাপতি পদে নির্বাচিত হলেন। বিস্মিত বিক্ষুব্ধ গান্ধীজী ঘোষণা করলেন, "সীতারামায়ার পরাজয় আমারই পরাজয়।" এই প্রথম কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বাম ও দক্ষিণের মধ্যে সীমারেখা টানা হল ; এই প্রথম বাম ও দক্ষিণের মধ্যে শক্তিপরীক্ষা হল ; এই প্রথম গান্ধীজী উভয় পক্ষের অভিভাবকের বাহ্যিক ভূমিকা ত্যাগ করে প্রকাশ্যেই এক পক্ষের—দক্ষিণ পক্ষের - অধিনায়ক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন। পট্টভি সীতারামায়ার সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেই তিনি ক্ষান্ত হলেন না ; তার অনুগামীদের তিনি প্ররোচিত করলেন 'ওয়ার্কিং কমিটি' থেকে পদত্যাগ করতে এবং তাঁর প্ররোচনায় 'ওয়ার্কিং কমিটির' পনেরোজন সদস্যের মধ্যে এগারোজনই পদত্যাগ করলেন। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তথা বামপন্থীদের সঙ্গে অসহযোগিতার জন্য তিনি এবং তাঁর পার্শ্বচররা খোলাখুলিই প্রচারে নেমে গেলেন। অবশেষে বিমূঢ়, বীতশ্রদ্ধ সুভাষচন্দ্র তাঁর বামপন্থী সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ না করে সভাপতিত্ব থেকে পদত্যাগ করলেন এবং প্রতিষ্ঠা করলেন 'ফরওয়ার্ড ব্লক'। গান্ধীজীর সাধ পূর্ণ হল ; রাজেন্দ্রপ্রসাদকে সভাপতি করে গঠিত হল কংগ্রেস নেতৃত্ব। 'ফরওয়ার্ড ব্লক-সহ সুভাষচন্দ্র এবং অন্যান্য বামপন্থী সংস্থা ও ব্যক্তিও কিন্তু থেকে গেলেন কংগ্রেসেরই মধ্যে সদস্য হিসাবে। পরে অবশ্য সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস থেকে 'সাসপেণ্ডেড' হলেন।

এই পরিস্থিতিতে এলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ—পুরনো সাম্রাজ্যবাদ বনাম নোতুন সাম্রাজ্যবাদ তথা 'ফ্যাসিবাদ'। ১৯১৪ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যেমন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতের মতামত যাচাই না করেই ভারতকে করে নিয়েছিল তার যুদ্ধের

সাকরেদ, তেমনি এবারও সে ঘোষণা করে দিলে যে এই যুদ্ধে ভারতও তার শরিক। কিন্তু ১৯৩৯ সাল তো ১৯১৪ সাল নয়। বোম্বাইয়ে দু-লক্ষ নব্বই হাজার শ্রমিক এক দিনের জন্য প্রতীক ধর্মঘট করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে হুঁশিয়ার ক'রে দিলো, সাম্রাজ্যবাদ বনাম সাম্রাজ্যবাদ এই যুদ্ধে ভারত শরিক হতে পারে না, শরিক হবেও না। কমিউনিস্ট পার্টি আওয়াজ তুললো, "না এক পাই! না এক ভাই!"—সাম্রাজ্যবাদী এ যুদ্ধে কোনো সাহায্য নয়। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ঘোষণা করলো, ভারতে ও অন্যত্র সাম্রাজ্যবাদকে সংহত করতে যে যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ পরিচালনা করছে, কংগ্রেস তার সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারে না। গান্ধীজী কিন্তু সকলকে অবাক করে দিয়ে, 'হরিজন' পত্রিকায় লিখলেন, ব্রিটেনের এই যুদ্ধ ন্যায়যুদ্ধ। ভারতের উচিত নিঃশর্তভাবে ব্রিটেনের সঙ্গে সহযোগিতা করা। এই মুহূর্তে আমি ভারতের মুক্তির কথা ভাবছি না। মুক্তি আসবে, কিন্তু ইংল্যাণ্ড আর ফ্রান্স যদি হেরে যায়, তাহলে সে মুক্তির মূল্য কি? (৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯)

কেবল তাই নয়, ১৯৪০-এর জানুয়ারিতে 'হরিজন'-এ তিনি আরও বিশদভাবে তাঁর মনের কথা ব্যক্ত করে লেখেন, "বিরাট প্রভাবশালী একজন কংগ্রেস-নেতা আমার কাছে প্রস্তাব করেছেন যে, এই ভাবে যে মুহূর্তে আমি আইন অমান্যের আহ্বান দেব, সেই মুহূর্তে আমি পাব চমকপ্রদ সাড়া। ভারতের সমগ্র শ্রমিকসমাজ এবং বহু বহু অংশের কিষাণেরা যুগপৎ ধর্মঘট ঘোণা করবে। আমি তাঁকে বললাম, "তা যদি হয়, তাহলে আমি সবচেয়ে বেশি বিড়ম্বিত হব, আমার সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাবে।......আমি আশা করি এটা কেউ প্রত্যাশা করবেন না যে আমি জেনে-শুনে এমন একটা সংগ্রাম শুরু করব, যা শেষ হবে অরাজকতায় ও লাল ধ্বংসকাণ্ডে।"

১৯৪১ সালের ২২ জুন শুরু হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়। গোটা পশ্চিম ইয়োরোপকে পদানত করে, ব্রিটেনকে বিমান-আক্রমণে বিপর্যস্ত করে, হিটলার-জার্মানি ঐ দিনটিতে আক্রমণ করল সমাজতন্ত্রের দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নকে। কিছুটা বিলম্বে হলেও ভারতে কমিউনিস্টরা সঠিক ভাবেই ঘোষণা করল যে যুদ্ধের গতি-প্রকৃতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে; এ যুদ্ধ আর সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নেই, রূপান্তরিত হয়েছে জনযুদ্ধে। এ যুদ্ধে যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন পরাস্ত হয়, তাহলে স্বাধীন দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রের এবং পরাধীন দেশগুলিতে স্বাধীনতার সংগ্রাম সুদীর্ঘকালের জন্য দলিত হবে ফ্যাসিবাদী বুটের তলায়। অন্যদিকে যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন জয়লাভ করে, তাহলে দেশে দেশে সমাজতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম দ্রুত বিজয়লাভের পথে অগ্রসর হবে। সুতরাং ব্রিটিশ সরকার যা-ই বলুক বা যা-ই করুক, ভারতবাসীর কর্তব্য হবে নিজেদের দেশের স্বাধীনতার জন্যই সোভিয়েত নেতৃত্বে পরিচালিত শক্তিজোটকে সাহায্য করা; কংগ্রেস-নেতৃত্বের কর্তব্য হবে, দরকার হলে শর্তহীনভাবেও, যুদ্ধ আয়োজনে সহযোগিতা করা এবং তার উদ্যোগ নিজের হাতে তুলে নেওয়া। বর্দলই অধিবেশনে কংগ্রেসও

ঘোষণা করল 'মিত্রশক্তি'র সপক্ষে তার সহানুভূতি এবং সেইসঙ্গে স্বদেশের প্রতিরক্ষার যুদ্ধে অংশগ্রহণে তার সম্মতি—অবশ্য, যদি ব্রিটেন ঘোষণা করে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা।

বিস্ময়কর হল গান্ধীজীর ভূমিকা। বিশ্বযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে যখন যুদ্ধটি ছিল নির্ভেজাল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, তখন তিনি ছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে নিঃশর্ত সহযোগিতার প্রবক্তা ; তখন তিনি ভারতের আশু মুক্তিতেও আগ্রহী ছিলেন না, আগ্রহী ছিলেন ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের জয়লাভে। আর এখন বিশ্বযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন কেবল ব্রিটেন ও ফ্রান্সই নয়, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনও বিপন্ন, তখন তিনি শর্ত-ছাড়া এক পা-ও নড়তে অসম্মত ; কেবল তা-ই নয়, দেশ-জোড়া এক গণ-সংগ্রামের ঝুঁকি নিতেও তিনি অঙ্গীকৃত। ৮ আগস্টের সেই অঙ্গীকারের সুযোগ নিয়ে একদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ৯ আগস্ট ভোরে কারারুদ্ধ করলেন তাঁকে ও অন্যান্য নেতাকে এবং সেই সঙ্গে সারা দেশ জুড়ে হাজার হাজার উপনেতা ও কর্মীকে, আর অন্যদিকে বাম-জাতীয়তাবাদীরা গোটা দেশে ছড়িয়ে দিল 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'র বিস্ফোরক আওয়াজ আর প্রতিরক্ষা-বিপর্যয়ের বিধ্বংসী আগুন।...কিন্তু তাতে স্বাধীনতা এল না।

স্বাধীনতা এল ১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট। যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই বিশ্ব-জোড়া সমাজতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তির অনুকূল পরিবেশে কমিউনিস্ট পার্টি'র উদ্যোগ ও তার সহযোদ্ধা শক্তিগুলির সহযোগে শুরু হল আসামুদ্রহিমাচল শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের, ছাত্র-যুবা-মহিলার উত্থান, অদম্য আবেগে এগিয়ে তা চলল এক অখণ্ড অভ্যুত্থানের আমোঘ পরিণতির দিকে। কোথাও কোথাও তা ইতিমধ্যেই সশস্ত্র, কোথাও কোথাও সশস্ত্র সজ্জার প্রস্তুতি। কে রোধিবে এই জলতরঙ্গ? মিলিটারি? সৈন্যবাহিনীর এক অংশ রূপান্তরিত আজাদ হিন্দ ফৌজে, বাকি অংশ ক্যান্টনমেন্টে ক্যান্টনমেন্ট বিক্ষুব্ধ ; নৌবাহিনী বন্দরে বন্দরে বিদ্রোহী ; বিমানবাহিনী অবাধ্য ; শ্রমিক ও সৈনিক মৈত্রীবদ্ধ। ...শংকিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ—যায় বুঝি শাসন এবং শোষণ দুই-ই! শংকিত কংগ্রেস-নেতৃত্ব তথা গান্ধীজীও—যায় বুঝি তাঁর সাধের 'রামরাজ্যবাদ'ও! আপস হল দুয়ের মধ্যে—ভারত পেল শাসনের স্বাধীনতা, ব্রিটেন পেল শোষণের ছাড়পত্র। আবেগ-বিহ্বল জনগণ কোটি হাত তুলে অভিবাদন জানালো গান্ধীজীকে, 'বুঝিলাম, না-ই বুঝিলাম, হোক তব জয়!'

গান্ধীজী বলেছিলেন, "আমার জীবনই আমার বাণী।" এবং কথাটি বর্ণে বর্ণে সত্য। আপাতদৃষ্টিতে তাঁর জীবনেও যেমন প্রকাশ পায় অনেক স্ববিরোধ, তাঁর বাণীতেও তেমন প্রকট হয় অনেক স্ববিরোধ। কিন্তু একটু গভীরতর দৃষ্টিতে প্রমাণ হবে যে এইসব স্ববিরোধের অন্তরালে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কাজ করে গিয়েছে এক নির্বিরোধ শ্রেণী-দর্শন। সে দর্শন বুর্জোয়া শ্রেণীর দর্শন, সঠিকভাবে বললে বিশ্ব-ধনতন্ত্রের সার্বিক সংকটের যুগে পরাধীন দেশের উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণীর দর্শন। সেই দর্শনের মূর্তরূপই হল তাঁর রাজনৈতিক জীবনচর্যা।

কথাটা একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণকে, সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীর হাত থেকে ধনতান্ত্রিক শ্রেণীর হাতে ক্ষমতার স্থানান্তরকে মার্কসীয় পরিভাষায় বলা হয় 'বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব'। অতীতের সামন্ত-শাসিত কৃষিপ্রধান দেশে উদীয়মান বুর্জোয়া বা ধনিক শ্রেণীই এই বিপ্লব পরিচালনা করত কৃষক সমাজের সাহায্যে। সামন্ত-তান্ত্রিক তথা জমিদার-জোতদারি ব্যবস্থা ধ্বংস করতে পারলে নতুন নতুন কারখানার জন্য পাওয়া যাবে জমি থেকে মুক্ত প্রচুরসংখ্যক মজুর, প্রচুর পরিমাণ কাঁচামাল, এবং দেশজোড়া অবারিত বাজার। তাই কৃষকদের মধ্যে জমি বিলি এবং, জমির অভাবে, কারখানায় কর্মসংস্থান, আর সেই সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকৃতির প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধনিক শ্রেণী তাদের টেনে আনত সামন্ততন্ত্রের অবসান তথা ধনতন্ত্রের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে, এক কথায় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সংগ্রামে। এই সংগ্রামের সাফল্যে একদিকে যেমন কৃষকেরা পেত জমি বা কাজ ও রাজনৈতিক অধিকার, অন্যদিকে তেমন ধনিক শ্রেণী পেত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একচ্ছত্র আধিপত্য। শ্রমিকেরা তখন ছিল মুষ্টিমেয় ও অসংগঠিত—এবং সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম ছিল দূর ভবিষ্যতের গর্ভে। তাই ধনিক শ্রেণী ছিল নিঃশংক ও নিশ্চিন্ত এবং জমিদার শ্রেণীর পতনে তার নিরংকুশ প্রতিষ্ঠা ও প্রাধান্য ছিল নিশ্চিত ও নিরাপদ।

কিন্তু আজ আর সে দিন নেই বর্তমানে ধনতন্ত্র তার সংকোচনের যুগে—নোতুন নোতুন কারখানা গড়ে বাড়তি কৃষকদের কর্মসংস্থানের ক্ষমতা তার নেই; আর নেই বাজারের নিশ্চয়তা। তার উপরে শ্রমিক শ্রেণী আজ সংখ্যাবহুল ও সংগঠিত এবং ধনতন্ত্রের পতন ঘটিয়ে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটাতে সংকল্পবদ্ধ ও সংগ্রামরত। এই অবস্থায় সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সফল করার সংগ্রামে কৃষকদের আহ্বান জানালে, সেই সংগ্রাম আর সেখানেই থেমে থাকবে না। বেকার ও বিক্ষুব্ধ কৃষকেরা যোগ দেবে শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে, তার নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে ঠেলে নিয়ে যাবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে। তাতে বিপদ ঘটবে কেবল জমিদার শ্রেণীর নয়, ধনিক শ্রেণীরও। তাই ধনিক শ্রেণী আজ তার সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ সাধনে, তথা গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পাদনে, উদ্যোগ নেয় না, বরং তার সঙ্গে আপসে শোষণ ও শাসন ক্ষমতার অধিকার পেতে সক্রিয় হয়। ধনিক শ্রেণী হয় বড় তরফের শরিক, জমিদার শ্রেণী ছোট তরফের। আর উভয়ে সম্মিলিত হয় শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে। একই কারণে পরাধীন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনেও ধনিক শ্রেণী সচেষ্ট থাকে সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণীকে দূরে সরিয়ে রাখতে, পাছে সেই শ্রেণী দখল করে নেয় তার নেতৃত্ব।

বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতা হিসেবে গান্ধীজী আবির্ভূত ও অভিষিক্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত কংগ্রেস-সংগঠন প্রধানতঃ উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষিত ও কংগ্রেস-নেতৃত্ব প্রধানতঃ বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের করতলগত থাকলেও, কখনো সচেতন ও সুচতুর ভাবে এ চেষ্টা করা হয়নি যে, বাকি শ্রেণীগুলিকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেওয়া হবে না। গান্ধীজী নেতৃত্ব গ্রহণের আগে কংগ্রেসের সরকারি নেতৃত্ব সংস্কারবাদী, শান্তিপূর্ণ ও অহিংসা-

পন্থী আন্দোলনের সপক্ষে থাকলেও, কখনো বিপ্লবী, অশান্তিপূর্ণ ও হিংসাপন্থী আন্দোলনের বিরোধিতা করেননি। গান্ধীজী বলগা হাতে নেবার আগে কংগ্রেস-নেতৃত্ব শ্রমিক শ্রেণীকে রাজনৈতিক সংগ্রামে সামিল হবার আহ্বান না জানালেও, কখনো তাদের সংগ্রাম থেকে নীতি হিসেবে দূরে রাখবার চেষ্টা হয়নি। গান্ধীজীর নেতৃত্বেই শুরু হয় কংগ্রেস-নেতৃত্বকে বুর্জোয়া শ্রেণীর মুষ্টিগত করে রাখবার পর্যায়ক্রমিক পরিকল্পনা, বিপ্লববাদী অশান্তিপূর্ণ সহিংস তথা বামপন্থী আন্দোলনকে কংগ্রেসের সরকারি আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখাবার প্রবণতা এবং শ্রমিক শ্রেণীকে ও সেই সংগে সংগঠিত কৃষকদের রাজনৈতিক সংগ্রাম থেকে দূরে রাখবার প্রচেষ্টা।

অসহযোগ আন্দোলনে তিনি আহ্বান করেছিলেন আইন-সভার সদস্যদের, আদালতের আইনজীবীদের এবং সরকারি স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। শ্রমিকদের কাছে কোনো আহ্বান তো ছিলই না, এমনকি কৃষকদের কাছেও না। আইন অমান্য আন্দোলনে তিনি উল্লিখিত অংশগুলি ছাড়াও ডাক দিয়েছিলেন সরকারি কর্মচারীদের এবং সেই সংগে সাধারণভাবে গ্রামবাসীদের। লক্ষণীয় যে শ্রমিক ধর্মঘট বা কৃষকদের জমির দাবিতে আন্দোলন বা খাজনা-বন্ধ আন্দোলন তাঁর কোনো আন্দোলনের কর্মসূচীতেই স্থান পায়নি। এই প্রসঙ্গে আরো উল্লেখযোগ্য যে, নিজেকে অহিংসার একমাত্র সেবক বলে পরিচয় দিলেও, চৌরিচোরার কৃষকদের হিংসার অজুহাতে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেও, হিংসায় বিশ্বাসী বলে লেনিনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশে আপত্তি জানালেও, ভগৎ সিং-এর প্রাণদণ্ড রদ করবার জন্য বড়লাটকে অনুরোধ জানাতে অস্বীকার করলেও, কংগ্রেসের অভ্যন্তরে হিংসার প্রাবল্য লক্ষ্য করে কংগ্রেসের সদস্যপদ পরিত্যাগ করলেও, তিনি নিজে কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজের পক্ষে সৈন্যসংগ্রহের দায়িত্ব নিয়েছিলেন, আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে পাঠানদের উপরে গুলি চালাতে অস্বীকার করায় গাড়োয়ালি সৈন্যদের নিন্দা করেছিলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে নিঃশর্তে সহযোগিতার জন্য কংগ্রেসকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, এমনকি ১৯৩৭-৩৯ সালে বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস সরকার কর্তৃক জনগণের উপর লাঠি ও গুলিচালনার ঘটনাকেও সরকার পরিচালনার অপরিহার্য কর্তব্য বলে সমর্থন করেছিলেন। আসলে জনগণের বিরুদ্ধে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বা স্বদেশী পুঁজিবাদের হিংসায় তিনি বিচলিত হতেন না, বিচলিত হতেন যদি বিপরীতটা ঘটত।

১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলন তিনি প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন চৌরিচোরায় হিংসার অজুহাতে। কিন্তু প্রত্যাহারের কারণ কি সত্যিই তাই অথবা সবটাই তাই? তা-ই যদি হত, তাহলে প্রত্যাহার-সংক্রান্ত প্রস্তাবটির সাতটি অনুচ্ছেদের মধ্যে একটি মাত্র অতিক্ষুদ্র অনুচ্ছেদে একটিমাত্র বাক্যেই চৌরিচোরা সম্পর্কে বক্তব্য শেষ হয়ে গেল কেন? এবং অন্যদিকে, খাজনা বন্ধ ও ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনের বিরোধিতা করে, জমিদার ও সরকারকে খাজনা ও ট্যাক্স দেবার জন্য কৃষকদের নির্দেশ দিয়ে এবং খাজনা ও ট্যাক্স দেবার

ঔচিত্য সম্পর্কে কৃষকদের মধ্যে প্রচার করবার জন্য কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের উপরে নির্দেশ জারি করে বড় বড় তিনটি অনুচ্ছেদ যোজনা করা হল কেন? খাজনা ও ট্যাক্স দেওয়া যারা বন্ধ করেছিল, তারা তো কোনো হিংসাত্মক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল না; তারা ছিল সম্পূর্ণ অহিংস। আসলে ব্যাপারটা হিংসা-অহিংসার নয়; ব্যাপারটা শ্রেণীস্বার্থের। ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থ ছিল সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসে চলা; সংগ্রামও জয়ের জন্য নয়, আপসেরই জন্য—তবে কিছুটা বেশি সুবিধাজনক শর্তে।

১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনেও দেখি ১৯২১ সালেরই পুনরাবৃত্তি। হিংসার প্রাবল্যে নয়, চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার দখল ও স্বাধীনতা ঘোষণা, কোলাপুরে শ্রমিক অভ্যুত্থান ও শ্রমিকরাজ ঘোষণা, বোম্বাইতে প্যারি কমিউনের মহড়া, পেশোয়ারে সৈনিক বিদ্রোহ, দেশজুড়ে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের, যুব-ছাত্র-মহিলার অভ্যুত্থানে সন্ত্রস্ত গান্ধীজীর পশ্চাদসরণ। শ্রমিক কৃষকের জঙ্গী সংগ্রামে স্বাধীনতা লাভ? তেমন স্বাধীনতা ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণী ও তার ছোট তরফের শরিক জমিদার শ্রেণীর কাছে অবাঞ্ছনীয়। তাই তো অবাঞ্ছনীয় গান্ধীজীরও কাছে।

সহিংস আন্দোলনের প্রতি বিরাগ থাকলেও, সেই আন্দোলনকে দরকষাকষির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে বিতৃষ্ণা ছিল না গান্ধীজীর। তাই ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত দু-বছরজুড়ে কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য সহযোগী শক্তির নেতৃত্বে খণ্ড খণ্ড সংগ্রাম যখন অখণ্ড সশস্ত্র সংগ্রামে রূপ নেবার মুখে, তখন একদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আর অন্যদিকে গান্ধীজী উভয়েই উভয়ের সন্ত্রস্ত মনোভাবের সুযোগ নিয়ে দরকষাকষির মাধ্যমে লেনা-দেনার কাজ-কারবার মিটিয়ে ফেললেন। বলা বাহুল্য, বিশ্বের রাজনীতিতে যদি ফ্যাসিবাদের পরাজয় ও সাম্রাজ্যবাদের শক্তিক্ষয় না হত, যদি সমাজতন্ত্রের বিজয় ও জাতীয় মুক্তির বিস্তার না হত, তা হলে এই দরকষাকষির মাধ্যমে কংগ্রেস যা পেল, তা স্বাধীনতার কায়া না হয়ে ছায়াই হত। বিশ্বের শক্তি-সংস্থানে এই গুণগত পরিবর্তন সংঘটনে গান্ধীজীর কোনো ভূমিকাই ছিল না, বা থাকলেও তা ছিল এই পরিবর্তনের পরিপন্থী, কেননা যুদ্ধে শেষ পর্যন্তও তিনি ছিলেন সোভিয়েত পক্ষের সঙ্গে কার্যতঃ অসহযোগী!

আমাদের দেশে এবং অন্যত্রও মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের একাংশের মধ্যে সাম্প্রতিককালে এক প্রবণতা দেখা দিয়েছে গান্ধীজী এবং লেনিনের মধ্যে সমীকরণের। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ তো এতদূর পর্যন্ত গিয়েছেন যে তাঁর গান্ধীজীর সবরমতি সত্যাগ্রহ আশ্রমকে লেনিনের স্মলনিস্থিত নেপথ্য বিপ্লব-কেন্দ্রের সঙ্গে এক করে দিয়েছেন। এঁরা ভুলে যান যে গান্ধীজী ও লেনিন দুজনেই ধনতন্ত্রের সংকটের যুগের নেতা হলেও যেখানে লেনিন ছিলেন শ্রমিকশ্রেণীর নেতা, সেখানে গান্ধীজী ছিলেন বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতা; যেখানে লেনিনের পরিচালনায় শ্রমিকশ্রেণী কেবল গণতান্ত্রিক বিপ্লবই সম্পূর্ণ করেনি, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেরও উদ্বোধন করেছিল, সেখানে গান্ধীজীর পরিচালনায় বুর্জোয়াশ্রেণী স্বাধীনতা

আন্দোলনকে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে, সেই সংগ্রামকে কেবল অসম্পূর্ণই রাখেনি, যাতে ভবিষ্যতেও অসম্পূর্ণ থাকে, শ্রমিকশ্রেণীকে স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে সরিয়ে রেখে তারও ব্যবস্থা নিয়েছিল; যেখানে লেনিনের পথ ছিল বৈপ্লবিক ও আপসহীন, প্রধান শক্তি ছিল শ্রমিকশ্রেণী, সেখানে গান্ধীজীর পথ ছিল সংস্কারসর্বস্ব ও আপসমূলক, প্রধান শক্তি ছিল পেটি-বুর্জোয়া সম্প্রদায়। এক কথায়, লেনিন হলেন ধনতন্ত্রের সংকটের যুগে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথিকৃৎ, অন্যদিকে গান্ধী হলেন ধনতন্ত্রের সংকটের যুগের গণতান্ত্রিক বিপ্লব পরিহার করে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলনের পথপ্রদর্শক।

সুতরাং গান্ধীজীর রাজনৈতিক জীবনী হল গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিনিময়ে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব-দানের কাহিনী; তাঁর বাণী হল গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পরিহারের বাণী—'রামরাজ্য' প্রতিষ্ঠার বাণী, সেখানে মালিকও থাকবে, শ্রমিকও থাকবে; সেখানে জমিদারও থাকবে কৃষক-প্রজাও থাকবে; মালিক ও জমিদাররা এমন আচরণ করবে যেন তাদের সম্পত্তি তাদের নয়, তারা জনগণের ন্যাস-রক্ষক মাত্র আর অন্যদিকে শ্রমিক-কৃষকরা এমন আচরণ করবে যা গান্ধীজী প্রতিষ্ঠিত 'মজদুর মহাজন'-এর সদস্যদের জন্য বিহিত। ...যাই হোক, গান্ধীজীর এই অপূর্ণ অভিপ্রায় পূর্ণ হবার নয়, অসমাপ্ত কর্মকাণ্ডও সমাপ্ত হবার নয়, এমনকি সমাপ্তি-যোগ্যও নয়। সমাজ অগ্রসর হয় এবং অগ্রসর হবেই—গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সোপান বেয়ে সমাজতান্ত্রিক উত্তরণের অপ্রতিরোধ্য পথে।

তলস্তয় সম্পর্কে লেনিন বলেছিলেন, 'তিনি রুশ বিপ্লবের দর্পণ'। গান্ধীজী সম্পর্কেও আমরা বলতে পারি, তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দর্পণ—যে দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়েছে সেই আন্দোলন ও বিপ্লবের সফলতা ও দুর্বলতা, পূর্ণতা ও অপূর্ণতা, সার্থকতা ও ব্যর্থতা। না, গান্ধীজী কেবল দর্পণই নন, তিনি দিশারীও। যা কিছু তাঁর জীবনদর্পণে প্রতিবিম্বিত, তা তাঁরই প্রযোজিত ও প্রদর্শিত। তাই গান্ধীজী স্মরণীয় হলেও অনুসরণীয় নন, কেননা তাঁর স্বপ্নের "রামরাজ্য" বাস্তব নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। এমনকি তাঁর হিন্দু-মুসলমান ঐক্য তথা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আদর্শ এবং সমাজ-সংস্কার তথা অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের আদর্শও পরম বাঞ্ছনীয় হলেও তাঁর প্রদর্শিত পথে তা সাধনীয় নয়। তাই স্বীয় আদর্শের প্রতি আত্মোৎসর্গিত, প্রথম সর্ব ভারতীয় নেতা হিসাবে সর্বত্র স্বীকৃত, এই মহাপুরুষের স্মৃতিতে অভিবাদন জ্ঞাপন করেও আমাদের অনুসরণ করতে হবে ভিন্নতর পথ।

১/১০/৮০

স্বাধীনতা আন্দোলনে কমিউনিস্টদের ভূমিকা

ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনে এ দেশের কমিউনিস্টদের ভূমিকা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অভিযোগ তোলা হয়। যে কোনো আন্দোলন সম্পর্কেই মত ও পথ নিয়ে শরিকদের মধ্যে পার্থক্য হতে পারে—এবং বাস্তবে হয়েও থাকে, বিশেষ করে যখন শরিকেরা প্রতিনিধিত্ব করে বিভিন্ন শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গির। স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রেও যে তা হবে, সেটা স্বাভাবিক। অ-কমিউনিস্ট এবং কমিউনিস্টদের মধ্যে এই পার্থক্য তো অবশ্যম্ভাবী, কেননা বাকিরা যখন প্রতিনিধিত্ব করে বাকি বিভিন্ন শ্রেণী ও উপশ্রেণীর, তখন কমিউনিস্টরা প্রতিনিধিত্ব করে মূলতঃ শ্রমিক শ্রেণীর। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অভিযোগগুলি নিছক শ্রেণীগত দৃষ্টির পার্থক্য-জনিত নয়, তার চেয়ে কিছু বেশি এবং অত্যন্ত গুরুতর। অভিযোগ করা হয়ঃ ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস নাকি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস। ১৯২১ সালে কমিউনিস্টরা নাকি বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে 'অসহযোগ আন্দোলনে' যোগ না দিয়ে; ১৯৪২ সালে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে 'ভারত ছাড়ো' সংগ্রামের বিরোধিতা করে এবং ১৯৪৭ সালে 'এই আজাদী ঝুটা হায়' স্লোগান তুলে। কমিউনিস্ট আন্দোলনের একজন অংশগ্রহণকারী হিসাবে আমি মনে করি, এই অভিযোগগুলির জবাব দেওয়া দরকার। তাই এই লেখা।

ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে কমিউনিস্ট পার্টি আত্মপ্রকাশ করে ১৯২১ সালে—কংগ্রেসেরই অভ্যন্তরে একটি স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে। মুখে তার 'পূর্ণ স্বাধীনতা'র রণধ্বনি, হাতে তার পূর্ণ স্বাধীনতার রণনীতি—'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের কাছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'র ম্যানিফেস্টো'। ঐ বছরেই আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের ছত্রিশতম সম্মেলনে নবজাত কমিউনিস্ট পার্টি'র অন্যতম মুখপাত্র মৌলানা হযরত মোহানী উত্থাপন করেন 'পূর্ণ' স্বাধীনতা'র সোচ্চার দাবি। সেইসঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি'র সদস্যরা উপস্থিত প্রতিনিধিদের মধ্যে বিলি করতে থাকেন তাঁদের রণনীতিমূলক দলিল—উপরিউক্ত 'ম্যানিফেস্টো'।...... প্রতিনিধিরা বিস্মিত, বিমূঢ়; গান্ধীজী বিচলিত, বিক্ষুব্ধ।

জবাব দিতে দাঁড়িয়ে গান্ধীজী সরোষে প্রত্যাখ্যান করলেন কমিউনিস্ট পার্টি'র সেই পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি; সজোরে আঁকড়ে রইলেন 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস'-এর লক্ষ্য। কেবল তা-ই নয়, শ্রমিক ও কৃষকদের শ্রেণীগত দাবিগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে, অমূর্ত অভীষ্টকে বিমূর্ত রূপ দিয়ে, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে অবিচল সংগ্রামের যে-দাবি ঐ ম্যানিফেস্টোতে উত্থাপন করা হয়েছিল, তা-ও প্রত্যাখ্যান করলেন তিনি 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' দাবি বলে। এই পটভূমিকায় এল তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বান। দেশের মানুষ সাড়া দিল অভূতপূর্ব আবেগে ও ব্যাপকতায়। নেমে এল

সাম্রাজ্যবাদের বেপরোয়া আঘাত—কারারুদ্ধ হল অসংখ্য, আহত হল হাজার হাজার, নিহত হল শত শত। কিন্তু আন্দোলনে সঞ্চারিত হল আরো আবেগ, সংযুক্ত হল আরো ব্যাপকতা। কেঁপে উঠল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ; প্রমাদ গুনলো ইংরেজ রাজপুরুষেরা।…… এই সময়ে চৌরিচোরায় আক্রান্ত কৃষকদের পাল্‌টা হিংসাত্মক আক্রমণের অজুহাতে অহিংসার পূজারী গান্ধীজী প্রত্যাহার করে নিলেন সমগ্র আন্দোলন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ; বিক্ষুব্ধ হল দেশের মানুষ ; বিমূঢ় বিস্ময়ে নীরব রইলেন কংগ্রেসের অন্যান্য নেতারা। আন্দোলনে আহ্বান দেবার মতো 'হিমালয়-প্রমাণ' ভুল করবার জন্য প্রকাশ্যে মার্জনা চাইলেন গান্ধীজী !

কমিউনিস্ট-বিরোধীদের সবিনয়ে প্রশ্ন করি, এর মধ্যে কোথায় তাঁরা দেখতে পেলেন কমিউনিস্ট পার্টির বিশ্বাসঘাতকতা ? স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে নিশ্চয়ই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ একটার পর একটা ষড়যন্ত্র মামলায় নবজাত কমিউনিস্ট পার্টিকে অঙ্কুরেই বিনাশ করবার চক্রান্ত করেনি : ১৯২১ সালে তাসখন্দ ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯২২ সালে পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯২৪ সালে কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯২৯ সালে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা।

তার পরে আসে 'ভারত ছাড়ো' সংগ্রাম ও কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা সম্পর্কে অভিযোগ।

৯ আগস্ট, ১৯৪২। শুরু হল 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন। কিন্তু কার ডাকে ? কি ঘটেছিল তার আগে ? কি ঘটেছিল তার পরে এবং কে করেছিল বিশ্বাসঘাতকতা ?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায় তখন শুরু হয়ে গিয়েছে। একদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, আমেরিকা ও ব্রিটেন—যাদের বলা হত 'মিত্রশক্তি' আর অন্যদিকে জার্মানি, ইতালি ও জাপান—যাদের বলা হত 'অক্ষশক্তি'। পশ্চিম ইউরোপে একটির পর একটি দেশকে কুক্ষিগত করে ফ্যাসিস্ট জার্মানি ঝাঁপিয়ে পড়েছে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের উপরে আর অন্য দিকে পূর্ব এশিয়ার একটির পরে একটি দেশ গ্রাস করে ফ্যাসিস্ট জাপান ঝাঁপিয়ে পড়েছে চীন ও বার্মার উপরে। সোভিয়েত ইউনিয়ন পর্যন্ত অধিকার করে নিয়ে হিটলার-বাহিনী এসে দাঁড়াবে ইরানের সীমানায় আর এদিক থেকে তোজোর জাপান ভারতের বুকে তার দখল কায়েম করে নিয়ে এগিয়ে যাবে ইরানের মাটিতে। ইরান হবে জার্মান সাম্রাজ্য আর জাপান সাম্রাজ্যের সীমান্ত, সেখানে করমর্দন করবে বিজয়ী হিটলার আর বিজয়ী তোজো !

এই যখন পরিস্থিতি তখন ১৯৪১-এর ডিসেম্বর মাসে জওহরলাল ঘোষণা করলেন, "রাশিয়া, ব্রিটেন, আমেরিকা ও চীন যে-জোটের প্রতিনিধি, বিশ্বের প্রগতিশীল শক্তিসমূহ আজ সেই জোটেরই পক্ষভুক্ত।" ১৯৪২ সালের জানুয়ারি মাসে কংগ্রেস-নেতৃত্ব ঘোষণা করলেন, "যদিও ভারত সম্পর্কে ব্রিটেনের নীতির কোনো পরিবর্তন ঘটেনি, তবু যুদ্ধজনিত ঘটনাবলীর দরুন যে নতুন বিশ্ব-পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, ওয়ার্কিং কমিটি তা বিবেচনা

না করে পারে না। যেসব দেশ আজ আগ্রাসনের শিকার হয়ে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে, কংগ্রেসের সহানুভূতি অবশ্যই তাদের প্রতি। কিন্তু কেবল এক মুক্ত ও স্বাধীন ভারতই পারে জাতীয় ভিত্তিতে দেশের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব বহন করতে।" এই ভাবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কংগ্রেস নেতৃত্ব জানিয়েছিলেন যে তাঁরা মিত্রশক্তিরই পক্ষে; তাঁরা চান জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে; সুতরাং ব্রিটেন যদি ভারতের স্বাধীনতার দাবি মেনে নেয়, তাহলে ভারত মিত্রশক্তির সঙ্গে একযোগে যুদ্ধ করবে।

সোভিয়েত তো আছেই, এমনকি আমেরিকা, চীন এবং সেইসঙ্গে অস্ট্রেলিয়াও চাপ সৃষ্টি করল ব্রিটেনের উপরে যাতে কংগ্রেসের দাবি মেনে নিয়ে ভারতের সক্রিয় সহযোগিতা নিশ্চিত করা হয়। পাঠানো হল ক্রিপস্ মিশন কংগ্রেস-নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে একটি সমাধানে উপনীত হতে। আলোচনা হল কিন্তু সমাধান হল না; কংগ্রেস-নেতৃত্বের ব্যগ্রতার সুযোগ নিয়ে ক্রিপস্ একে একে তাঁর কথা গিলতে লাগলেন; ক্রিপস্ মিশন ব্যর্থ হল। আশাভঙ্গে ক্ষুব্ধ-ক্রুদ্ধ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ৮ আগস্টের সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে প্রস্তাব গ্রহণ করল, "ভারতের নিজের স্বার্থে এবং মিত্রশক্তির আদর্শের স্বার্থে অবিলম্বে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানো জরুরি প্রয়োজন। স্বাধীনতা ঘোষণার পরে ভারতে একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করা হবে এবং স্বাধীন ভারত মিত্র হিসেবে যুদ্ধ প্রয়াস ও স্বাধীনতা সংগ্রামের দায়দায়িত্বের শরিক হবে।…চীন কিংবা রাশিয়ার প্রতিরক্ষা কোনোক্রমে ব্যাহত হয় ভারত এমন কিছু করবে না, কেননা তাদের স্বাধীনতা মহামূল্য এবং তা রক্ষা করতেই হবে। মিত্রশক্তির প্রতিরক্ষা-ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হয়, এমন কিছুও ভারত করবে না।"…সেই প্রস্তাবের উপসংহারে ঘোষণা করা হয়, অবিলম্বে যদি ভারতের দাবি না মানা হয়, তাহলে মুক্তি ও স্বাধীনতার উপরে অনুচ্ছেদ্য অধিকারের সংকল্পে ব্যাপকতম ভিত্তিতে এমন এক গণ-সংগ্রাম শুরু করা হবে, যাতে প্রযুক্ত হতে পারে গত বাইশ বছর ধরে শান্তিপূর্ণ সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত তাবৎ অহিংস শক্তি। এবং সেই সংগ্রাম শুরু ও পরিচালনা করার সর্বময় দায়িত্ব দেওয়া হয় গান্ধীজীকে।

এই প্রস্তাব গ্রহণের অব্যবহিত পরে গান্ধীজী জেনারালিসিমো চিয়াংকাইশেককে একখানা চিঠি লিখতে বসেন; তিনি লেখেন, "আমি তাড়াহুড়ো করে কোনো পদক্ষেপ নেব না। যখন পদক্ষেপ নেব, তখন নিশ্চয়ই দেখব যাতে চীনের কোনো ক্ষতি না হয় এবং ভারতে বা চীনে জাপানী আগ্রাসন কোনো উৎসাহ না পায়। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংঘাত পরিহার করতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করছি।" কিন্তু এই চিঠি শেষ করবার আগেই তিনি এবং অন্যান্য নেতারা সবিস্ময়ে দেখলেন ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা তাঁদের গ্রেফতার করার জন্য দুয়োরে উপস্থিত। আচমকা আক্রমণে সেদিন রাতে গ্রেফতার হলেন তাঁরা এবং তাঁদের সঙ্গে সমগ্র দেশের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন স্তরের হাজার হাজার নেতা, উপনেতা ও কর্মী। পরদিন ৯ আগষ্ট সকালে নেতাদের গ্রেফতারের খবর ছড়িয়ে পড়ল বাতাসেরও আগে, আর দেশজুড়ে জ্বলে উঠলো স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভের আগুন। সেই আগুনে পুড়তে লাগলো সেতু-ষ্টেশন, অফিস কাছারি, ডাকঘর, থানা এবং আরো

অনেক কিছু। আকাশ-ভাঙা আওয়াজ উঠলো, "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, ভারত ছাড়ো!"

এই হল ৯ আগষ্টের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সূচনা। কে দিয়েছিলেন এই ডাক? গান্ধীজী? কংগ্রেস-নেতৃত্ব? নিশ্চয়ই না। অন্ধ্রপ্রদেশ কংগ্রেসের এই ইস্তাহারই তার প্রমাণ: "মহাত্মা সিদ্ধান্ত নেবার আগে কোনো আন্দোলন শুরু করা ঠিক হবে না। তিনি তো অন্য কোনো সিদ্ধান্তও নিতে পারেন, সেক্ষেত্রে আপনারা এক বড় রকমের ভুলের দায়ে দায়ী হবেন। প্রস্তুত থাকুন, সংগঠিত থাকুন, সতর্ক থাকুন কিন্তু কোনো কাজ করে ফেলবেন না।" পরবর্তীকালে জওহরলাল নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেল এবং গোবিন্দবল্লভ পন্থের স্বাক্ষরিত যে বিবৃতিটি কংগ্রেস-নেতৃত্বের তরফ থেকে প্রকাশিত হয়, তাতে ঘোষণা করা হয়, "গান্ধীজী বা সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির দ্বারা সরকারিভাবে কোনো আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়নি।" গান্ধীজী নিজেই বড়লাটের কাছে লেখা তাঁর ২৩রা সেপ্টেম্বরের পত্রে এই ধ্বংসাত্মক আন্দোলনের সমস্ত দায়িত্ব অস্বীকার করেছিলেন। (এই পত্রটি অবশ্য ব্রিটিশ সরকার প্রায় ছয় মাস কাল চেপে রেখেছিল।) প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, পূর্ব রণাঙ্গনে যুদ্ধ চলাকালে, এমনকি ৯ আগষ্টের আন্দোলনের মধ্যেও, গান্ধীজীর নির্দেশে 'গান্ধী গ্রামোদ্যোগ ও খাদি প্রতিষ্ঠান' ব্রিটিশ বাহিনীকে কম্বল সরবরাহের ঠিকা নিয়েছিল এবং হাজার হাজার কম্বল সরবরাহ করে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করেছিল।

বলা বাহুল্য যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ৮ আগষ্টের প্রস্তাব সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টি ছিল ভিন্নমত। তাদের মতে ঐ প্রস্তাবটি স্ববিরোধী; প্রথম অনুচ্ছেদগুলির সঙ্গে শেষ অনুচ্ছেদ দুটি সামঞ্জস্যহীন। কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য ছিল এই রকম: সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হবার পরে 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ' পরিণত হয়েছে 'জনযুদ্ধে'। সমাজতন্ত্রের একমাত্র দেশ ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অবিচল প্রবক্তা যে-সোভিয়েত ইউনিয়ন, সে যদি পরাজিত হয় এই যুদ্ধে, তাহলে গোটা দুনিয়া হবে ফ্যাসিবাদের পদানত আর সেক্ষেত্রে ভারতসহ মুক্তিকামী সমস্ত দেশেরই স্বাধীনতা হবে সুদীর্ঘকালের জন্য সুদূরপরাহত। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি বিজয়ী হয়, তাহলে কেবল নতুন ফ্যাসিবাদই বিধ্বস্ত হবে না, মারাত্মকভাবে আহত হবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সমেত পুরনো সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। সোভিয়েত ইউনিয়নের জয়লাভের প্রক্রিয়ায় ও পরিণতিতে উদ্ভূত হবে যে-বিশ্ব-পরিস্থিতি, তা হবে স্বাধীনতা-সংগ্রামের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। সেই পরিস্থিতির সুযোগে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সাফল্য অবধারিত। দেশে দেশে জনগণের আশু কর্তব্য হচ্ছে সমাজতন্ত্রের স্বার্থে, স্বাধীনতার স্বার্থে সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা 'মিত্রশক্তি'র বিজয়ে এবং অন্যদিকে জার্মানি-জাপান তথা 'অক্ষশক্তি'র পরাজয়ে সর্বশক্তিতে আত্মনিয়োগ করা, কেননা সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম আজ সোভিয়েত ইউনিয়নের জয়লাভের সংগ্রামের সঙ্গে, ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের সঙ্গে, একসূত্রে গ্রথিত। তাই কমিউনিস্ট পার্টি চেয়েছিল, বিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যা-ই বলুক বা করুক না কেন, কংগ্রেস-নেতৃত্ব ফ্যাসিবাদ-বিরোধী তথা জাপ-বিরোধী যুদ্ধে দেশের জনগণকে নেতৃত্ব দিন, অন্যদিকে অনুকূল পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের

প্রস্তুতি চালান। জার্মান-বাহিনী যখন সোভিয়েত দেশের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছে, জাপ-বাহিনী যখন ভারতের সীমানায় পৌছে গিয়েছে, তখন 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন হবে আত্মঘাতী, যেমন গান্ধীজী নিজেই বলেছিলেন, "জাপান যদি জয়লাভ করে, তাহলে ব্রিটেন হারাবে কেবল ভারতকে কিন্তু ভারত হারাবে তার সব কিছু।" আর এই কারণেই কমিউনিস্টরা তখন বিরোধিতা করেছিলেন ৯ আগষ্টের আন্দোলনের। স্মরণীয় যে, এই সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মনীতিকে কার্যকরী করতে গিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ফাঁসীকাঠে প্রাণ দিতে হয় অন্ধ্রের চারজন কমিউনিস্টকে এবং বিভ্রান্ত জাতীয়তাবাদীদের হাতে নিহত হন সোমেন চন্দ, ফণী চক্রবর্তী এবং আরো অনেক কমিউনিস্ট।

কমিউনিস্ট পার্টির বিশ্ব-বিশ্লেষণ যে সঠিক ছিল, পরবর্তীকালের ইতিহাসই তার জীবন্ত সাক্ষ্য। সুতরাং বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে নিশ্চয়ই কখনো কমিউনিস্টদের অভিযুক্ত করা যায় না। ৯ আগষ্টের আন্দোলনের বিরোধিতা করে তারা কংগ্রেসের সদস্য হয়েও কংগ্রেসের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, এ অভিযোগ দাঁড়ায় না, কেননা গান্ধীজী বা কংগ্রেস-নেতৃত্ব সে অন্দোলনের ডাক দেননি। অথবা তারা স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল, এ অভিযোগও দাঁড়ায় না, কেননা তাঁদের মতে—এবং ইতিহাসের সাক্ষ্যমতে—বিশ্বের তৎকালীন পরিস্থিতিতে সে আন্দোলন কখনো স্বাধীনতা আনতে পারত না, এবং পারেওনি। সে অন্দোলন কার্যতঃ শেষ হয়ে ছিল ১৯৪৩ সালে, অনুষ্ঠানিকভাবে খারিজ বলে ঘোষিত হয়েছিল ১৯৪৪ সালে—আর স্বাধীনতা এল ১৯৪৭ অন্য এক দেশজোড়া সংগ্রামের আগ্নেয় পটভূমিকায়, যার পুরোভাগে ছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও তার সহযোগী শক্তিসমূহ। অতএব, বিশ্বাসঘাতকতা কার, কেন এবং কোথায় ?

তারপরের অভিযোগ ক্ষমতা-হস্তান্তর প্রসঙ্গে কমিউনিস্টদের শ্লোগান সম্পর্কে।

ঘণ্টা বাজলো মধ্যরাত্রে—১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট রাত বারোটায়। ঘণ্টা বাজলো দিন-বদলের। রাত বারোটা বেজে এক মিনিটে খণ্ডিত ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তরিত করল—ভারতের ক্ষমতা কংগ্রেস-নেতৃত্বের হাতে আর পাকিস্তানের ক্ষমতা লিগ-নেতৃত্বের হাতে। ঘণ্টা বাজলো, আলো জ্বললো, আকাশ বাতাস মুখরিত করে কোটি কণ্ঠে ধ্বনিত হল, 'স্বাধীন ভারত জিন্দাবাদ!'... কিন্তু তার প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যেতে না যেতেই উৎসবমত্ত মানুষের চমকিত কানে ভেসে এল ভিন্নতর কণ্ঠের এক শাণিত আওয়াজ: "ইয়ে আজাদী ঝুটা হায়! ভুলো ম্যৎ, ভুলো ম্যৎ!"—হ্যাঁ, আওয়াজ তুলেছিল কমিউনিস্ট পার্টি। কিন্তু কেন ?

এই 'কেন'-র উত্তর একাধিক। প্রথমতঃ এই যে, কমিউনিস্টদের মনে ছিল তখন লেনিন-স্তালিনের শিক্ষা। লেনিন শিখিয়েছিলেন, "সাম্রাজ্যবাদ কখনো স্বেচ্ছায় ক্ষমতা হস্তান্তরিত করে না ; যা সে হস্তান্তরিত করে, তা হচ্ছে ক্ষমতার ছায়া—ক্ষমতার সারাংশ

নয়।" স্তালিন শিখিয়েছিলেন, "একটি বিজয়ী বিপ্লবের মাধ্যমে ছাড়া সাম্রাজ্যবাদের জোয়াল থেকে উপনিবেশ ও পরবশ দেশগুলির মুক্তি অসম্ভব। স্বাধীনতা দান হিসেবে আসে না!" স্বভাবতই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এই সিদ্ধান্তে এসেছিল যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কংগ্রেস-লিগ নেতৃত্বের হাতে যা তুলে দিয়েছিল, তা ক্ষমতার ছায়ামাত্র; ক্ষমতার সারাংশ নয়; কেননা ক্ষমতা নিছক দান হিসেবে আসতে পারে না। অতএব, এই স্বাধীনতা সাচ্চা নয়, ঝুটা। আর কেবল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কেন, অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট পার্টিও উপনীত হয়েছিল ঐ একই সিদ্ধান্তে। যেমন, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে ঝুকভ বলেছিলেন, "ব্রিটেন বাধ্য হচ্ছে আমেরিকার বই থেকে একটি পাতা তুলে নিতে এবং ফিলিপাইনস-এ আমেরিকা যে কর্মনীতি অনুসরণ করেছে, ভারতে সেই কর্মনীতি অনুসরণ করতে—তাকে নামে-মাত্র তথা অলীক স্বাধীনতা দান করতে।" লেমিন (LEMIN) লিখেছিলেন, ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা থেকে যথার্থ স্বাধীনতা অনেক যোজন দূর।" আর কেবল দেশে দেশে কমিউনিস্ট পার্টিরাই বা কেন, অন্যান্য বামপন্থী পার্টিগুলির মতামত ছিল অনুরূপ, যে কথা 'রয়টার' জানিয়েছিল, "সমস্ত দেশেরই বামপন্থী সংবাদপত্রগুলিতে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছে।" দুনিয়া জুড়ে যে-বামপন্থীরা ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে সমর্থন ও সাহায্য করে এসেছেন, তাঁরা যখন এই ক্ষমতা-হস্তান্তরকে স্বাগত জানালেন না, তখন যদি ভারতের কমিউনিস্টরাও তাকে বরণ করে নিতে অস্বীকার করে, তখন আর যাই হোক তাদের বিশ্বাসঘাতক বলা যায় না।

উপরি-উক্ত 'কেন'র উত্তর দ্বিতীয়তঃ এই। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির চোখের সামনে তখন ভেসে উঠছিল ক্ষমতা-হস্তান্তরের নাটকীয় দৃশ্যটির অবিস্মরণীয় পশ্চাদ্‌পট। একদিকে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্ব মিত্রশক্তির বিজয়, অন্যদিকে ফ্যাসিবাদী জার্মানির নেতৃত্বে অক্ষশক্তির পরাজয়; একদিকে ফ্যাসিবাদের উদ্ধত প্রতীক রাইখ্‌স্ট্যাগের উদ্যত শীর্ষে বিজয়ী সমাজতন্ত্রের রক্তপতাকার আত্মঘোষণা এবং পূর্ব ইউরোপের দেশে দেশে সমাজতন্ত্রের বিস্তার, রক্তপতাকার সমারোহ; অন্যদিকে, ফ্যাসিবাদ তথা নাৎসীবাদের নিশান ধূলায় লুণ্ঠিত এবং সাম্রাজ্যবাদের জীর্ণধ্বজা শতচ্ছিন্ন, ম্রিয়মাণ; দেশে দেশে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের বিজয়ী আত্মপ্রতিষ্ঠা ও অপ্রতিরোধ্য অগ্রগতি। কেবল ফ্যাসিবাদের দেশ জার্মানি ইতালি ও জাপানই বিধ্বস্ত নয়, সেইসঙ্গে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ বিপর্যস্ত, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ মারাত্মক ভাবে ক্ষতাবক্ষত, এমনকি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদও আহত।

এই যখন বিশ্ব পরিস্থিতি, তখন ভারতের আসমুদ্র হিমাচল বিক্ষোভে-বিদ্রোহে উত্তাল-উদ্বেল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও তার সহযোগী শক্তিগুলির নেতৃত্বে দেশ জুড়ে চলেছে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের, ছাত্র-যুবা-মহিলার সমুত্থান। বিদ্রোহ আর বিদ্রোহ—"এত বিদ্রোহ কখনো দেখেনি কেউ!" খণ্ড খণ্ড এই উত্থান অদম্য আবেগে এগিয়ে চলেছে এক অখণ্ড

অভ্যুত্থানের অমোঘ পরিণতির দিকে। কোথাও কোথাও তা ইতিমধ্যেই ধারণ করেছে সশস্ত্র আকার, আবার কোথাও কোথাও চলছে তার জন্য প্রচণ্ড প্রস্তুতি। কে রোধিবে এই যৌবন-জল তরঙ্গ ? কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে স্বাধীনতার লক্ষ্যে এই বৈপ্লবিক অগ্রগতি ? শংকিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। কি ভাবে মোকাবেলা করা যায় এই প্রত্যাসন্ন বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের ? মিলিটারি দিয়ে ? কোথায় অতীতের চির-নির্ভর সেই মিলিটারি ? স্থল-বাহিনীর এক বৃহৎ অংশ জাপানের হাতে বন্দী হয়ে রূপান্তরিত হয়েছে নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজে ; ভারতের অভ্যন্তরে যে অংশ ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন ক্যান্টনমেণ্টে, তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে অবাধ্যতা ; জব্বলপুর ক্যান্টনমেণ্টে সে অবাধ্যতা রূপ নিয়েছে সশস্ত্র বিদ্রোহে।...নৌবাহিনী ? কোথায় সেই চির-অনুগত নৌবাহিনী ? বোম্বাইয়ে 'তলোয়ার' জাহাজে শুরু হয়ে গিয়েছে সশস্ত্র বিক্ষোভ, যা ছড়িয়ে পড়েছে অন্যান্য যুদ্ধ-জাহাজে ; করাচী ও কলকাতার বন্দরের নৌসেনারা ঘোষণা করেছে বোম্বাইয়ের সঙ্গে তাদের সংগ্রামী সংহতি ; বোম্বাইয়ের বিদ্রোহী নৌ-সেনারা ইতিমধ্যেই পারের মানুষদের মধ্যে, বিশেষ করে শ্রমিকদের মধ্যে, বিলি করে দিতে শুরু করেছে সবরকমের অস্ত্রশস্ত্র।...বাকি কেবল বিমানবাহিনী। কিন্তু সেখানেও মিললো না সাম্রাজ্যবাদের সপক্ষে কোনো সাড়া, কোনো সান্ত্বনা। তারা ঘোষণা করল, মুক্তিকামী মানুষদের উপরে বোমা নিক্ষেপ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে বাধিত করতে তারা অক্ষম।

কিন্তু শংকিত হয়েছিল কেবল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা নয় ; শংকিত হয়েছিল কংগ্রেস-নেতৃত্বও। কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের নেতৃত্বে এই গণ-অভ্যুত্থান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করে ভারতকে স্বাধীন করবে ঠিকই, কিন্তু সে তো সেখানেই থেমে থাকবে না ; সে তো উৎখাত করবে বুর্জোয়া ও সামন্তস্বার্থের প্রতিভু কংগ্রেসের নেতৃত্বকেও ; স্বাধীনতার সঙ্গেসঙ্গে গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সম্পন্ন করে তা এগিয়ে যাবে সমাজতন্ত্রের দিকে। সে স্বাধীনতা কি কাম্য ? নিশ্চয়ই নয়। সেই ১৯৪০ সালেই তো গান্ধীজী খোলাখুলি ও পরিষ্কার-ভাবে ঘোষণা করেছিলেন তাঁর মনোভাবঃ "প্রভূত প্রভাবশালী একজন কংগ্রেস-নেতা আমার কাছে প্রস্তাব করেছেন যে, যেই মুহূর্তে আমি আইন-অমান্য আন্দোলনের ডাক দেব। সেই মুহূর্তে আমি পাব সুবিপুল সাড়া। সমগ্র শ্রমিক জগৎ ও ভারতের বহু অংশের কৃষকেরা ঘোষণা করবে যুগপৎ ধর্মঘট। আমি তাঁকে বলেছি যে, যদি তা হয় তা হলে আমি হব সবচেয়ে বেশি বিড়ম্বিত ; আমার সমস্ত পরিকল্পনা হয়ে যাবে বিপর্যস্ত। ...আমার কাছ থেকে যেন কেউ এই প্রত্যাশা না করেন যে আমি জেনে-শুনে এমন এক লড়াইয়ের ভার নেব, যার শেষ হবে অরাজকতায় ও লাল ধ্বংসকাণ্ডে।" সুতরাং শ্রমিক-কৃষকের সক্রিয় সংগ্রামে স্বাধীনতা যদি আসেও তা হবে অবাঞ্ছনীয়, আর তা যদি হয় কমিউনিস্ট নেতৃত্বে এবং সশস্ত্র, তা হলে অবশ্যই পরিহার্য !

অতএব, আতংকিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ; আতংকিত কংগ্রেস-নেতৃত্বও। এলো 'ক্যাবিনেট মিশন' ; এলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। গোপন আলোচনা শুরু হল আগা খাঁ প্রাসাদে—সেখানে গান্ধীজী ছিলেন 'কারারুদ্ধ'। কমিউনিস্ট-নেতৃত্বে ও বামপন্থী এই সশস্ত্র

গণসংগ্রাম যদি বিজয়লাভ করে, তা হলে সর্বনাশ উভয় পক্ষের—ব্রিটেন হারাবে তার সাধের সাম্রাজ্য আর কংগ্রেস হারাবে তার স্বপ্নের রাষ্ট্রক্ষমতা। সুতরাং "সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ"। ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদ ত্যাগ করল শাসনক্ষমতা কিন্তু অক্ষুণ্ণ রাখলো শোষণের অধিকার, ভারতের পুঁজিবাদ ত্যাগ করল তার একচ্ছত্র শোষণের দাবি, লাভ করল শাসনক্ষমতা।···চুক্তি হল উভয় পক্ষের প্রতিনিধিদের মধ্যে। চুক্তিপত্র বিনিময় হল ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট রাত বারোটা এক মিনিটে।।······উৎসবের রোশনাই মিলিয়ে যেতে না যেতে কমিউনিস্ট পার্টি দেখলো, জনগণ 'যে তিমিরে, সে তিমিরে'।তাই তারা আওয়াজ তুলেছিল, 'এ স্বাধীনতা অলীক!'

উল্লিখিত 'কেন'-র উত্তর তৃতীয়তঃ এই যে, ক্ষমতা-হস্তান্তরের পর থেকে কমিউনিস্ট পার্টির কানে ভেসে আসছিল কংগ্রেস-নেতাদের একটির পর একটি ঘোষণা—যা থেকে তাদের মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল, এই স্বাধীনতার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু ফাঁক আর ফাঁকি আছে, অন্যথা নেতারা এইধরনের ঘোষণা করবেন কেন? "ভারতে সংবিধানগত পরিবর্তন যা-ই হোক না কেন, যা আসলে গুরুত্বপূর্ণ তা হল ভারতে ব্রিটিশ পুঁজি কার্যক্ষেত্রে তার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক অবস্থানগুলি কী পরিমাণে রক্ষা করতে সক্ষম হয়।" বিস্ময়কর হল এটা বাস্তব সত্য যে, উপরি-উক্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই কংগ্রেস-নেতারা ব্রিটিশ পুঁজিকে জানিয়ে দিলেন, মা ভৈঃ!—যেমন ছিল, তেমনি থাকবে।

১৭ ফেব্রুয়ারি. প্রধানমন্ত্রী নেহরু ঘোষণা করলেন, "অর্থনৈতিক কাঠামোয় আকস্মিক কোনো রদবদল হবে না। যতদূর সম্ভব বর্তমান শিল্পসমূহকে জাতীয়কৃত করা হবে না।" জুলাই মাসে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার প্যাটেল ঘোষণা করলেন, "আমি পরিষ্কারভাবে একথা জানাতে চাই যে দেশীয় রাজ্যগুলির অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবার কোনো ইচ্ছা কংগ্রেসের নেই। কংগ্রেস দেশীয় নৃপতিতন্ত্রের শত্রু নয়।" সেইসঙ্গে জেনারেল চৌধুরীকে পাঠানো হল নিজামের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত তেলেঙ্গানার কৃষকদের নৃশংসভাবে দমন করার জন্য। ভারত সরকারের একটি ইস্তাহারে ঘোষণা করা হল, "সযত্নে বিচার-বিবেচনার পরে সরকার এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে ভারতের স্বার্থেই 'কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ'-এর পদে এফ আর আর বুচার-এর কার্যকাল অব্যাহত রাখা হল।······এতদ্দ্বারা ভারতীয় কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ নিয়োগের পূর্বতন সিদ্ধান্ত বাতিল করা হল।" পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে কে এম মুন্সী লিখলেন, "বিশ্ব-রাজনীতির······মূল বিষয় হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে, গণতন্ত্র আর একনায়কতন্ত্রের মধ্যে সংঘাতে ব্রিটেন···ও মহান গণতন্ত্রের দেশ আমেরিকার সঙ্গে সম্মেলনই হবে ভারতের শক্তির উৎস।" কমনওয়েলথ সদস্যপদ সম্পর্কে সরকারি ঘোষণায় বলা হল, "ভারত কমনওয়েলথ-এর পূর্ণ সদস্য হিসাবে থাকবার এবং রাজাকে···কমনওয়েলথ-এর প্রধান হিসেবে মান্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।" সভার উপরে টেক্কা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নেহেরু যখন তিনি ঘোষণা করলেন যে, স্বাধীন ভারতে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে ইংল্যাণ্ডের রাষ্ট্রীয় সঙ্গীত "গড সেভ দি কিং' গীত হবে।

তিনি ঘোষণা করলেন, "যতদিন পর্যন্ত ভারত কমনওয়েলথ-এর সদস্য থাকবে, তত দিন পর্যন্ত সমস্ত আনুষ্ঠানিক ও সামরিক উপলক্ষ্যসমূহে প্রথমে বাজানো হবে 'গড সেভ দি কিং' এবং পরে বাজানো হবে ভারতের জাতীয় সংগীত।" মন্তব্যের প্রয়োজন আছে?

উল্লিখিত 'কেন'-র চতুর্থ ও সর্বশেষ উত্তর বিধৃত রয়েছে ক্ষমতা হস্তান্তরের সংবিধানগত সংস্থান ও ব্যবস্থাগুলির মধ্যে এবং সেগুলি সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির অনুভাবনার মধ্যে। প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী জনগণের বিজয়ী নেতৃত্বের ঘোষণাপত্র নয়; এ স্বাধীনতা সংগ্রাম-ভীত নেতৃত্বের সঙ্গে সংগ্রাম-ভীত সাম্রাজ্যবাদের আপসরফার দলিল আর তাই স্বাধীনতা এসেছিল ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্ অ্যাক্ট্'এর মাধ্যমে। এই উপমহাদেশের সুবিপুল জনসংখ্যার মতামত যাচাই না করে 'অ্যাক্ট' ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করল দুটি 'ডোমিনিয়ন'-এ—ভারত আর পাকিস্তানে; উভয়ই পেল 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস'। দ্বিতীয়তঃ, এই 'অ্যাক্ট' বিধান দিল যে নতুন সংবিধান গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত উভয় ডোমিনিয়নেই রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে কাজ করবেন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত 'গভর্নর জেনারেল' বা বড়লাট। উভয় ডোমিনিয়নই অন্ততঃ আপাততঃ থাকবে ব্রিটিশ 'কমনওয়েলথ'-এর সদস্য এবং মেনে নেবে তার যাবতীয় বাধ্যবাধকতা। চতুর্থতঃ, এই 'অ্যাক্ট' অনুযায়ী স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনা করবে প্রাপ্ত-বয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকারে নির্বাচিত কোনো 'গণ-পরিষদ' নয়; তা রচিত হবে ১৯৩৫ সালের সংবিধান অনুসারে, কায়েমী স্বার্থের অনুকূলে দারুণভাবে সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত এক তথাকথিত 'গণ-পরিষদ'-এর দ্বারা। সর্বশেষে, ক্ষমতা হস্তান্তরের পরেও, স্বাধীনতা লাভ করবার পরেও, ভারতীয়রা আগেও যেমন ছিল 'ব্রিটিশ প্রজা', এখনো তেমন থেকে যাবে ব্রিটিশ প্রজা—অন্ততঃ নতুন সংবিধান গৃহীত হবার আগে পর্যন্ত। স্মরণীয় যে, নতুন সংবিধান গৃহীত হয়েছিল ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি আর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সরকারি ভাবে 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হায়!' স্লোগান তুলেছিল ১৯৪৮ সালে অনুষ্ঠিত পার্টি কংগ্রেসে। উল্লিখিত 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস'কে 'ঝুটা আজাদী' বললে মহাভারত অশুদ্ধ হয় কি?

ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়ে পরিণত হল দুটি ডোমিনিয়নে। কোটি কোটি মানুষ নিজ বাসেই পর্যবসিত হল পরবাসীতে। সাত পুরুষের ভিটেমাটি থেকে উৎখাত অগণিত সংসার ভেঙ্গে গেল; লক্ষ লক্ষ মানুষ হল সর্বস্বান্ত। তাদের হাহাকারের সঙ্গে যুক্ত হল উভয় ডোমিনিয়নে সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার শিকার অসংখ্য নরনারীর আর্তনাদ। বিস্ময় ও বেদনায় অভিভূত সীমান্ত গান্ধী খান আব্দুল গফফর খান সক্ষোভে সরোষে মন্তব্য করলেন, দেশ-বিভাগকে মেনে নিয়ে কংগ্রেস নেতারা বেইমানি করেছেন।"...ঠিক রইল বাকি সবকিছু—অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও সামরিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের অধিষ্ঠান, দেশীয় নৃপতিতন্ত্র তথা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা, একচেটিয়াও বৃহৎ পুঁজির অবস্থান! গান্ধীজীই না একদিন বলেছিলেন, "কেবল সাদা সাহেবদের জায়গায় কালো সাহেবরা যদি ক্ষমতার গদিতে বসেন, তা হলে আমি তাকে স্বাধীনতা বলব না?"...তা হলে, কি অপরাধ

করেছিল কমিউনিস্ট পার্টি যখন সে ঘোষণা করেছিল, এ স্বাধীনতা সাচ্চা নয়, ঝুটা ; যখন সে আহ্বান জানিয়েছিল জনগণের কাছে সাচ্চা স্বাধীনতার জন্য, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য, সংগ্রাম চালিয়ে যেতে এবং হাতে তুলে নিয়েছিল হাতিয়ার ?

অতএব বিশ্বাসঘাতকতা যদি কেউ করে থাকে, তা হল নিশ্চয়ই কমিউনিস্ট পার্টি নয়। এমনকি, মামুলি মাপকাঠির বিচারে সে ভুলও করেনি। কিন্তু ভুল সে করেছিল মার্কসীয় মানদণ্ডে—হ্যাঁ, প্রকাণ্ড ভুল।

মার্কসবাদ কোনো তত্ত্ব বা শিক্ষারই যান্ত্রিক ব্যাখ্য বা যান্ত্রিক প্রয়োগকে সমর্থন করে না। এমনকি মার্কসের তত্ত্ব বা শিক্ষার যান্ত্রিক ব্যাখ্যা বা প্রয়োগকে মার্কসবাদ অমার্কসীয় তথা ভ্রান্ত বলে মনে করে—যেমন মার্কস-এর তত্ত্ব ও শিক্ষাকে যান্ত্রিক ভাবে ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করায় প্লেখানভ লেনিনের দ্বারা অমার্কসীয় ও বিপথগামী বলে নিন্দিত হয়েছিলেন। প্রাক্-সাম্রাজ্যবাদের যুগের মার্কসীয় তত্ত্বকে প্লেখানভ সাম্রাজ্যবাদের যুগের পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন তার যুগোপযোগী সম্প্রসারণ না ঘটিয়েই। তাই তিনি হয়েছিলেন ব্যর্থ, প্রত্যাখ্যাত, এমনকি অবজ্ঞাতও।

তেমনি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এবং অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট পার্টিও লেনিন-স্তালিনের এক যুগের মার্কসীয় শিক্ষাকে অন্য যুগের পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করেছিল যান্ত্রিক ভাবে। "সাম্রাজ্যবাদ কখনো স্বেচ্ছায় ক্ষমতা হস্তান্তরিত করে না ; যা সে হস্তান্তরিত করে তা ক্ষমতার ছায়ামাত্র, সারাংশ নয়।" কিংবা "বিজয়ী, বিপ্লব ছাড়া উপনিবেশ ও পরবশ দেশের মুক্তি অসম্ভব"—লেনিন-স্তালিনের এই শিক্ষা কোন্ যুগের ? যে-যুগে বিশ্বের শক্তি-সংস্থানে সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য ছিল অবিসংবাদিত, সেই যুগের। কিন্তু ইতি-মধ্যে ঘটে গিয়েছে যুগান্তর ; বিশ্বের শক্তি-সংস্থানে ঘটে গিয়েছে গুণগত পরিবর্তন ; সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য বিনষ্ট হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সমাজতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তি শক্তি-সমূহের প্রাধান্য। সাম্রাজ্যবাদের 'হাতে আর নেই ভুবনের ভার' ; সে ভার এসেছে সমাজতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তির শক্তিগুলির হাতে।

তা ছাড়া, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তো 'স্বেচ্ছায়' ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি ; সে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিল বিশ্ব-পরিবেশ ও ভারতের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির ঘটনাবলীর দুর্বার চাপে "বাধ্য হয়ে"। একদিকে ফ্যাসিবাদের পরাজয়, ফরাসী ও ব্রিটিশ সম্রাজ্যবাদের বিপর্যয় এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের শক্তিক্ষয়, অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের জয়লাভ, দেশে দেশে সমাজতন্ত্রের বিস্তার এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সাফল্য—এই যখন বিশ্ব-পরিবেশ, তখন ভারতের জাতীয় পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে দেশজোড়া সাধারণ মানুষের উত্থান এবং সামরিক বাহিনীগুলিতে বিদ্রোহ এবং এই দুয়ের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সংহতি—এই ঘটনা-সংস্থানের চাপে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বাধ্য হয়েছিল ক্ষমতা হস্তান্তর করতে ভারতীয় পুঁজিবাদ-সামন্তবাদের প্রতিনিধি কংগ্রেস-নেতৃত্বের হাতে। কংগ্রেস-নেতৃত্বও সে ক্ষমতা সাগ্রহে তুলে নিয়েছিল, কেননা রাষ্ট্রযন্ত্র হাতে পেলে প্রথমতঃ

সে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যে দমন করবে ভারতের অভ্যন্তরীণ বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ এবং তার পরে, এক দিকে, সমাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে এবং, অন্য দিকে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিরোধের সুযোগ নিয়ে সুসংহত করে নেবে জাতীয় স্বাধীনতা ও নিজেদের শ্রেণীগত অবস্থান।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি করেছিল আরো একটি সাংঘাতিক ভুল। স্বাধীন ভারতের জনগণের সামনে তখন কর্তব্য ছিল কংগ্রেস কর্তৃক পরিত্যক্ত, প্রতিহত গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সার্থক পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং কমিউনিস্ট পার্টির ঐতিহাসিক দায়িত্ব ছিল তাতে নেতৃত্ব দান করা। দুঃখের বিষয়, ১৯৪৮ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে বি টি রণদিভের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি ঘোষণা করল, বর্তমান বিশ্ব-পরিস্থিতিতে স্বাধীনতার লড়াই, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের লড়াই আর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লড়াই একই সূত্রে গ্রথিত হয়ে গিয়েছে; সুতরাং আমাদের অবিলম্বে শুরু করতে হবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লড়াই!······এবং লড়াই শুরু হল সশস্ত্র, রক্তক্ষয়ী এবং শেষ পর্যন্ত আত্মঘাতী!···ভুল স্বীকার করা হল দু-বছর পরে, কিন্তু ইতিমধ্যে তার মাশুল দিতে হয়েছে অনেক অনেক।

বিশ্ব-পরিস্থিতির গুণগত পরিবর্তন না বুঝে লেনিন-স্তালিনের শিক্ষাকে যান্ত্রিক ভাবে প্রয়োগ করা যদি হয় 'মতান্ধতা.' তাহলে গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হচ্ছে 'পেটি বুর্জোয়া হঠকারিতা,' মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পরিবর্তে ত্রতস্কিবাদের অভিষেক; শুধু মামুলি ভুল নয়, মহা ভুল। কিন্তু ভুল তা যত বড়ই হোক না কেন, তা তো আর 'বিশ্বাসঘাতকতা' নয়। গান্ধীজীর নিজের মতে, একুশ সালের আন্দোলন ডাকাটাই হয়েছিল তাঁর 'হিমালয়-প্রমাণ ভুল।' কমিউনিস্টদের নিজেদের মতে 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হায়!' স্লোগানটাও ছিল বিরাট ভুল। দুয়েরই ভুল নিজ নিজ দৃষ্টিকোণের বিচারে। কিন্তু কোনোটাই নয় কারো বিশ্বাসঘাতকতা।

৯.৮.৮০

ভারতের স্বাধীনতা ও শান্তিপূর্ণ বিপ্লব

মার্কসবাদ বলে, বিরল পরিস্থিতি ছাড়া বিপ্লব শান্তিপূর্ণ ভাবে ঘটেনা। ইতিহাসের সাক্ষ্যও তাই, কোনো বিপ্লবই শান্তিপূর্ণ ভাবে ঘটেনি। তা হলে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন কি বিপ্লব নয়? আর যদি বিপ্লব হয়, তা হলে তা কি শান্তিপূর্ণ নয়?

প্রশ্ন দুটি খুবই প্রাসঙ্গিক। এর উত্তর পেতে হলে আমাদের বুঝতে হবে মার্কসবাদী বক্তব্যের তাৎপর্য এবং তার পরে খুঁজতে হবে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের বৈশিষ্ট্য। সন্দেহ নেই, ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে ভারতীয় কংগ্রেসের হাতে। আবার এ ব্যাপারেও সন্দেহ নেই যে, রাষ্ট্রক্ষমতার হস্তান্তরণ ঘটলেও, ঘটেনি সামাজিক উত্তরণ। অতএব বলা যায়, এক অর্থে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটলেও, বিশেষ অর্থে ঘটেনি সামাজিক বিপ্লব।

মার্কসের আবিষ্কৃত 'সামাজিক গতির নিয়ম' থেকে আমরা জানি, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার উত্তরণ ঘটে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায়। কিন্তু তা আপনা-আপনি ঘটে না, ঘটে বিপ্লবের মাধ্যমে, যে বিপ্লবে নেতৃত্ব দেয় বুর্জোয়া তথা ধনিক শ্রেণী এবং বাধা দেয় সামন্ত-প্রভু তথা জমিদার শ্রেণী। জমিদার শ্রেণীর অর্থনৈতিক, তথা রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে চূর্ণ করে নিজের অর্থ নৈতিক তথা রাজনৈতিক কর্তৃত্ব কায়েম করার এই সংগ্রামে উদীয়মান ধনিক শ্রেণী জমি বা কাজ এবং তৎসহ রাজনৈতিক অধিকারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কৃষক সমাজকে টেনে আনে স্বপক্ষে। চলে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম, ঘটে বলপ্রয়োগ ও রক্তপাত এবং শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়ে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং প্রতিষ্ঠিত হয় ধনতন্ত্র। মার্কসবাদের পরিভাষায় একেই বলে 'গণতান্ত্রিক বিপ্লব'।

কিন্তু ধনিক শ্রেণী যখন এই বিপ্লব পরিচালনা করত, তখন ধনতন্ত্র ছিল সম্প্রসারণশীল এবং জমিদার শ্রেণী ছাড়া তার ছিল না আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী, যার আকর্ষণ হবে তার চেয়েও বেশি। আর আজ ধনতন্ত্র সংকোচনশীল এবং তার আছে এমন এক প্রতিদ্বন্দ্বী, যার আকর্ষণ তার চেয়েও ঢের ঢের বেশি। সেই প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবস্থা হল শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বাধীন সমাজতন্ত্র। এই প্রতিদ্বন্দ্বীর অভ্যুদয়ে সন্ত্রস্ত কেবল জমিদার শ্রেণী নয়, ধনিক শ্রেণীও। ধনিক শ্রেণী তাই আজ আত্মবিকাশের জন্য লড়াইয়ের ডাক দেয় না জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে। বরং তার সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় এসে, দুয়ে মিলে মোকাবিলা করে শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে। গণতান্ত্রিক বিপ্লব থাকে অসমাপ্ত। তাই সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পথে শ্রমিক শ্রেণীকেই আজ সম্পন্ন করে নিতে হয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব। বিশ্ব ধনতন্ত্রের এই সংকোচনের যুগেই পরিচালিত হয়েছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং তার গতি, প্রকৃতি ও পরিণতিও বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে তার দ্বারা। হ্যাঁ, ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রকৃতিও।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যখন ভারতের দখল পেল, তখন এ দেশে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির অঙ্গ হিসেবেই ছিল এক বিপুল-বিকশিত কুটিরশিল্প। তাছাড়া স্থচনা দেখা দিয়েছিল আধুনিক ধনতান্ত্রিক শিল্পেরও। দেশের কাঁচামাল ব্যবহৃত হত এই সব শিল্পে, দেশের বাজারের চাহিদা মেটাতো এইসব শিল্পের পণ্যসম্ভার। কাঁচামাল ও বাজারের উপরে একচেটিয়া থাবা কায়েম করার জন্য সাম্রাজ্যবাদ চূর্ণবিচূর্ণ করে দিল এ দেশের স্থসমৃদ্ধ কুটিরশিল্প, অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দিল ধনতান্ত্রিক শিল্প-সম্ভাবনা এবং সেই সঙ্গে নিজের বিবিধ প্রয়োজনে পুনর্গঠিত করল সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা, যা হ'ল এদেশে সাম্রাজ্যবাদের স্তম্ভস্বরূপ। অতএব বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এক স্থত্রে গ্রথিত হয়ে গেল স্বদেশী সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঙ্গে।

কালক্রমে আবার এ দেশে ইতস্ততঃ মাথা তুলল এ দেশীয় ধনিকদের কিছু কিছু কল-কারখানা; স্থচনা হ'ল দেশীয় ধনতন্ত্রের। ক্রমে ক্রমে শুরু হ'ল সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্রের সঙ্গে নবজাত ভারতীয় ধনতন্ত্রের দ্বন্দ্ব—যে দ্বন্দ্বে ভারতীয় ধনতন্ত্রের মুখপাত্র হ'ল জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব। মূলতঃ সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্রের সঙ্গে 'জাতীয়তাবাদী ধনতন্ত্রে'র এই বিরোধেরই প্রকাশ ও বিকাশই হ'ল ভারতের জাতীয় আন্দোলন। কিন্তু এই আন্দোলন চালাতে গিয়ে যেমন ভারতের নবজাত ধনিক শ্রেণী, তেমন কংগ্রেস-নেতৃত্বও পড়লেন উভয় সঙ্কটে—বিশেষতঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রক্রিয়ায় রুশ বিপ্লবের সাফল্য এবং অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও শ্রমিক আন্দোলনের প্রাবল্যের পরিপ্রেক্ষিতে। সাম্রাজ্যবাদ এবং সেই সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করলে উদ্দেশ্য সিদ্ধির আশা নেই, আবার সংগ্রাম করলে সারা দেশ জুড়ে এমন বিপুল ও বিপ্লবী শক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটতে পারে, যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা তার নেই। মার্কসবাদী পরিভাষায় বলা যায়, বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে গণতান্ত্রিক বিপ্লব না পরিচালনা করলে যেমন জাতীয় মুক্তি-বিপ্লব প্রায় অসাধ্য, তেমন আবার পরিচালনা করলেও, তাকে শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রায় অসাধ্য, কেননা তখন সমাজতন্ত্রের পতাকাবাহী শক্তিবৃন্দ তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে এমন এক পর্যায়ে যে, কেবল সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রই উচ্ছিন্ন হবে না, বিপন্ন হবে তাদের সাধের ধনতন্ত্রের দেশীয় শিশুটিও। অতএব, কিংকর্তব্যম্?

এই উভয়সঙ্কট থেকে ভারতের ধনিক শ্রেণীকে, তথা জাতীয় কংগ্রেসকে, ত্রাণ করলেন গান্ধীজী, যিনি নিজের পরিচয় দিতেন 'বানিয়া' বলে। মার্কসবাদ না পড়েও তাঁর 'বানিয়া'-স্থলভ হিসেবি বুদ্ধিতে তিনি বুঝেছিলেন, জাতীয় আন্দোলনকে তার পূর্ণ পরিণতিতে নিয়ে যেতে হলে শেষ পর্যন্ত লড়তে হবে সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অর্থাৎ সম্পূর্ণ করতে হবে গণতান্ত্রিক বিপ্লব, যা ঘটনাক্রমে কেবল তাঁর অহিংসার নীতিকেই লঙ্ঘন করবে না, বিপন্ন করবে তাঁর, তথা কংগ্রেসের, নেতৃত্বকেও। তাই তিনি সচেষ্ট হলেন জাতীয় আন্দোলন এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে একটি বিচ্ছেদ ঘটাতে, দ্বিতীয়টিকে বাদ দিয়ে প্রথমটিকে নিয়ে এগিয়ে যেতে। এইজন্যই তিনি ১৯২১ সালে কংগ্রেসের

বিপুল অংশের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিকে উপেক্ষা করে জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্যকে সীমিত করলেন 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস'-এ ; এমনকি ১৯২৯ সালে বামপন্থীদের চাপে সরকারিভাবে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হলেও, গান্ধীজী ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিলেন, পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য তিনি সংগ্রাম করবেন না ; তাঁর এগারো দফা দাবি মানলেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন।

তাই তিনি সংগ্রামের রূপ হিসাবে গ্রহণ করলেন সত্যাগ্রহকে—যার বাস্তব রূপ দাঁড়ালো একটা নির্দিষ্ট মাত্রা অবধি সংগ্রাম-চালনা, সেই সংগ্রাম চলাকালে দর কষাকষি এবং তার পরে তা প্রত্যাহার। উল্লেখযোগ্য যে, এই সংগ্রামে কোনো অবস্থাতেই তিনি কৃষকদের আহ্বান জানাননি সাম্রাজ্যবাদের স্তম্ভস্বরূপ জমিদারদের জমি দখল করে নিতে ; ডাক দেননি সবচেয়ে প্রগতিশীল যে শ্রেণী, সেই শ্রমিক শ্রেণীকে কল-কারখানায় ধর্মঘট করে লড়াইয়ের শরিক হতে। কেবল তাই নয়, তিনি চাননি যে, ব্রিটিশ প্রভুদের নির্দেশ লঙ্ঘন করে সৈন্যরা আন্দোলনকারীদের উপরে গুলি চালাতে অস্বীকার করুক। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে—যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হয়নি, সেই পর্যায়ে গান্ধীজীর একটি লেখা ; "বিরাট প্রভাবশালী একজন কংগ্রেস নেতা আমার কাছে প্রস্তাব করেছেন যে এই মুহূর্তে আমি যদি আইন অমান্যের আহ্বান দিই, তাহলে পাব চমৎকার সাড়া। ভারতের সমগ্র শ্রমিকসমাজ এবং বহু অঞ্চলে কৃষকেরা যুগপৎ ধর্মঘট করবে। আমি তাঁকে বললাম, তাহলে সবচেয়ে ঝামেলায় পড়ব আমি, আমার সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাবে।……আমি আশা করি, এটা কেউ প্রত্যাশা করবেন না যে, আমি জেনেশুনে এমন একটা সংগ্রাম শুরু করি, যা শেষ হবে অরাজকতায় ও লাল ধ্বংসকাণ্ডে।" (হরিজন, জানুয়ারি, ১৯৪০।) মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তবে এইটুকু যোগ করা দরকার যে, 'ভারত ছাড়ো' ডাক দেবার পরে যদি গান্ধীজী বাইরে থাকতেন, তবে ৪২-এর আন্দোলন যেভাবে চলেছিল, নিশ্চয়ই সেভাবে চলত না।

যা হোক, ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ব্রিটিশ সরকার খণ্ডিত ভারতবর্ষের ক্ষমতা হস্তান্তর করল কংগ্রেস-নেতৃত্বের কাছে। এখন প্রশ্ন হল, এই ক্ষমতা-হস্তান্তর কি বিপ্লব ? আর যদি বিপ্লবই হয়, তাহলে কি তা শান্তিপূর্ণ ভাবে বিপ্লব সংঘটনের একটি নজির নয় ? নিহিত প্রশ্ন এই যে, তাহলে কি মার্কসবাদী বিপ্লব-তত্ত্বটি অন্ততঃ আংশিকভাবেও ভ্রান্ত নয় ?

প্রথম প্রশ্নটির জবাবে আমার বক্তব্য এই যে, হ্যাঁ, যদিও এটি গণতান্ত্রিক বিপ্লব নয়, তাহলেও বিপ্লব—জাতীয় মুক্তি-বিপ্লব, কেননা, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে স্বদেশী জাতীয়তাবাদের হাতে এই রাষ্ট্রক্ষমতার স্থানান্তর অবশ্যই একটি গুণগত পরিবর্তন। কেউ কেউ অবশ্য লেনিনের উধৃতি দিয়ে প্রশ্ন তোলেন, 'যথার্থ' রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে কিনা। লেনিন বলেছিলেন, "সাম্রাজ্যবাদ কখনও স্বেচ্ছায় ক্ষমতা তুলে দেয় না, যা দেয় তা ক্ষমতার ছায়ামাত্র, কায়া নয়।" হ্যাঁ, লেনিন একথা বলেছিলেন, তবে বলেছিলেন

এমন এক বিশ্ব-পরিস্থিতিতে, যখন সাম্রাজ্যবাদ ছিল ইতিহাসের নিয়ন্তাশক্তি এবং জাতীয় মুক্তির স্বপক্ষীয় শক্তিগুলি ছিল উদীয়মান কিন্তু অপ্রবল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রক্রিয়ায় পরিস্থিতি যায় আমূল পালটে। আর সেই পরিস্থিতিকে সাম্রাজ্যবাদ স্বেচ্ছায় নয়, বাধ্য হয়েই করে ক্ষমতা হস্তান্তর—ছায়া নয়, কায়া, এবং তা করে সেদেশে তার শ্রেণী-ভাইদের হাতে। ভারতের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। লেনিনের উক্তিকে আপ্তবাক্য হিসাবে না শিরোধার্য করে, তাঁকে বুঝতে হবে স্থানকালপাত্রের পরিপ্রেক্ষিতে।

দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তরে আমি একটু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই এই ক্ষমতা হস্তান্তরের পটভূমি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ। ফ্যাসিবাদ বিধ্বস্ত, বাকি সাম্রাজ্যবাদও বিপর্যস্ত। সাংঘাতিকভাবে আহত বুড়ো ব্রিটিশ সিংহ তখন অবসন্ন দেহে লেহন করছে তার ক্ষতস্থানগুলি। অন্যদিকে বিজয়ী সমাজতন্ত্রের বিস্তার ঘটেছে দেশে দেশে, এবং জাতীয় মুক্তির আন্দোলন হয়ে উঠেছে দুর্বার, অপ্রতিরোধ্য। এই যখন আন্তর্জাতিক পরিবেশ, তখন ভারতের জাতীয় পরিস্থিতিও ছিল না নিশ্চল, নিস্তরঙ্গ। সারা দেশ জুড়ে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত সামিল হয়ে গিয়েছে সংগ্রামের ময়দানে, কোথাও কোথাও আত্মপ্রকাশ করেছে সশস্ত্র সংগ্রাম, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বাধীন সরকার। যে সামরিক বলের সাহায্যে এই সংগ্রামীদের দাবিয়ে দেবে সাম্রাজ্যবাদ, তার একাংশ আগেই পরিণত হয়েছিল আজাদ হিন্দ ফৌজে আর বাকি অংশে তখন ছড়িয়ে পড়েছে উত্তপ্ত উত্তেজনা। বিদ্রোহ ফেটে পড়েছে স্থলবাহিনীতে, নৌবাহিনীতে এবং বিমানবাহিনীতে। "এত বিদ্রোহ কথনো দেখেনি কেউ, দিকে দিকে শুধু অবাধ্যতার ঢেউ!" এই যখন পরিস্থিতি, তখন নিজেদের বিপর্যয় ও বিতাড়ন অনিবার্য জেনে, অর্থনৈতিক স্বার্থ যতটা রক্ষা করা যায় সেই উদ্দেশ্যে, নিরুপায় ব্রিটিশ সরকার আপসে ক্ষমতা হস্তান্তর করল কংগ্রেস-নেতৃত্বের হাতে। ভারত স্বাধীন হ'ল।

ইতিহাসের সবচেয়ে হিংস্র, রক্তক্ষয়ী, প্রাণক্ষয়ী, সম্পদ-বিধ্বংসী বিশ্বযুদ্ধের পরিণতি ও প্রভাবে, ভারতের ব্যাপকতম জনসমষ্টির উদ্ধত মুষ্টির উদ্যত আঘাতের মুখে প্রত্যাঘাতে অক্ষম, ভীত, সন্ত্রস্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের এই ক্ষমতা-হস্তান্তরকে কেউ যদি শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের নজির হিসাবে, গান্ধীজির অহিংস নীতির বৈজয়ন্তী হিসাবে তুলে ধরতে চান, ধরতে পারেন, কিন্তু সত্যই কি তাই? একবার এক বুড়ো বাঘ খাবারের লোভে গ্রামে ঢুকে পড়লে গ্রামবাসীরা যে যা পারে হাতিয়ার নিয়ে, চারদিক থেকে বাঘটাকে তাড়া করে। নিরুপায় বাঘটা প্রাণ বাঁচাতে এক হরি-সংকীর্তনের আসরে ঢুকে পড়ে। ভক্তরা নাকি পরে এই ঘটনাকে প্রচার করেন হরি-সংকীর্তনের মাহাত্ম্য বলে! আহত অসহায় ব্রিটিশ সিংহের সবরমতি আশ্রমে ঢুকে পড়াটাও তেমনি এক ব্যাপার। এই অহিংসার মাহাত্ম্য বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করা আসলে আত্মপ্রতারণারই নামান্তর।

এমনকি যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নিই যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘটনাটা একটা শান্তিপূর্ণ, অহিংস বিপ্লবের নজির, তাহলেও কিছু এসে যায় না। বিশেষ অবস্থায়, ব্যতিক্রম হিসেবে, বিপ্লব বিনা বলপ্রয়োগে, বিনা রক্তপাতেও ঘটতে পারে। যেমন

চারদিকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিবেষ্টনের মধ্যে যদি একটি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র থাকে, সেখানে ধনিকেরা উদ্যত শ্রমিক শ্রেণীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারে বিনা প্রতিরোধে; অতএব বিপ্লব ঘটতে পারে শান্তিপূর্ণভাবে। ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘটনাকেও তেমনি গণ্য করা যায় একটি বিশেষ পরিস্থিতির ফসল হিসেবে, ব্যতিক্রমমূলক ঘটনা হিসাবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তীকালে যে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে ছিল এক বিশেষ অবস্থা, তা কে অস্বীকার করতে পারেন? অতএব, সে অবস্থায় যদি কোথাও শান্তিপূর্ণভাবেই বিপ্লব ঘটে, তবে সেটা মার্কসবাদের খণ্ডন নয়, বরং সমর্থন।

১৮.৩.৮৬

অসাধ্য সাধনের সার্থক সাধক গান্ধীজী

গত ২রা অক্টোবর ছিল গান্ধীজীর ১১৮ তম জন্মদিবস। এই উপলক্ষে সারা দেশ জুড়ে অনুষ্ঠিত হ'ল বিবিধ অনুষ্ঠান। অনেক অনুষ্ঠানে আলোচিত হ'ল তাঁর জীবন ও সাধনার বিভিন্ন দিক। কিন্তু একটি দিক থেকে গিয়েছে অনালোচিত। কিংবা যদি আলোচনা হয়েও থাকে, তা প্রচারিত হয়নি তেমনভাবে। অথচ আমার মতে এই দিকটিই হচ্ছে তাঁর কর্মজীবনের আদ্যন্ত অন্তর্নিহিত সূত্র এবং এই দিকটিতেই তিনি করেছেন, যাকে বলা যায়, অসাধ্য সাধন। দুটি ওতপ্রোত-সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াকে তিনি করেছেন পরস্পর-বিশ্লিষ্ট এবং একটিকে পরিহার করে অন্যটিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন পরিণতির দিকে। আমি বলছি সামাজিক বিপ্লবের প্রক্রিয়া এবং রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রক্রিয়ার কথা। গান্ধীজী প্রথমটিকে পরিহার করে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন দ্বিতীয়টিকে। আর এই নঙর্থক ও সদর্থক দুটি ক্ষেত্রেই তিনি অর্জন করেছেন অসাধারণ সাফল্য।

বক্তব্যটিকে বিশদ করা প্রয়োজন। সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাস অনুসরণ করে আমরা দেখতে পাই যে, একটি সমাজব্যবস্থার উপস্থিত উৎপাদন-কাঠামো যখন আর ধরে রাখতে পারেনা তার ক্রমবর্ধিত উৎপাদন-শক্তিকে, তখনি ঘটে সমাজ-বিপ্লব ; উপস্থিত সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিস্থাপিত হয় নতুন এক সমাজ-ব্যবস্থার দ্বারা। এইভাবেই আদিম সাম্যতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পরে পর্যায়ক্রমে আসে গোলাতামন্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিক, ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক ইত্যাদি সমাজ-ব্যবস্থা। আমাদের দেশে যখন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠা ঘটে, অর্থাৎ আমরা যখন পরাধীন হই, তখন আমাদের দেশে প্রধানতঃ ছিল এক পরিণত সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা, যা উন্মুখ ছিল ধনতান্ত্রিক রূপান্তরের দিকে। কিন্তু ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের আত্মপ্রতিষ্ঠায় প্রতিহত হ'ল এই প্রক্রিয়া।

ইংল্যাণ্ডের ধনতান্ত্রিক বিস্তারের স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ চুরমার করে দিল ভারতের শিল্পব্যবস্থাকে, পুনর্গঠিত করল সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে এবং এইভাবে তাকে পর্যবসিত করল তার কাঁচামালের উৎসে এবং তৈরি মালের বাজারে। স্বাভাবিকভাবেই এই পুনর্গঠিত সামন্ততন্ত্র হ'ল এ দেশে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি এবং নতুন সামন্ত প্রভুরা তথা জমিদারেরা হ'ল তার স্তম্ভ। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই যখন পরিস্থিতি, তখন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম এবং সামন্ততন্ত্র-বিরোধী সংগ্রাম, অর্থাৎ স্বাধীনতা-সংগ্রাম এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সংগ্রাম মিলে যায় একই সংগ্রামের মধ্যে। কিন্তু গান্ধীজীর সমগ্র কর্ম-সাধনার অন্তর্নিহিত চেষ্টা ছিল এই দুটি সংগ্রামকে একটি সংগ্রামের মধ্যে মিলিত হতে না দিয়ে দুটিকে পরস্পর থেকে আলাদা করে রাখা এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সংগ্রামকে অবদমিত রেখে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা সংগ্রামকে তার নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিনিময়ে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জনের এই যে কর্মনীতি, তার পিছনে গান্ধীজীর বিষয়ীগত ('সাবজেক্টিভ') ভাবনা-চিন্তা কি ছিল তা আমাদের আলোচ্য নয়। আমাদের আলোচ্য কেবল এই কর্মনীতির বিষয়গত ('অবজেক্টিভ') রূপ ও ফল। আমরা জানি, এই কর্মনীতি বাস্তবে রূপ পেয়েছিল কৃষকদের তাদের শ্রেণীগত দাবি উত্থাপন থেকে বিরত রেখে, শ্রমিক শ্রেণীকে সক্রিয় অংশগ্রহণ থেকে যথাসম্ভব সরিয়ে রেখে, অহিংস ও শান্তিপূর্ণ পন্থায় স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা এবং সেই সংগ্রাম জঙ্গী আকার ধারণ করার মুখে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস-রফার মধ্যে। গান্ধীজীর পরিচালিত কোনো আন্দোলনেই এই কর্মনীতির ব্যত্যয় ঘটেনি—না বিশ দশকের শুরুতে অসহযোগ আন্দোলনে, না ত্রিশ দশকের শুরুতে আইন অমান্য আন্দোলনে। কোনো আন্দোলনেই ধ্বনিত হয়নি সামন্ততন্ত্র-বিরোধী স্লোগান ; কোনো আন্দোলনেই ঘোষিত হয়নি শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি সংগ্রামী আহ্বান; কোনো আন্দোলনকেই পরিচালিত করা হয়নি তার চূড়ান্ত পরিণতির দিকে। গান্ধী-নেতৃত্বের যাদু এইখানে যে, সামন্ততন্ত্র-বিরোধী কোনো ভূমিকা না থাকা সত্ত্বেও কৃষক সমাজ তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিল অভূতপূর্ব ব্যাপকতায়, তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেছিল ধর্মীয় ব্যগ্রতায়। গান্ধীজী কর্তৃক অনুসৃত এই কর্মনীতিরই বাস্তব পরিণতি ঘটল ১৯৪৭ সালে ১৫ই আগস্ট তারিখে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘটনায়, যার ফলে অর্জিত হ'ল ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা কিন্তু অসমাপ্ত রইল তার গণতান্ত্রিক সমাজ-বিপ্লব।

এখানে আরো একটি বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য। গান্ধীজী নেতৃত্ব গ্রহণের আগে পর্যন্ত কংগ্রেস ছিল নানা মতের, নানা পথের একটি মিলন-মঞ্চ। হিংসায় বিশ্বাসী এবং এবং অবিশ্বাসী, অশান্তিপূর্ণ পন্থার অনুসারী এবং প্রতিবাদী, বামপন্থী এবং দক্ষিণপন্থী—সমস্ত ধারারই সঙ্গমস্থল ছিল কংগ্রেস। কোনো মত বা পথকেই কংগ্রেসের একমাত্র মত বা পথ বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। কিন্তু গান্ধীজী নেতৃত্ব গ্রহণের পর থেকেই একমাত্র অহিংস ও শান্তিপূর্ণ পন্থাকেই ঘোষণা করা হ'ল কংগ্রেসের একমাত্র পন্থা বলে। সেই থেকে বামপন্থীরা, প্রধানতঃ যাঁরা ছিলেন শ্রমিক-কৃষক প্রভৃতি শ্রেণী-স্বার্থের প্রবক্তা, তাঁরা পড়লেন গান্ধীজীর অনুগামীদের ক্রমবর্ধমান বিরোধিতার মুখে। এই অনুগামীরা প্রধানতঃ ছিলেন ধনিক ও জমিদার শ্রেণী-স্বার্থের মুখপাত্র। অবস্থা চরমে উঠলো যখন বামপন্থীদের প্রতিনিধি হিসাবে সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বারের জন্য কংগ্রেস-সভাপতির পদপ্রার্থী হলেন এবং গান্ধীজী স্বয়ং প্রকাশ্যে বেরিয়ে এলেন তাঁর বিরোধিতায়। অনতিবিলম্বে সুভাষচন্দ্র হলেন কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত। তার পরে কংগ্রেস থেকে একে একে নিষ্ক্রান্ত হলেন অন্যান্য বামপন্থীরা। পরিণামে, কংগ্রেস হারালো তার মিলন-মঞ্চের চরিত্র এবং পরিণত হ'ল একটি দলে, যার নেতৃত্ব রইল ব্যক্তি হিসাবে গান্ধীজীর হাতে এবং শ্রেণী হিসাবে ধনিক শ্রেণী ও সামন্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিদের হাতে—প্রধানতঃ ধনিক শ্রেণীর হাতে। সুতরাং ক্ষমতা যখন হস্তান্তরিত হ'ল কংগ্রেসের নেতৃত্বের হাতে, তখন তা হ'ল ধনিক শ্রেণী ও সামন্ত শ্রেণীর হাতেই। অতএব দেখা যাচ্ছে, গান্ধীজীর কর্মনীতি ও সাংগঠনিক নীতি

উভয়ই শেষ পর্যন্ত সাহায্য করেছে ধনিক শ্রেণী এবং জমিদার শ্রেণীকে, প্রধানতঃ প্রথমটিকে।

গান্ধীজীর নেতৃত্বের ঐতিহাসিক তাৎপর্য বুঝবার জন্য আরো একটি বিষয় আলোচনা করা আবশ্যক। অতীতে ইউরোপে আমরা দেখেছি, সেখানে আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রসারের স্বার্থে উদীয়মান ধনিক শ্রেণীর কৃষক সমাজের সহায়তায় সংগ্রাম করেছে জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে, চুরমার করে দিয়েছে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে। সেই নজির অনুযায়ী আমাদের দেশেও উদীয়মান ধনিকশ্রেণীর কর্তব্য ছিল নিজের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের স্বার্থে কেবল বিদেশী সাম্রাজ্যবাদেরই নয়, স্বদেশী সামন্ততন্ত্রেরও ধ্বংস সাধনের জন্য সংগ্রাম করা। তা না করে তারা উভয় ক্ষেত্রেই গান্ধীজীর নেতৃত্বে সংগ্রাম চলাকালে আপসের নীতি অনুসরণ করল কেন? তার কারণ এই যে, অতীতে তখন ছিল ধনতন্ত্রের সম্প্রসারণের যুগ। তখন ধনিক শ্রেণীর ক্ষমতা ছিল ভূমিহীন কৃষকদের সবাইকে জমি না দিতে পারলেও ক্রম-বর্ধমান কল-কারখানায় তাদের কাজ দেওয়া। তাছাড়া তখন শ্রমিক শ্রেণী ছিলনা সংগঠিত, তার ছিল না কোনো পার্টি; আর তাই ধনিক শ্রেণীর ছিল না জমিদার শ্রেণী ছাড়া আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী। তাই তখন ধনিক শ্রেণী কৃষক সমাজকে নির্ভয়ে নির্দ্বিধায় ডাক দিতে পারত সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ময়দানে। কিন্তু এখন ধনতন্ত্রের সংকোচনের যুগ। কল-কারখানা ক্রম-হ্রাসমান। তাই ভূমিহীন কৃষকদের বাড়তি সংখ্যার জন্য করা যায় না কোনো কাজের ব্যবস্থা। তাছাড়া শ্রমিক শ্রেণী আজ সংগঠিত। তাদের আছে নিজস্ব পার্টি, যার ঘোষিত লক্ষ্য হচ্ছে কেবল সামন্ততন্ত্রেরই নয়, ধনতন্ত্রেরও অবসান ঘটিয়ে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। এই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখে দাঁড়িয়ে ধনিক শ্রেণী আজ সাহস পায়না সামন্ততন্ত্র বা সাম্রাজ্যবাদ—কোনোটির বিরুদ্ধেই কৃষকদের বিজয়পণ সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে। কেননা, সেক্ষেত্রে তার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে শ্রমিকশ্রেণী ও তার পার্টি। তাই ধনিক শ্রেণী আজ আর শেষ অবধি সংগ্রামের পথে লেগে না থেকে, খোঁজে আপসের সুযোগ। প্রস্তুত থাকে সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নিতে—তার জন্য যদি দিতে হয় কিছু 'কনসেশন', 'সেওভি আচ্ছা'। আর গান্ধীজীর নেতৃত্ব তাদের জন্য তৈরি করে দিয়েছে এই সুবর্ণ সুযোগ এবং তারা তা গ্রহণ করেছে ব্যগ্রভাবে।

পরিশেষে, আর একটি মাত্র বিষয় উল্লেখ করে এই লেখার ইতি-রেখা টানবো। বেশ কিছুকাল ধরে কোনো কোনো মার্কসবাদী মহলে একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে গান্ধীজীর সঙ্গে লেনিনের সাদৃশ্যমূলক তুলনা করার। জনৈক সুপরিচিত লেখক তো দুজনের মধ্যে সাদৃশ্য দেখিয়েই ক্ষান্ত হননি, তিনি গান্ধীজীর সবরমতি আশ্রমের সঙ্গে লেনিনের স্খলনিস্থিত 'আণ্ডারগ্রাউণ্ড' আশ্রমের তুলনা করে সে দুটির মধ্যেও সাদৃশ্য আবিষ্কার করেছেন!

আমার মনে হয়, এই ধরনের তুলনা বাহ্যিক ও বিভ্রান্তিকর। এ কথা ঠিক যে, গান্ধীজী এবং লেনিন দু'জনেই ছিলেন ধনতন্ত্রের সংকোচনের যুগের নেতা। কিন্তু যেখানে গান্ধীজী নেতৃত্ব দিয়েছেন প্রধানতঃ ধনিক শ্রেণীকে, সেখানে লেনিন নেতৃত্ব দিয়েছেন প্রধানতঃ শ্রমিক শ্রেণীকে। যেখানে গান্ধীজী গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে রেখে দিয়েছিলেন গতিরুদ্ধ, সেখানে লেনিন ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে গতিমুক্ত করে, অক্টোবর মাসে তাকে পরিচালিত করেছিলেন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যে। সুতরাং ইতিহাসের দিক থেকে গান্ধীজী লেনিনের চেয়ে এক যুগেরও বেশি পিছে কিংবা বলা যায় লেনিন গান্ধীজীর চেয়ে এক যুগেরও বেশি আগে।

এক কথায় বলা যায়, গান্ধীজীর কৃতিত্ব লেনিনের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্যে নয়, বৈসাদৃশ্যে। তাঁর কৃতিত্ব সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করেও ব্যাপক কৃষক সমাজের আস্থা অর্জনে এবং সামাজিক বিপ্লব পরিহার করেও রাষ্ট্রীয় 'বিপ্লব' সম্পাদনে। এই দুই অসাধ্য সাধনের তিনি যে সার্থক সাধক, তা অবশ্যই স্বীকার্য। এবং এ ক্ষেত্রে তিনি অনন্য।

২৮.১০.৮৮

ছাব্বিশে জানুয়ারি স্মরণে ও বরণে

স্বাধীন ভারতে যাঁরা জন্মেছেন ও বড় হয়েছেন, তাঁদের কাছে ছাব্বিশে জানুয়ারি সরকার-ঘোষিত একটি বিশেষ দিবস—'প্রজাতন্ত্র দিবস'। আমরা, যাদের শৈশব ও যৌবন কেটেছে পরাধীন ভারতে তাদের কাছে তা ছিল সরকার-বিরোধী একটি বিশেষ দিবস—'স্বাধীনতা দিবস'।

এই দিনটিতে রাত্রিশেষে বিউগল-এর আহ্বানে বিছানা ছেড়ে আমরা বেরিয়ে পড়তাম ঘর থেকে, জড়ো হতাম পাড়ায় পাড়ায়, 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি কণ্ঠে নিয়ে শুরু করতাম প্রভাতফেরি, তারপর নির্দিষ্ট জায়গায় সমবেত হয়ে উত্তোলন করতাম জাতীয় পতাকা, সোচ্চারে গ্রহণ করতাম স্বাধীনতার জন্য আত্মোৎসর্গের অঙ্গীকার। প্রভাতী অনুষ্ঠান শেষ হ'ত সমবেত কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম' এবং 'ভারত-মাতা কি জয়' ধ্বনির মধ্যে। সারাদিন ধরেই চলত অনুষ্ঠান—পল্লীতে পল্লীতে, বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে, সর্বশেষে কেন্দ্রীয় সম্মিলনে। কখনো কখনো মোকাবেলা হ'ত পুলিসের সঙ্গে—রাস্তা ভিজে যেত রক্তে। সে কী রোমাঞ্চ! সে কী উত্তেজনা! সে কী অকুতোভয় অভিযান!

তারপরে কেটে গিয়েছে কয়েক দশক। এরমধ্যে বহু প্রাণ ও বহু রক্তের মূল্যে, বহু দুঃখ ও ত্যাগবরণের বিনিময়ে, ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত অর্জন করেছে তার স্বাধীনতা, ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি গ্রহণ করেছে তার স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান। আর সেই সঙ্গে ১৫ আগস্ট পেয়েছে স্বাধীনতা দিবসের গৌরব আর ২৬ জানুয়ারি পেয়েছে প্রজাতন্ত্র দিবসের মহিমা।

জার্মান মহাকবি গ্যেটে কালিদাসের 'শকুন্তলা' সম্পর্কে বলেছিলেন, একই সঙ্গে ফুল ও ফল। ২৬ জানুয়ারি সম্পর্কে আমরা বলতে পারি, একই সঙ্গে কুঁড়ি ও ফুল—এবং ফলও। ১৮৮৫ সালে স্বাধীনতার স্বপ্ন ছিল কেবল অস্ফুট কুঁড়ি—'ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে।' ১৯৩০ সালে তা হ'ল ফুল—প্রকাশ পেল সংকল্পের আকারে। ১৯৪৭ সালে তা পরিণত হ'ল ফলে—ভারত হ'ল স্বাধীন। নিচের অনুচ্ছেদ ক'টিতে আমি সংক্ষেপে বিধৃত করব কেবল প্রথম পর্যায়ের কাহিনী – কুঁড়ি থেকে ফুল হওয়ার কাহিনী। ফুল থেকে ফল হওয়ার কাহিনী অতি সাম্প্রতিক, তাই তুলে রাখা হ'ল ভবিষ্যতের জন্য।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে ধরা হয় জাতীয় কংগ্রেসের সমবয়সী বলে, যার জন্ম হয় বোম্বাইয়ে ১৮৮৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর। নবজাতকের মুখে অবশ্য তখনি ফোটেনি স্বাধীনতার বুলি। সম্মেলনের সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণে তখন প্রকাশ পেয়েছিল কেবল এই ইচ্ছাটুকু যে, তাঁরা শাসিত হতে চান ইউরোপে প্রচলিত সরকারের ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী, 'যা ব্রিটিশ সরকারের প্রতি সর্বাঙ্গীণ আনুগত্যের সঙ্গে কোনোক্রমেই সামঞ্জস্যহীন নয়।' যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, তাতে কামনা করা হয়েছিল কেবল

আইন-পরিষদে সামান্য কিছু সংখ্যক নির্বাচিত সদস্যের অন্তর্ভুক্তি। একদিকে কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে এই বিনম্র অনুরোধ, অন্যদিকে নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৯২ সালে ব্রিটিশ সরকার 'পরিষদ আইন'-এ স্বীকৃতি দিল নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বের নীতিকে। কিন্তু এই স্বীকৃতি ছিল এত অকিঞ্চিৎকর যে ১৮৮৯ সালে রমেশচন্দ্র দত্তের মত নরমপন্থী কংগ্রেস-সভাপতিকে পর্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে হয়, 'ত্রিশটি জেলা এবং তিন কোটি জনসংখ্যা সমন্বিত একটি প্রদেশের আইন পরিষদে থাকা উচিত ছিল অন্ততঃ ত্রিশজন নির্বাচিত প্রতিনিধি।' ১৯০১ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নাটোরের মহারাজা পর্যন্ত এই অনুরোধ-উপরোধের, আবেদন-নিবেদনের "রাজনৈতিক ভিক্ষাবৃত্তি" বলে। ১৯০৩ সালে প্রকাশিত হতে থাকলো বিপিনচন্দ্র পালের জ্বালাময়ী প্রবন্ধমালা, যাতে তিনি তীব্রভাবে নিন্দা করলেন আন্দোলনের এই আবেদনমূলক ধারাকে।

ইতিমধ্যে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব ঘটেছে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ, বালগঙ্গাধর তিলক, লাজপত রায়, ফিরোজ শা মেটা প্রমুখ বামপন্থী নেতাদের। দেখা দিল দক্ষিণপন্থী এবং বামপন্থীদের মধ্যে বিরোধের ফলে কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হবার বিপদ। সর্বজন শ্রদ্ধেয় দাদাভাই নৌরজীর হস্তক্ষেপে ঘটলো সেই সংকটমুক্তি। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের পটভূমিকা ১৯০৬ সালে কলকাতা কংগ্রেসে গৃহীত হ'ল এক নতুন সুরের প্রস্তাব, যাতে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য বলে ঘোষিত হ'ল 'স্বরাজ' অর্জন ('ব্রিটিশ উপনিবেশ-গুলিতে বিদ্যমান স্বায়ত্তশাসনমূলক ব্যবস্থা')। এই প্রসঙ্গে দাদা ভাই নৌরজীর একটি চিঠি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যাতে তিনি লেখেন, "কংগ্রেসের নামে রটেছে যে, সে মন্থর, গতির কোনো স্পন্দন তার মধ্যে নেই। নতুন যুগের মানুষরা তার প্রতি অসন্তুষ্ট, অসহিষ্ণু। কিন্তু এই অসহিষ্ণু মনোভাবকেই কংগ্রেসি উদ্যোগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফসল বলা যেতে পারে—এ তার বিবর্তন ও অগ্রগতির পরিচয় বহন করছে। (আমাদের যা দায়িত্ব) তা হ'ল প্রয়োজনীয় বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করা—সে বিপ্লব অহিংসই হোক বা সহিংসই হোক। বিপ্লব কী রূপ নেবে তা নির্ভর করে ব্রিটিশ সরকারের বিচক্ষণতা বা বিচক্ষণহীনতার উপর এবং ব্রিটিশ জনসাধারণ কী ভূমিকা নেবে তার উপরে।"

'ব্রিটিশ সরকারের বিচক্ষণতা বা বিচক্ষণহীনতা'র পরিচয় পাওয়া গিয়েছে ইতিমধ্যেই এবং সেই সঙ্গে 'বিপ্লব কী রূপ নেবে' তারও পরিচয় পাওয়া গিয়েছে অবিলম্বেই রাজ-নৈতিক আন্দোলনের ঝটিকা-কেন্দ্র বাংলাদেশকে বিভক্ত করে জাতীয় আন্দোলনকে বিপর্যস্ত করে দেবার অভিসন্ধিতে লর্ড কার্জন ঘোষণা করলেন বঙ্গভঙ্গ। আর তার প্রতিরোধে সারা বাংলা জুড়ে ফেটে পড়ল এক অভূতপূর্ব সংগ্রামী আন্দোলন—যে আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ যোগালেন বাণী, অরবিন্দ দিলেন অগ্নিদীক্ষা। অহিংস গণ-আন্দোলন আর সহিংস বিপ্লব-প্রয়াস হয়ে গেল একাকার। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যশক্তির নৃশংস আক্রমণ ও অত্যাচারকে তুচ্ছ করে বাংলার তরুণেরা সেই আগুনে উদ্দীপিত করে তুললো গোটা দেশকে—বিশেষ করে পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রকে। মর্লে-মিন্টো সংস্কারের প্রতারণাকে প্রত্যাখ্যান করে

১৯০৮ সালে কংগ্রেস ঘোষণা করল নতুন সংকল্প : "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনভোগী সদস্যদের মত অনুরূপ শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা।"

প্রসঙ্গত : স্মরণীয় এই সময়ে লেনিনের উক্তি : "ভারতে দেশীয় 'গোলামেরা' সম্প্রতি তাদের 'সুসভ্য' ব্রিটিশ ধনিক 'প্রভুদের' বড়ই উদ্বেগ ও অশান্তির কারণ হয়ে উঠেছে।...ভারতের সর্বহারা শ্রেণীও শ্রেণী-সচেতন ও রাজনৈতিক গণ-সংগ্রাম চালাবার মত যথেষ্ট পরিপক্কতা অর্জন করেছে।...আর তাই যখন হয়েছে, তখন ভারতে ইঙ্গ-রুশ কলাকৌশলের দিন ফুরিয়ে এসেছে।...ইউরোপের শ্রেণী-সচেতন শ্রমিক শ্রেণী এখন এশিয়ায় পেয়েছে তাদের কমরেডদের, যাদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে জোর কদমে।" ('বিশ্ব রাজনীতিতে দাহ্য বস্তুসমূহ')।

কিছু কালের মধ্যেই শুরু হয়ে গেল প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধ এবং ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভাব ঘটলো গান্ধীজীর। তিনি আহ্বান জানালেন স্বরাজ অর্জনের জন্য যুদ্ধে ব্রিটেনের হয়ে লড়তে। ওদিকে বাংলার বিপ্লবীরা আর পাঞ্জাবের বিপ্লবীরা তৎপর হয়ে উঠলেন সশস্ত্র সংঘর্ষের মাধ্যমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসান ঘটাবার জন্য। জার্মান জাহাজ 'ম্যাভেরিক'-এ করে বাঙালি বিপ্লবীদের অস্ত্রশস্ত্র আমদানির চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। সম্মুখ সমরে প্রাণ দিলেন যতীন মুখার্জী। তেমনি ব্যর্থ হল পাঞ্জাবী বিপ্লবীদের জাপানী জাহাজ 'কোমাগাটামারু'তে করে অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করার চেষ্টাও। কিন্তু ব্যর্থ হলেও এ দুটি ঘটনা দেশের তরুণদের মধ্যে সৃষ্টি করল ব্যাপক উদ্দীপনা। তারা প্রস্তুত হতে থাকলো নতুন সুযোগের জন্য। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় লেনিনের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি'র পরিচালনায় সংঘটিত হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আর তার মধ্যে আমাদের দেশের তরুণেরা পেল নতুন পথের নিশানা।

বিশ্বযুদ্ধ শেষ হ'ল ব্রিটেনের জয়লাভে। গান্ধীজীর নেতৃত্বে যুদ্ধে ব্রিটেনের সঙ্গে সহযোগিতার প্রতিদান এলো মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার, যা ছিল কংগ্রেসের বিনম্র প্রত্যাশারও অনেক কম। স্বভাবতই তা হল প্রত্যাখ্যাত। ১৯১৯ সালের শুরু থেকে সারা দেশ জুড়ে ভেঙে পড়লো বিক্ষোভ-ধর্মঘটের ঢেউ। গান্ধীজী গঠন করলেন 'সত্যাগ্রহ লিগ' ; ডাক দিলেন সত্যাগ্রহের। সেই ডাকে সাড়া দিল সারা দেশের সঙ্গে পাঞ্জাবও। অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে এক শান্তিপূর্ণ সভায় নিরস্ত্র জনগণের উপরে ব্রিগেড কম্যাণ্ডার ডায়ারের নেতৃত্বে পরিচালিত হল নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড—নৃশংসতার দিক থেকে যার তুলনা এমনকি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসেও বিরল।

১৯২০ সালে নাগপুর কংগ্রেসে গান্ধীজীর নেতৃত্বে "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন"-এর পরিবর্তে কংগ্রেসের লক্ষ্য হিসাবে সরবে ঘোষিত হল "শান্তিপূর্ণ ও বৈধ উপায়ে স্বরাজ অর্জন।" উপস্থিত বাইশ হাজার প্রতিনিধি এবং অনুপস্থিত কোটি কোটি দেশবাসীর মেজাজ অনুমান করে গান্ধীজী ঘোষণা করলেন, "আমরা ব্রিটেনের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন করতে চাই না বটে কিন্তু অন্যায় ও অমর্যাদা যদি

অব্যাহতই থাকে, তাহলে তা রক্ষা করতেও চাই না।" 'স্বরাজ' বলতে গান্ধীজী কি, বোঝাতে চান, তা অবশ্য তিনি অস্পষ্টই রাখলেন। এ সম্পর্কে জওহরলাল লিখছেন, কথাটাকে ধোঁয়াটে রেখেই তিনি ছিলেন খুশি। ১৯২১ সালের শেষ দিনটিতে আমেদাবাদ কংগ্রেসে মৌলানা হযরত মোহানী 'স্বরাজ' কথাটির সংজ্ঞা নির্ণয় করে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, "স্বরাজ হচ্ছে সমস্ত বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতা।" কিন্তু গান্ধীজীর দৃঢ় বিরোধিতার ফলে প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ইতিমধ্যে ভারতের এখানে সেখানে গড়ে উঠেছিল কমিউনিস্ট গ্রুপ এবং হযরত মোহানীও ছিলেন একজন কমিউনিস্ট।

১৯২১ সালে গান্ধীজীর আহ্বানে শুরু হ'ল অসহযোগিতা আন্দোলন। আসমুদ্র হিমাচল জুড়ে দেখা দিল অভূতপূর্ব জনজাগরণ। আন্দোলনের ব্যাপকতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদও আশ্রয় নিল ব্যাপক দমন-পীড়নের। কিন্তু এই 'যৌবন জলতরঙ্গ' রোধ করবে কে? ঢেউয়ের পড়ে ঢেউ তুলে তা কাঁপিয়ে তুললো সাম্রাজ্যবাদের ভিত। এই বুঝি ভেঙে পড়ে তার গোটা কাঠামো। এই চরম মুহূর্তে ব্রিটিশ অত্যাচারে অতিষ্ঠ চৌরিচৌরা গ্রামের কৃষকদের সহিংস প্রতি-আক্রমণে বিচলিত গান্ধীজী প্রত্যাহার করে নিলেন সেই দেশজোড়া গণ-আন্দোলন। সুভাষচন্দ্র লিখলেন, "যখন গণ-উদ্দীপনা উপনীত হয়েছে তার চরম বিন্দুতে, তখন এইভাবে আন্দোলন তুলে নেওয়া জাতীয় বিপর্যয় ছাড়া কিছু নয়।" জওহরলালের মতে, জনগণের এই রুদ্ধ আবেগেই পরে বিকৃত প্রকাশ ঘটে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায়। জেল থেকে বেরিয়ে এসে চিত্তরঞ্জন ক্ষুব্ধ কণ্ঠে মন্তব্য করেন, গান্ধীজী "তালগোল পাকিয়েছেন, ভণ্ডুল করে দিয়েছেন।"

এদিকে ব্রিটিশ শাসকদের নজরে পড়ে যে, কমিউনিস্টরা ক্রমেই শক্তি সঞ্চয় করছে এবং শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন বিস্তার করছে। রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতায় সন্ত্রস্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কমিউনিজমকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার জন্য হিংস্র ব্যগ্রতায় ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের উপরে। প্রথমে তাঁদের বিরুদ্ধে খাড়া করল কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা, পরে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা। অভিযোগ একই: ওঁরা হিংসার সাহায্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধন করে ভারতে নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে চান। কারারুদ্ধ কমিউনিস্ট নেতারা আদালতে দৃপ্ত কণ্ঠে স্বীকার করে নিলেন যে, হ্যাঁ, দরকার পড়লে তাঁরা হিংসারও আশ্রয় নেবেন কিন্তু নৈরাজ্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নয়, দেশকে স্বাধীন করার, বিদেশী শাসন ও শোষণ থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে।

১৯২৮ সালে কংগ্রেসের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল কলকাতায়—পার্ক সার্কাস ময়দানে। এই সম্মেলনে দক্ষিণপন্থী এবং বামপন্থীদের মধ্যে তীব্র পার্থক্য দেখা দেয় কংগ্রেসের লক্ষ্য সম্পর্কে। দক্ষিণপন্থীদের মতে "ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস"কে ঘোষণা করতে হবে কংগ্রেসের লক্ষ্য হিসাবে আর কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থীদের মতে "পূর্ণ স্বাধীনতা"-কে। এই দ্বিতীয় মতের সমর্থনে ৫০,০০০ শ্রমজীবী মানুষের এক বিশাল শোভাযাত্রা বেষ্টন করে ফেলে পার্ক সার্কাস ময়দান। কিন্তু গান্ধীজীর নেতৃত্বে দক্ষিণপন্থীদের বিরোধিতায় সেই

প্রস্তাব পরাস্ত হয় ১৩৫০-৯৭৩ ভোটে। যা হোক, কলকাতা কংগ্রেস থেকে ব্রিটিশ সরকারকে চরমপত্র দেওয়া হয় যে ১৯২৯ সালের ৩১ শে ডিসেম্বরের মধ্যে যদি ভারতের 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস'-এর দাবি মেনে না নেওয়া হয়, তাহলে কংগ্রেস অবতীর্ণ হবে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে—অবশ্যই অহিংস পথে।

১৯২৯ সাল পার হতে চলল। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে পাওয়া গেল না কোনও অনুকূল সাড়া। অবশেষে ঐ সালের শেষে লাহোর কংগ্রেসে ৩১ ডিসেম্বর রাত বারোটায় গৃহীত হল পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব এবং সেই সঙ্গে ঘোষিত হল, ১৯৩০ সালে ২৬শে জানুয়ারি উদ্‌যাপিত হবে 'স্বাধীনতা দিবস' হিসাবে এবং সমগ্র দেশ জুড়ে অসংখ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে কোটি কণ্ঠে উচ্চারিত হবে স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মোৎসর্গের অঙ্গীকার।

তার পর থেকে পার হয়ে গিয়েছে ছাপ্পান্নটি বছর। ইতিমধ্যে ১৯৪৭ সালে ভারত অর্জন করেছে তার দীর্ঘকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা এবং ১৯৫০ সাল থেকে ২৬ জানুয়ারি রূপান্তরিত হয়েছে প্রজাতন্ত্র দিবসে। আজ এই পুণ্য লগ্নে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি সেই অতীতের ২৬ শে জানুয়ারিকে, বরণ করি বর্তমানের ২৬ শে জানুয়ারিকে এবং সেই সঙ্গে অভিবাদন জানাই সমস্ত শহীদকে, অভিনন্দন জানাই সমগ্র স্বাধীনতা-সংগ্রামীকে, যাঁদের আত্মদান স্বার্থবলি ও দুঃখবরণের বিনিময়ে আমাদের বহু প্রজন্মের স্বপ্ন হয়েছে বাস্তব।

২৬.১.৮৬

বিড়ম্বিত নেতৃদ্বয়ের বিলম্বিত আক্ষেপ

পেশোয়ারের 'ফ্রন্টিয়ার পোস্ট' পত্রিকা তার ২৬.১১.৮৭ তারিখের সংখ্যায় জিন্না সাহেবের জীবন -সায়াহ্নে লিয়াকৎ আলি খান-এর সঙ্গে তাঁর শেষ সাক্ষাৎকারের একটি মর্মস্পর্শী বিবরণ প্রবাশ করেছে। "ক্যায়দি আজমের চিকিৎসক আমাকে বলেছিলেন"— এই শিরোনামে প্রকাশিত এই বিবরণটির লেখক উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী মোহম্মদ ইয়াহিয়া খান ; লিখেছেন জিন্নার ব্যক্তিগত চিকিৎসক কর্নেল এলেনি বক্স তাঁকে যা বলেছেন, তার ভিত্তিতে। তিনি লিখেছেন :

"জীবনের শেষ দিনগুলিতে ক্যায়দি-আজম জিন্না অনুভব করেন যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করে এবং লিয়াকৎ আলি খানকে তার প্রথম প্রধানমন্ত্রী করে তিনি মহা ভুল করেছেন। তাঁর অসুখের সময়ে প্রধানমন্ত্রী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলে, তিনি তাঁকে বলেন, "আপনি নিজেকে একজন কেউকেটা ভাবতে শুরু করেছেন। আপনি কিছুই নন। আপনি ভাবছেন, আপনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেছেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেছি আমি। কিন্তু এখন আমি নিশ্চিত যে আমি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল করেছি।" তিনি আরও বলেন, "যদি আমি এখন সুযোগ পাই, তা হলে আমি দিল্লি যাব এবং জহরলালকে বলব অতীতের পরস্পরের বোকামোগুলো ভুলে যেতে এবং আবার পরস্পরের বন্ধু হতে।"

তিনি আরও লিখেছেন, কর্নেল বক্স বলেন, "লিয়াকৎ আলি খান জিন্নাকে জিজ্ঞাসা করেন, কেমন আছেন?" সঙ্গে সঙ্গে জিন্না ফেটে পড়েন। ক্যায়দি আজম আবেগে কাঁপতে থাকেন এবং বিছানার চাদরের মত সাদা হয়ে যান। কর্নেল বক্স তখন লিয়াকৎ আলি খানকে বলেন, "রোগীর পক্ষে এই উত্তেজনা ভাল না, বরং আপনি এখন আসুন।" এতটুকুও বিচলিত না হয়ে, বেরিয়ে যেতে যেতে তিনি সজোরে হাসলেন এবং বললেন, "বুড়ো লোকটা এতদিনে তাঁর ভুল বুঝেছেন।" (টেলিগ্রাফ, ২৮.১১.৮৭)

উপরে বর্ণিত দৃশ্যটি বড়ই করুণ। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট ক্যায়দি আজম জিন্না মৃত্যুরোগে ক্লিষ্ট অবস্থায়, নিজের মন্ত্রীমণ্ডলীর অনাদরে ও অবেহেলায়, কার্যতঃ নির্বাসিত জীবন কাটাচ্ছেন দূর বালুচিস্তানের এক দুর্গম জনপদে, জিয়ারাত-এ। এবং ভাবছেন তাঁর অতীত জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটির কথা—পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কথা। আর সেই সঙ্গে ভাবছেন সেরে উঠলে, সুযোগ পেলে, সেই ভুল সংশোধনের কথা।... কিন্তু তার চেয়েও আরও ঢের বেশি করুণ এই যে, তিনি আর সেরে ওঠেননি ; সুযোগ পাননি সেই ভুল সংশোধনের সেই ভুলের মাশুল গুনতে হচ্ছে কেবল ভারতেরই নয়, পাকিস্তানেরও—এবং সেইসঙ্গে তাঁর মরণোত্তর নবজাতক বাংলাদেশেরও—জনগণকে। এবং ভুগতে হচ্ছে ধর্মনির্বিশেষে।

ধর্মের ভিত্তিতে দ্বি-জাতি তত্ত্ব যে কত ভুল ছিল, তা প্রকট হতে শুরু করেছিল
পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম উচ্ছ্বাস কেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই। ধর্মের দিক থেকে প্রায়
অভিন্ন হলেও, জাতিসত্তার দিক থেকে, চলতি কথায় জাতির দিক থেকে, পাকিস্তানীরা যে
বিভিন্ন, তা ফুটে উঠতে লাগলো অচিরেই। বাঙালি, সিন্ধি, পাঠান, বালুচ প্রভৃতি
জাতিসত্তা ক্রমেই বেশি বেশি করে ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকলো পাঞ্জাবি আধিপত্যের
বিরুদ্ধে, উত্থাপন করতে থাকলো নিজ নিজ জাতিসত্তাগত বিশেষ বিশেষ দাবি।

কালক্রমে এরই পরিণতি ঘটলো পাঞ্জাবি আধিপত্যের বিরুদ্ধে জাতিগত আত্মপ্রতিষ্ঠার
সংগ্রামে, যার ফলে পাকিস্তান হল দ্বিধা-বিভক্ত, ভূমিষ্ঠ হল নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র 'বাংলাদেশ'।
কিন্তু সেখানেই শেষ নয় ; বিভিন্ন মাত্রার, বিভিন্ন রূপের, সংগ্রাম চলছে সিন্ধু, বালুচিস্তান
এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও। সিন্ধু-নেতা জি এম সৈয়দ ঘোষণা করেছেন,
"সিন্ধুকে যদি বাঁচাতে হয়, তবে মারতে হবে পাকিস্তানকে।" পাকিস্তানের সেনাবাহিনী
এবং উচ্চতর আমলাতন্ত্র থেকে বালুচরা হয়েছে নির্বাসিত। উত্তর-পশ্চিম সীমন্ত প্রদেশের
নেতা ওয়ালি খান হুমকি দিয়েছেন, "একমাত্র অ্যাটম বোমা ছাড়া বাকি সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র
তৈরি করার ক্ষমতাই আমাদের আছে।"

এই পরিস্থিতির মুখে পড়েই পাকিস্তানের পাঞ্জাবি ক্ষমতাধারীরা উঠে পড়ে লেগে
গিয়েছেন মাত্রাহীন অস্ত্রসজ্জায়, এমনকি পারমাণবিক বোমা তৈরি করার কর্মকাণ্ডেও।
এই বেপরোয়া অস্ত্রসজ্জার একটি কারন যদি হয় ভারত থেকে আক্রমণের ভয়, তা হলে
আর একটি কারণ হল ও:দশে বিদ্রোহের আশংকা। ঘরপোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘে ভয়
পায়। বাংলাদেশ থেকে তাড়া খাবার পরে পাকিস্তানের শাসকবর্গের ভয় এখন অন্যান্য
প্রদেশ থেকে।

অস্ত্রসজ্জার খাতে এই অপরিমেয় ব্যয়ের ফলে বলি দিতে হচ্ছে দেশগঠনমূলক,
জনকল্যাণমূলক বিবিধ কর্মকাণ্ড। ফলে দেশে ব্যাপ্তি লাভ করছে দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও
অস্বাস্থ্য। এতো গেল একদিক। আর এক দিক হল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের উপরে ক্রমবর্ধমান
নির্ভরতা ; তা যদি আরও বৃদ্ধি পায়, তাহলে পাকিস্তান পর্যবসিত হবে একটি নয়া-
উপনিবেশে। কী লাভ হল তা হলে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ?—ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য,
অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য—এবং সর্বোপরি মার্কিন পরাধীনতা ? এর থেকে ঢের ঢের ভালো হত না
কি যদি জিন্না লেগে থাকতেন তাঁর পাকিস্তান দাবির আগেকার দাবিতেই ?—ভারতবর্ষের
মধ্যে থেকে বিভিন্ন রাজ্যের হাতে আরও বেশি ক্ষমতা এবং অর্থ-সংস্থানের সাংবিধানিক
রক্ষাকবচের দাবিতে ? উল্লেখ্য যে, এই দাবিতে সংগ্রাম করলে তিনি সমর্থন পেতেন
কেবল বামপন্থী শক্তিগুলিরই নয়, কংগ্রেসেরও বিভিন্ন অংশের।

সত্যি জিন্না সাহেব, বড় ভুল করেছেন। কিন্তু তা বুঝেছেন যখন, তখন বড় বেশি
দেরি হয়ে গিয়েছে।

কৃতকর্মের জন্য আক্ষেপ কেবল জিন্নাকে করতে হয়নি, করতে হয়েছে গান্ধীজীকেও।

জিন্না আক্ষেপ করেছেন পাকিস্তান গঠন এবং লিয়াকৎ আলি খানের আচরণের জন্য আর গান্ধীজী আক্ষেপ করেছেন পাকিস্তান-গঠনে নেহেরু ও প্যাটেলের সম্মতি এবং তাঁর প্রতি আচরণের জন্য। বস্তুতঃ পক্ষে, গড্‌সের গুলিতে নিহত হবার অনেক আগেই গান্ধীজীর হৃদয় থেকে রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছিল তাঁদের দুজনের আচরণে। একথা সুপরিজ্ঞাত যে, গান্ধীজীর স্বপ্নের ভারতবর্ষ ছিল এক ও অখণ্ড ভারতবর্ষ। তাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভারত-বিভাগের দাবি প্রত্যাখ্যান করে, তিনি ঘোষণা করেছিলেন, "ভারতবর্ষকে যদি ভাগ করতে হয়, তাহলে তা করতে হবে আমার মৃতদেহের উপরে।" আর তাঁর এই স্বপ্নের ভারতবর্ষকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য তিনি সবচেয়ে বেশি নির্ভর করেছিলেন জওহর এবং বল্লভ ভাইয়ের উপরে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের প্ররোচনায় সৃষ্ট ভারত-জোড়া ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার অবসান ঘটিয়ে শান্তি স্থাপনের একমাত্র পন্থা হিসেবে দেশ-বিভাগের মাউন্টব্যাটেন-প্রস্তাব গান্ধীজীর অগোচরেই মেনে নিলেন জওহরলাল এবং বল্লভভাই। এই সংবাদ যখন পৌঁছলো গান্ধীজীর কাছে, তখন কী মর্মান্তিক আঘাত তিনি পেয়েছিলেন, তা সহজেই অনুমেয়। এই সম্পর্কে গান্ধীজীর ব্যক্তিগত সচিব পিয়ারিলাল লিখেছেন ঃ

"১লা জুন (১৯৪৭), ঘড়ির কাঁটা ভুল করে দেখে গান্ধীজী তাঁর অভ্যস্ত সময়ের আগে উঠে পড়েন। প্রার্থনার তখনও আধ ঘণ্টা বাকি; তিনি শুয়ে শুয়ে আপন মনে ফিসফিস করতে থাকেন। আমার সাধনার বিশুদ্ধতার এখন পরীক্ষার সময়। আজ আমি নিঃসঙ্গ। এমনকি সর্দার (বল্লভভাই প্যাটেল) এবং জওহরলালও ভাবছেন পরিস্থিতি সম্পর্কে আমার বিচার ভ্রান্ত, এবং দেশ-বিভাগ মেনে নিলে শান্তি নিশ্চয়ই ফিরে আসবে।...আমি ভাইসরয়কে বলেছি, যদি দেশ-বিভাগ করতেই হয়, তা ব্রিটিশ হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বা ব্রিটিশ শাসনের অধীনে করা হবে না। কিন্তু ওঁরা (প্যাটেল এবং নেহেরু) আমার একথা পছন্দ করেননি।...তাঁদের সন্দেহ, বয়সের দরুন আমার বিচারশক্তি হয়ত কমে গিয়েছে। যাই হোক, আমি যা ঠিক মনে করি, তাই বলব।...আমি বুঝতে পারছি, ভুল পথে পা বাড়ানো হচ্ছে। আমরা হয়ত পূর্ণ পরিণাম এখনই ভোগ করব না, কিন্তু আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, এত মূল্য দিয়ে যে-স্বাধীনতা লাভ করা হচ্ছে, তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার।" (Mahatma Gandhi : The Last Phase : Vol-II, pp. 210-11)

সন্দেহ নেই, প্যাটেল এবং নেহরুই ভুল করেছিলেন, গান্ধীজী নন। দেশ-বিভাগের ফলে শান্তি আসেনি; আজও ঘটছে ভ্রাতৃঘাতী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। গান্ধীজীর আশংকাই ঠিক হয়েছে, স্বাধীনতার ভবিষ্যৎ হয়েছে অন্ধকার। একবারের দেশ-বিভাগ খুলে দিয়েছে আরও বিভাগের সম্ভাবনা; সারা দেশ জুড়ে প্রাদুর্ভাব ঘটেছে আঞ্চলিকতাবাদী, সাম্প্রদায়িকতাবাদী, বিচ্ছিন্নতাপ্রবণ বিবিধ শক্তির। অন্যদিকে, প্রতিরক্ষা ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা খাতে উত্তরোত্তর ব্যয়বৃদ্ধির কারণে দেশ গঠন ও জনকল্যাণমূলক সমগ্র ক্ষেত্রে ঘটছে বিপর্যয় এবং দেশ জর্জরিত হচ্ছে বিদেশী ঋণে; বিপন্ন হচ্ছে তার সার্বভৌমত্ব।

এই রকমই ঘটে। যাঁকে দিয়ে যতকাল নিজের আশু শ্রেণী-স্বার্থ সাধন করা যায়, ততকাল তাঁকে সর্বময় নেতৃত্বে রেখে ধনিক শ্রেণী তাঁকে ভূষিত করে সর্ববিধ মহিমায় ; কিন্তু যখনই তাঁর সেই ভূমিকা নিঃশেষিত হয়ে যায়, তখনই তাঁকে পরিহার করে, তাঁর জায়গায় অধিষ্ঠিত করে নতুন নেতৃত্বকে। এই ব্যবহারই জিন্নার প্রতি করেছে পাকিস্তানের উদীয়মান ধনিক শ্রেণী ; এই ব্যবহারই গান্ধীজীর প্রতি করেছে ভারতের আশু ক্ষমতা-লোলুপ ধনিক শ্রেণী। ওখানে বরণ করেছে লিয়াকৎ আলি খানকে, এখানে নেহরু-প্যাটেল নেতৃত্বকে।

সাম্রাজ্যবাদের প্ররোচনায় ও সহায়তায় অবিভক্ত ভারতের ধনিক শ্রেণীর দুই অংশের—প্রতিষ্ঠিত অংশ (প্রধানত হিন্দু-পার্শি) এবং উদীয়মান অংশের (প্রধানতঃ মুসলিম)—এই ভারত-বিভাগের চুক্তিকে ব্যর্থ করে দিতে পারত কেবল শ্রমিক শ্রেণী এবং সেই সঙ্গে কৃষক-মধ্যবিত্ত এবং সাধারণভাবে দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক জনগণ, এক কথায় বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তখন তারা নিজেরাই সংগঠন ও সংহতির দিক থেকে ছিল হীনবল এবং রাজনীতির দিক থেকে বিভ্রান্ত ও বিভক্ত।

কিন্তু চার দশকের অভিজ্ঞতার পরে আজ কি সম্ভব নয় অতীতের এই ভুল যথাসম্ভব সংশোধন করে নতুন পথে পা বাড়াবার ? "যথাসম্ভব" কথাটি আমি ভেবে-চিন্তেই ব্যবহার করেছি, কেননা আমি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অবহিত যে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে বিভক্ত এই উপমহাদেশকে আর সম্ভব নয় চার দশক আগেকার অবিভক্ত ভারতবর্ষে ফিরিয়ে নেওয়া। কিন্তু আমরা কি আন্দোলন শুরু করতে পারি না এমন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার দিকে পা বাড়াবার দাবিতে, যে-ব্যবস্থায় তিনটি রাষ্ট্রই তাদের নিজ নিজ স্বাধীনতা, সার্বভৌমতা ও সম-মর্যাদা বজায় রেখে স্বেচ্ছায় সম্মিলিত হতে পারে একটি মৈত্রীমূলক বোঝাপড়ায় ? একটি রাষ্ট্র-সমবায়ে (CONFEDERATION-এ) ? 'স্যাফ গেমস' (SAF GAMES) করতে পারি ; 'সার্ক সম্মেলন' (SAARC) করতে পারি, কিন্তু পারিনা তিনটি রাষ্ট্রের একটি সমবায় গড়তে ? যদি পারি, তা হলে খুলে যাবে শান্তি, সমৃদ্ধি ও প্রগতির এক নতুন দিগন্ত ; আমাদের উত্তরাধিকারীরা পাবে এক ভাস্বর ভবিষ্যতের সুনিশ্চিত অধিকার।

১.১২.৮৭

এক যাত্রা, পৃথক ফল

১৯৮৭ সাল। উদ্‌যাপিত হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতার চল্লিশতম বার্ষিকী এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে নভেম্বর বিপ্লবের সত্তরতম বার্ষিকী। এই উপলক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ভারত উৎসব এবং ভারতে, সোভিয়েত উৎসব। উৎসব বললে কম বলা হয়, বলা উচিত 'মহোৎসব'।

এই উপলক্ষে একটু বেসুরো হলেও বোধহয় একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হবে না দুটি দেশের মুক্তি সংগ্রাম নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা—যার পরিণতিতে ভারত অর্জন করেছে তার রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা এবং রাশিয়া সফল করেছে তার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। স্মরণীয় যে, দুটি দেশে মুক্তি সংগ্রামের নব পর্যায় শুরু হয়েছিল প্রায় একই সময়ে, কিন্তু শেষ হয় এক দেশে তিন দশক আগে, অন্য দেশে তিন দশক পরে। কেবল তাই নয়, প্রথম দেশটিতে যেখানে করায়ত্ত হয়েছে কেবল জাতীয় মুক্তি নয়, সেই সঙ্গে সামাজিক মুক্তিও, দ্বিতীয় দেশটিতে তখন অধিগত হয়েছে কেবল জাতীয় মুক্তি; সামাজিক মুক্তি এখনও সুদূর-পরাহত।

নব পর্যায়ের মুক্তি আন্দোলনের সূচনা উভয় দেশেই লক্ষ্য করা যায় গত শতকের শেষাশেষি। রাশিয়ায় লক্ষ্য ছিল জারতন্ত্র তথা রুশ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে মুক্তি অর্জন আর ভারতের, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে। ওখানে প্রধান সংগঠন ছিল 'সোস্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবর পার্টি' যা পরবর্তী কালে রূপান্তরিত হয় 'কমিউনিস্ট পার্টি'তে এখানে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস,' যা সংক্ষেপে পরিচিতি লাভ করছে শুধু 'কংগ্রেস' নামে।

১৯০৫ সাল দুটি দেশের পক্ষেই একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বছর। রাশিয়ায় লেনিনের নেতৃত্বে সংঘটিত হয় প্রথম বিপ্লব। লেনিন ডাক দেন শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে জারতন্ত্রের উচ্ছেদসাধন করে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার এবং এইভাবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ প্রস্তুত করার জন্য। কিন্তু জাপ-সমর্থনপুষ্ট জারতন্ত্রের প্রত্যাঘাতে ব্যর্থ হয় সেই বিপ্লব। অন্য দিকে এখানে বঙ্গভঙ্গের প্রতিরোধে অরবিন্দ প্রমুখ নেতাদের নেতৃত্বে ফেটে পড়ে সংগ্রামী বিস্ফোরণ। পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, বঙ্গভঙ্গ রদ হয়।

এর পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ—একদিকে ব্রিটিশ-নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদ, আর অন্যদিকে জার্মান-নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদ। লেনিন বললেন, এই যুদ্ধে যে-পক্ষই জিতুক, তা-ই হবে সাম্রাজ্যবাদের জয়। তাই শ্রমিক শ্রেণী যুদ্ধ করবে না কোনও পক্ষের হয়েই। তিনি আহ্বান জানালেন গৃহযুদ্ধের—নিজ নিজ দেশের শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ক্ষমতা দখলের। ভারতে তখন কংগ্রেসের নেতৃত্বে এসেছেন গান্ধীজী। তিনি বললেন, ইংরেজ বিপন্ন; তার এই বিপদের সুযোগ নিয়ে এখানে কোনও আন্দোলন শুরু করা হবে অন্যায়। যুদ্ধের পরে 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস' লাভের আশ্বাসে তিনি নিজে দায়িত্ব নিলেন ব্রিটেনের হয়ে সৈন্য সংগ্রহের।

লেনিনের রণনীতির ফলে রাশিয়ায় শুরু হ'ল শ্রমিক-কৃষক-সৈনিক অভ্যুত্থান। তার প্রথম তরঙ্গাভিঘাতে ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পতন ঘটলো জারতন্ত্রের, সফল হল গণতান্ত্রিক বিপ্লব, প্রতিষ্ঠা ঘটলো বুর্জোয়া নেতৃত্বাধীন প্রজাতন্ত্রের। লেনিন বললেন, "গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে নেই কোনও চীনের প্রাচীর।" আহ্বান জানালেন গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে এগিয়ে নিয়ে যাবার। অক্টোবর মাসে সফল হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। প্রতিষ্ঠিত হল সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। শুরু হল সমাজতন্ত্রে উত্তরণের বহুমুখী কর্মকাণ্ড। ১৯২৪-এ মৃত্যু হল লেনিনের। বহিরাক্রমণ ও গৃহযুদ্ধের কঠিন পরিস্থিতিতে লেনিনের আরব্ধ কর্মকাণ্ড এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব পড়ল স্তালিনের কাঁধে।

এদিকে যুদ্ধ শেষে ব্রিটেনের জয় হলেও, গান্ধীজী পেলেন না ভারতের জন্য 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস'। প্রতিদানে এলো 'জালিয়ানওয়ালাবাগ'। ইতিমধ্যে রুশ বিপ্লবের ঢেউ এসে লেগেছে ভারতেও। শুরু হয়েছে ধর্মঘটের তরঙ্গ বিক্ষোভ। পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি মুখে নিয়ে কংগ্রেসের মঞ্চে আবির্ভাব ঘটলো কমিউনিস্ট পার্টির। বামপন্থীদের মুখে ধ্বনিত হল সংগ্রামের স্লোগান। ১৯২১ সালে গান্ধীজী ডাক দিলেন অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের। সারা দেশ জুড়ে শুরু হল জনজাগরণ; সেই উদ্দীপ্ত গণ-অভ্যুত্থানের মুখে যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ দিশাহারা, তখন চৌরিচোরায় ব্রিটিশ পুলিশের হাতে নিহত কৃষক আন্দোলনকারীদের আহত সহযোদ্ধাদের প্রতিহিংসায় বিচলিত গান্ধীজী প্রত্যাহার করে নিলেন সেই আন্দোলন। জনগণের পুঞ্জিত আবেগ অভিব্যক্তি পেল ভ্রাতৃঘাতী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়।

ঐ বিশের দশকের শেষে গান্ধীজী মেনে নিলেন বামপন্থীদের 'পূর্ণ স্বাধীনতা' দাবির প্রস্তাব। সেই প্রস্তাব ঔদ্ধত্যভরে প্রত্যাখ্যান করল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। ১৯৩১-এ গান্ধীজী ডাক দিলেন আইন অমান্য আন্দোলনের। সেই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল আসমুদ্র হিমাচল, কেঁপে উঠলো সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল। কিন্তু আবার তা গুটিয়ে নিলেন গান্ধীজী; আপস করলেন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে—স্বাক্ষরিত হল 'গান্ধী আরুইন চুক্তি'। ভারত পেল ১৯৩৫ সালের 'ভারত শাসন আইন' অনুযায়ী প্রাদেশিক স্তরে সীমিত স্বায়ত্ত শাসনের ক্ষমতা। কংগ্রেসের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করল সুস্পষ্টভাবে দু'টি ধারা—দক্ষিণপন্থী এবং বামপন্থী। গান্ধী-নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্রকে সামনে রেখে সমবেত হতে থাকলেন কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থীরা। তাদের মিলিত উদ্যোগে, গান্ধীজীর মনোনীত প্রার্থীকে পরাস্ত করে, কংগ্রেসের সভাপতি-পদে সুভাষচন্দ্র পুনর্নির্বাচিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সুকৌশল প্রত্যাঘাত করলেন দক্ষিণপন্থীরা। বামপন্থীরা হয়ে পড়লেন ছত্রভঙ্গ। কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত সুভাষচন্দ্র দেশত্যাগ করে আত্মনিয়োগ করলেন বিদেশে সৈন্যদল গঠন এবং তার সাহায্যে ভারতের মুক্তি অর্জনে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিশ্বের তথা ভারতের পরিস্থিতিতে ঘটিয়ে দিল গুণগত পরিবর্তন।

জার্মান-জাপ ফ্যাসিবাদের পরাজয়, ব্রিটিশ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের শক্তিক্ষয় এবং সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বিজয় ও বিস্তার স্বাধীনতা-সংগ্রামের পক্ষে সৃষ্টি করল সারা বিশ্বে এক অভূতপূর্ব অনুকূল পরিবেশ। এদিকে দেশের সীমান্তে নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজের শৌর্যগাথায় রোমাঞ্চিত, আগস্ট আন্দোলনের অবদমিত উত্তাপে উদ্দীপিত এই ভারতে, যুদ্ধান্তে কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থী শক্তির নেতৃত্বে, বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হ'ল জঙ্গী আন্দোলনের আগ্নেয় আত্মপ্রকাশ—কোথাও কোথাও তা ধারণ করলো সশস্ত্র রূপ। নৌ, স্থল ও বিমান বাহিনীতে দেখা দিল বিদ্রোহ।—এই পটভূমিকায় আপস-আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন কারামুক্ত গান্ধী-নেতৃত্ব এবং ভীত-সন্ত্রস্ত সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি-বর্গ, যার ফলে আপসে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হ'ল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে কংগ্রেসি রামরাজ্যবাদীদের হাতে। স্বাধীনতা অর্জিত হ'ল বটে কিন্তু অসম্পূর্ণ থেকে গেল গণতান্ত্রিক বিপ্লব। দুঃখের বিষয়, এই চল্লিশ বছরেও সম্পূর্ণ হল না সেই অসম্পূর্ণতা।

তাহলে, এই হল যথাসম্ভব সংক্ষেপে রাশিয়া এবং ভারতে মুক্তি-সাধনার এতাবৎ কালের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত। উভয় দেশেই যাত্রা শুরু হয়েছিল মোটামুটি একই অবস্থান থেকে, কিন্তু যাত্রাশেষে ফল হয়েছে ভিন্ন। যেখানে সে দেশ থেকে নির্বাসিত হয়েছে বুভুক্ষা, বেকারি ও নিরক্ষরতা, সেখানে এদেশে আজও জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ রয়েছে দারিদ্র্যসীমার নিচে। এবং বেকারি ও নিরক্ষরতা নিত্য বর্ধমান। যেখানে সে দেশে অবসান ঘটেছে সাম্প্রদায়িক ও সামাজিক ভেদাভেদের, সেখানে আজও এদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে, একই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন অংশের মধ্যে, বিদ্বেষ ও বিরোধ ধূমায়মান। যেখানে রাশিয়া পরিবর্তিত হয়েছে সমস্ত জাতিসত্তার সানন্দ মিলনের ভিত্তিতে অখণ্ড ও অবিভাজ্য সোভিয়েত ইউনিয়নে, সেখানে ভারতবর্ষ কেবল খণ্ডিতই হয়নি, এই খণ্ডিত ভারতও আবার বিপন্ন হচ্ছে আরও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিসমূহের কুটিল তৎপরতায়।

একই যাত্রায় এই যে পৃথক ফল, এর কারণ খুঁজতে হবে এক দিকে লেনিন-নেতৃত্ব এবং অন্য দিকে গান্ধী-নেতৃত্বের মধ্যে পার্থক্যের মধ্যে। লেনিন যখন জার-সাম্রাজ্যবাদের কারাগারে আবদ্ধ জাতিসত্তাসমূহের মুক্তির সংগ্রামের সঙ্গে সংযুক্ত করেছিলেন সামাজিক মুক্তির সংগ্রাম এবং ধাপে ধাপে এগিয়ে গিয়েছিলেন গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যে, তখন গান্ধীজী সচেষ্ট ছিলেন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সামাজিক মুক্তি আন্দোলন থেকে বিযুক্ত করে রাখতে। তাই যখনই জাতীয় আন্দোলন তাঁর নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে এগিয়ে গিয়েছে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে, তখনই তিনি তার গতিরোধ করেছেন এবং আপস করেছেন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে। একই ঘটনা ঘটেছে ১৯২১-এ, ১৯৩১-এ এবং ১৯৪৭-এ। তাই আজ যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন পুষ্ট হচ্ছে বিপ্লবের অমৃতরসে, ভারত তখন ক্লিষ্ট হচ্ছে আপসের বিষক্রিয়ায়। উৎসবের প্রাঙ্গণে তাই আজ আকুল জিজ্ঞাসা : কবে আমার দেশ মুক্তি পাবে এই বিষক্রিয়া থেকে? কবে সে উত্তীর্ণ হবে গণতন্ত্রের সোপান বেয়ে সমাজতন্ত্রের সূর্যতোরণে?

৮.১২.৮৭

সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের প্রথম আহ্বান

ঘটনাটা বিস্মৃতপ্রায় হলেও ঐতিহাসিক যে, এ দেশে স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের জন্য প্রথম আহ্বান ঘোষিত হয়েছিল নবজাত সর্বভারতীয় শ্রমিক সংগঠনের মঞ্চ থেকে এবং এই ঘোষণাকারীদের অন্যতম ছিলেন সি এফ এণ্ড্রুজ সাহেব যিনি এ দেশকে গ্রহণ করেছিলেন কেবল তাঁর কর্মক্ষেত্র বলেই নয়, তাঁর মর্মক্ষেত্র বলেও। অনেকেই জানেন রবীন্দ্রানুরাগী, শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক, শিক্ষাব্রতী, সেবাব্রতী, দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের নানা পরিচয়; কিন্তু ক'জনে জানেন যে এ দেশের প্রথম সর্ব-ভারতীয় শ্রমিক সংগঠন 'অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস'-এর তিনি কেবল অন্যতম সহ-সভাপতিই ছিলেন না, সেই সঙ্গে ছিলেন সংগ্রামী শ্রমিকদের সক্রিয় সহযোগীও! তবে সে কথা এখন থাক। আপাততঃ আমি এখানে উপস্থিত করব কেবল উল্লিখিত সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার একটি অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং সেই সঙ্গে তার প্রথম সম্মেলনের প্রচারিত ইশ্‌তাহারের একটি সংক্ষেপিত বিবৃতি যাতে ঘোষিত হয়েছিল শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি কেবল স্বাধীনতার জন্য নয়, সমাজতন্ত্রের জন্যও সংগ্রামের প্রথম আহ্বান।

ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষে ১৯২০ সালের অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় অর্ধটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ঐ বছরের অক্টোবর মাসের ১৭ তারিখে বিদেশে—তাসখন্দে প্রতিষ্ঠিত হয়, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এবং ৩১ তারিখে স্বদেশে—বোম্বাইয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় 'সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস'। যদিও দু'টি ঘটনা যাঁরা ঘটিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কোন সম্পর্ক ছিল না, তবু একই আন্তর্জাতিক পরিবেশ এবং জাতীয় পরিস্থিতি থেকেই যে তাঁদের উদ্ভব, তা অনস্বীকার্য।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রক্রিয়ায় ও পরিণতিতে, বিশেষ করে রুশ বিপ্লবের সাফল্যে, একদিকে যেমন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে, অন্যদিকে তেমন শ্রমিক আন্দোলনে আসে প্রবল জোয়ার। আমাদের দেশেও আন্দোলনের এই দ্বিবেণী ধারায় আত্মপ্রকাশ করে নতুন প্লাবন। ইতিমধ্যে দেশে শ্রমিকশ্রেণী কেবল সংখ্যাগত ভাবেই বৃদ্ধি পায়নি, গুণগতভাবেও বৃদ্ধি পেয়েছে। যুদ্ধোত্তর বছরগুলিতে, বিশেষ করে ১৯১৮ থেকে ১৯২০ সালে, গোটা দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে—বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলকাতা, কানপুর ইত্যাদি শিল্পাঞ্চলগুলিতে ধর্মঘটের পরে ধর্মঘট ফেটে পড়ে। "এত ধর্মঘট কখনো দেখেনি কেউ।" প্রয়োজন অনুভূত হয় এই খণ্ড খণ্ড আন্দোলনগুলিকে একটি সূত্রে অখণ্ড সূত্রে, বেঁধে দেবার, একটি সর্ব-ভারতীয় সংগঠনের মধ্যে সংগঠিত করার। এই উদ্দেশ্যে ১৯২০ সালের জুলাই মাসে বোম্বাইয়ের প্যারেলে এক সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয় একটি 'সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠার। আরও স্থির হয় যে লালা লাজপৎ রায় হবেন এই সংগঠনের সভাপতি এবং বাল গঙ্গাধর তিলক, সি এফ এণ্ড্রুজ, জোসেফ ব্যাপটিস্টা, এস এ ব্রেলভি এবং শ্রীমতী বেসান্ত সহ-সভাপতি, সম্পাদক হবেন দেওয়ান চমনলাল।

লক্ষণীয় যে এঁরা সকলেই জাতীয়তাবাদী বা মানবতাবাদী, কেউই কমিউনিস্ট নন। তবে এই প্রসঙ্গে তৎকালীন ভারত সরকারের ডিরেক্টর অব সেণ্ট্রাল ইন্টালিজেন্স' সিসিল কে'র সাপ্তাহিক গোপন রিপোর্টে যে তথ্য পাওয়া যায়, তা থেকে প্রকাশ পায় যে বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, প্রবাসী ভারতীয় কমিউনিস্ট নেতা শাপুরজী সাকলাৎওয়ালার এই ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সক্রিয়, যদিও নেপথ্য, ভূমিকা ছিল। অবশেষে এই বছরেই ৩১ অক্টোবর বোম্বাইয়ে সারা ভারতের ১০৬টি ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে প্রতিনিধির অংশগ্রহণে শুরু হয় ভারতের প্রথম সর্ব-ভারতীয় ট্রেড-ইউনিয়ন সম্মেলন এবং প্রতিষ্ঠিত হয় 'অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস'। ইতিমধ্যে তিলকের তিরোধান ঘটায়, তিনি ছাড়া বাকি সকলে যথাক্রমে নির্বাচিত হন উল্লিখিত পদগুলিতে।

এই সম্মেলন সদ্য-প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষরে ভারতের শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে যে ইশ্‌তাহারটি প্রচার করা হয়, সেটি উপস্থিত করার আগে আমি সম্মেলনের সভাপতি লালা লাজপৎ রায়ের ভাষণের কয়েকটি অংশ এখানে পাঠকদের উপহার দিতে চাই। এই অংশগুলি থেকে বোঝা যাবে ইউরোপ এবং আমেরিকায় দীর্ঘকাল অবস্থান করার ফলে তিনি কেবল সমকালীন ঘটনাগুলি সম্পর্কেই অবহিত ছিলেন না, মার্কসবাদী ধ্যান-ধারণা, লেনিনের চিন্তা ও কর্ম সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন এবং জাতীয়তাবাদী হওয়া সত্ত্বেও তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

লালাজী তাঁর বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, "যুদ্ধবাদ আর সাম্রাজ্যবাদ হ'ল পুঁজিবাদের যমজ সন্তান; এগুলি তিনের মধ্যে এক এবং একের মধ্যে তিন। এগুলির ছায়া, ফল, বাকল সবই বিষাক্ত; সম্প্রতি এগুলির একটি প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়েছে আর সেই প্রতিষেধকটি হ'ল সংগঠিত শ্রমিক।" ইউরোপের শ্রমিকেরা কিভাবে তাদের ভোটের অধিকার আদায় করে নিয়েছে, তা বর্ণনা করার পরে তিনি বলেন, "তা ছাড়াও ইউরোপের শ্রমিকের আছে আরও একটি হাতিয়ার—প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। সভার শীর্ষে আছে রুশ শ্রমিক, যার লক্ষ্য শ্রেণীর একনায়ত্ব প্রতিষ্ঠা।...ভারতে আমরা এখনও রয়েছি প্রথম পর্যায়ে।" সেই সঙ্গে তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, "ভারতে এমন কেউ নেই যিনি বিশ্বাস করেন যে ইউরোপীয় রুশীয় শ্রমিকের মন আজকের ভারতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। যদি কেউ থাকেন, তাহলে আমি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেব বেলা কুন-এর কাছে লেনিনের বাণীর কথা, যেখানে তিনি তাঁকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন হাঙ্গেরির ক্ষেত্রে অকালে রুশীয় মান প্রয়োগ করার বিরুদ্ধে।"

এবারে আসা যাক ইশ্‌তাহারটিতে, যার সংক্ষেপিত বয়ানটি নিম্নরূপ:

"ভারতের শ্রমিকবৃন্দ!

সময় এসেছে আপনাদের দেশের ভাগ্য-নিয়ন্তা হিসাবে আপনাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার। জাতীয় জীবনের ধারা থেকে আপনারা দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না।

…জনসংখ্যার বিপুল সমষ্টি আপনারা। আপনাদের দেশের রাজনীতির দাবা খেলার প্রত্যেকটি চাল, আর্থিক ও অর্থনৈতিক প্রত্যেকটি বন্দোবস্ত অন্য যেকোন শ্রেণীর চেয়ে বেশি স্পর্শ করে আপনাদেরকে। আপনাদের সচেতন হতে হবে আপনাদের দায়িত্ব সম্পর্কে, অবহিত হতে হবে আপনাদের অধিকার সম্পর্কে। প্রস্তুত হতে হবে নিজেদের ভাগ্য জয় করে নিতে।

"ভারতের শ্রমিকবৃন্দ!

…আসামের চা-বাগিচার ক্রীতদাসদের দিকে তাকান; তারা এখন মরীয়া। সরকারি আইনে যে দৈনিক তিন আনা মজুরি ধার্য রয়েছে, তাদের আসল মজুরি তার চেয়েও কম। প্রায়শঃই তারা পাশবিক আচরণের বলি, যাদের চাবুকের তলায় কাজ করতে হয় সীমাহীন সময় ধরে। …আমরা আপনাদের ডেকে বলছি এই শোষণের স্বরূপ উপলব্ধি করতে এবং প্রত্যেক ইউনিয়ন থেকে বিশেষ চাঁদা তুলে শ্রী সি এফ এণ্ড্রুজের কাছে যথাসাধ্য সাহায্য পাঠাতে, যিনি চাঁদপুরে এই অর্ধ-ক্রীতদাসদের হয়ে সংগ্রাম করছেন।

"ভারতের শ্রমিকবৃন্দ!

এই পৃথিবীতে আপনাদের সকলের উত্তরাধিকার। এটা পেশাদার রাজনীতিক, সিমলার আমলাতন্ত্রী বা মিল-মালিক ধনপতিদের জন্য সংরক্ষিত নয়। যখন আপনাদের দেশের নেতারা স্বরাজের দাবি করেন. তখন তাঁদের বাধ্য করবেন আপনাদেরকেও হিসাবের মধ্যে ধরতে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা আপনাদের কাছে মূল্যহীন। সুতরাং জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনকে আপনারা উপেক্ষা করতে পারেন না। আপনারা এই আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই অন্দোলনকে উপেক্ষা করার মানে আপনাদের নিজেদের মুক্তি-আন্দোলনকে বিপন্ন করা।

"ভারতের শ্রমিকবৃন্দ!

আপনাদের পক্ষে কেবল একটি কাজ করার আছে। আপনাদের অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আপনাদের সংগঠনগুলিকে জোরদার করে তুলতে হবে। মুক্তির জন্য কারখানা-আইনের দিকে তাকিয়ে থাকবেন না। সেটা আনতে হবে আপনাদেরই। শ্রমিকদের লুণ্ঠন করাই হচ্ছে ক্ষেতে ও কারখানায় পুঁজিবাদীদের রণ-হুংকার। আপনাদের নিত্য-মন্ত্র হোক ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব। আপনাদের মুক্তি নিহিত রয়েছে আপনাদের সংগঠনের শক্তিতে। সংগঠনের প্রতি একনিষ্ঠ থাকুন। সমস্ত দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলুন; ক্ষমতা এবং স্বাধীনতার পথে আপনাদের অগ্রগতি অবধারিত।"

দেশের প্রথম সর্ব-ভারতীয় শ্রমিক-সংগঠনের প্রতিষ্ঠা এবং তার প্রথম ইশ্‌তাহারটির প্রকাশের পরে কেটে গিয়েছে কয়েক দশক। ইতিমধ্যে দেশ হয়েছে স্বাধীন। কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়নি এই আহ্বান। সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম আজও রয়েছে বাকি।

২৭.৪.৮৫

উৎসবের দিন, উৎসর্গেরও দিন

আজ থেকে শতবর্ষ আগে শ্রমিকের প্রাণদান ও রক্তস্নানে মহীয়ান এবং তার প্রতিবাদে ও প্রতিরোধে গরীয়ান মে দিবসের সূচনা। মালিকের হাতে শ্রমিকের অপঘাত ও রক্তপাত তার আগেও হয়েছে এবং পরেও হচ্ছে; শ্রমিকের প্রতিবাদ ও প্রত্যাঘাতও সেই প্রথম বা সেই শেষ নয়। কিন্তু সেই প্রথম একটি স্থানীয় শ্রেণী-সংঘাত রূপ পেল একটি আন্তর্জাতিক শ্রেণী-সংগ্রামে, যে সংগ্রাম আজও অব্যাহত।

কিন্তু মালিক শ্রেণীর হাতে শ্রমিক শ্রেণীর এই প্রকাশ্যে প্রাণহরণ ও রক্ত-মোক্ষণের ঘটনাবলী ছাড়া, প্রচ্ছন্নেও চলেছে এই মারাত্মক কর্মকাণ্ড—নিরন্তর নিরবচ্ছিন্ন। শ্রমিকের আছে ক্ষুধা ও শ্রমশক্তি মালিকের আছে যন্ত্র ও কাঁচামাল। ক্ষুধার তাড়নায় শ্রমিক বাধ্য হয় তার শ্রমশক্তিকে মালিকের হাতে তুলে দিতে মজুরির বিনিময়ে। সেই মজুরি হিসাবে সে যা পায়, তা তার দৈনিক কাজের ঘণ্টার মাত্র এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ সময়ের কাজের ফল; বাকি সমগ্র সময়ের কাজের ফলটাই আত্মসাৎ করে মালিক। এই মজুরি-বঞ্চিত বাড়তি শ্রমফল শ্রমিকের রক্ত ও প্রাণশক্তি ছাড়া আর কি? আর এই রক্ত ও প্রাণশক্তিই শ্রমিকের কাছ থেকে মালিক হরণ করে নিচ্ছে প্রতিদিন তিলে তিলে এবং গড়ে তুলছে তার মুনাফার পাহাড়। শ্রমিক যেন পেশাদার রক্তদাতা আর মালিক নেশাদার রক্তভুক! —দানবিক এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মানবিক অভিযানের প্রথম আন্তর্জাতিক অভিব্যক্তি এই মে দিবস।

'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'তে মার্কস-এঙ্গেলস বলেছেন, সেই আদিম সাম্যসমাজ বাদে মানুষের গোটা ইতিহাসই হল শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস। এক সময়ে বিতর্কিত হলেও, এ সত্য আজ প্রায় সমস্ত সমাজ-বিজ্ঞানীই স্বীকার করেন যে, আদিম সাম্যসমাজের পর্যায় অতিক্রম করার পর থেকে মানবজাতির অগ্রগতি ঘটেছে পরপর শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের বিকাশ ও বিপ্লবের মাধ্যমে। গোলামতান্ত্রিক সমাজ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ, ধনতান্ত্রিক সমাজ। কোথাও কোথাও উত্তরণ ঘটেছে সমাজতান্ত্রিক সমাজে। আরও লক্ষণীয় যে একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজ ছাড়া, বাকি তিনটি সমাজে শোষণের রূপে পরিবর্তন ঘটলেও তার অবসান ঘটেনি। অবশ্য প্রত্যেকটি পরবর্তী সমাজেই পূর্ববর্তী সমাজের তুলনায় শোষিত তথা শ্রমজীবী জনসংখ্যার অধিকার বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রীতদাসের ছিল না এমন কি জীবনেরও অধিকার, ভূমিদাস সেটা পেয়েছে; ভূমিদাসের ছিল না চলাফেরা বা সংগঠনের অধিকার, কিন্তু মজুরিদাস তা পেয়েছে। কেবল তাই নয়, আজকের শ্রমিক কেবল সমস্ত পৌর অধিকারই পায়নি, পেয়েছে সমস্ত রাজনৈতিক অধিকারও—যদিও অর্থনৈতিক অবস্থানের দরুন তা অনেক ক্ষেত্রেই থেকে গিয়েছে আনুষ্ঠানিক। এই আনুষ্ঠানিক অধিকারগুলিকে বাস্তব করে তোলাই হচ্ছে আজ শ্রমিক-শ্রেণীর আশু কর্মসূচী।

মে দিবসের সূচনা যদিও হয়েছিল দৈনিক কাজের ঘণ্টা কমাবার দাবিতে, আজ আর তার লক্ষ্য সীমিত নেই তার মধ্যে। সংগঠিতশ্রমিকের ক্ষেত্রে এ দাবি আজ স্বীকৃতি আদায় করেছে প্রায় সর্বত্র এবং অসংগঠিত শ্রমিকের ক্ষেত্রেও বেশিরভাগ জায়গায়। কিন্তু বাকি সব অবস্থা যথাপূর্ব থাকলে, কাজের ঘণ্টা কমানো মানে বড় জোর শোষণের মাত্রা কমানো ; আর যদি ইতিমধ্যে কৃৎকৌশলগত পরিবর্তনের মাধ্যমে শ্রমকে করে তোলা হয় তীব্রতর, তা হলে কাজের ঘণ্টা কমিয়েও শোষণের মাত্রাকে রাখা যায় অব্যাহত, এমনকি করা যায় পরিবর্ধিত। শ্রমিক শ্রেণীর সামনে তাই আজ আশু লক্ষ্য হ'ল গোটা শোষণ-ব্যবস্থারই অবসান। আর তার জন্য চাই উৎপাদনের যাবতীয় উপায়-উপকরণের উপরে ব্যক্তিগত মালিকানার লোপ সাধন করে, তার উপরে রাষ্ট্রের মালিকানা প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রের উপরে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা। এক কথায় চাই সমাজতন্ত্র। তাই মে দিবসের ডাক আর আজ নিছক অর্থনৈতিক নয়। সেই সঙ্গে রাজনৈতিক—সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রগমনের ডাক, সামাজিক বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতির ডাক।

কেবল তাই নয়, মে দিবসের তাৎপর্য আজ আরও সুদূরপ্রসারী, নতুন এক দিগন্তের দিশারী—শ্রমের বাধ্যবাধকতামুক্ত স্বাধীন, সমৃদ্ধ, সানন্দ মানুষের সাংস্কৃতিক সাধনা ও প্রকৃতি-বিজয়ের নতুন এক দিগন্তের দিশারী। আজ 'টেকনোলজি'-র এমন ক্ষিপ্রগতি ও সর্বাত্মক বিকাশ ঘটছে যে অনতিদূর ভবিষ্যতে মানুষের শ্রম হয়ে পড়বে অবান্তর, তার স্থান গ্রহণ করবে, 'রোবট' বা যন্ত্রমানব। ইতিমধ্যেই 'কম্পিউটার', 'অটোমেশন' ইত্যাদির প্রবর্তনে তার সূচনা আমরা লক্ষ্য করছি ছাঁটাইয়ের বিভীষিকায় এবং তার বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের আত্মপ্রকাশে। কিন্তু উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে যখন উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন তাকে রুদ্ধ করে রাখা যায় না চিরকালের জন্য। আজ হোক কাল হোক শ্রমজীবী জনগণকে তা মেনেই নিতে হয়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, শ্রমিকের জায়গায় যন্ত্রমানবকে বসিয়ে ধনিক শ্রেণী পার পেয়ে যায় চিরকালের জন্য। আদৌ তা নয়, বরং সে ধনতন্ত্রকে করে তুলবে এমন এক সঙ্কটে আপন্ন যে, তার ধ্বংস হয়ে উঠবে অনিবার্য ও প্রত্যাসন্ন। সমস্ত বা অধিকাংশ শ্রমিক-কর্মীই যদি প্রতিস্থাপিত হয় যন্ত্রের দ্বারা, তাহলে উৎপাদিত পণ্যসম্ভার ক্রয় করবে কারা? মুনাফা তো দূরের কথা ; উৎপাদনের খরচ উঠে আসবে কোত্থেকে? অতএব ভেঙে পড়বে ধনিকের সোনার স্বর্গ, তথা ধনতান্ত্রিক সৌধ—তার ভিত সমেত।

কিন্তু সেই অনাগত ভবিষ্যতে ধনতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী পতনের জন্য শ্রমিক-কর্মীরা কি নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকবে অদৃষ্টবাদীর মত? নিশ্চয়ই নয়, একই সঙ্গে তারা পরিচালনা করবে দ্বিমুখী সংগ্রাম—এক দিকে তারা লড়াই চালাবে কর্মচ্যুতি ও মজুরি-হ্রাসের বিরুদ্ধে, অন্যদিকে তারা লড়াই চালাবে সমস্ত জমি, খনি, বাগিচা কল-কারখানা ইত্যাদি রাষ্ট্রায়ত্ত করা এবং রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করার উদ্দেশ্যে। এই লড়াই যতই কঠিন হোক, যতই দীর্ঘস্থায়ী হোক, শেষ জয় যে তাদেরই, তা সহজেই সিদ্ধান্ত করা যায়।

সেক্ষেত্রে সমাজের সমস্ত সম্পদ ও সম্পত্তির, উৎপাদনের উপায় ও উপকরণের, উৎপন্ন ফসল ও সামগ্রীর সমান মালিক হবে সমাজের সমস্ত মানুষ; সমস্ত প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হবে যথাসম্ভব 'হাই টেকনোলজি'র ভিত্তিতে অর্থাৎ যন্ত্রমানবের দ্বারা। সুতরাং দূর অতীতে একদা যেমন গ্রীসের বিভিন্ন নগররাষ্ট্রে ক্রীতদাসদের (অ্যারিস্টটল যাদের অভিহিত করেছেন "কথা-বলা হাতিয়ার" বলে) উপরে সমস্ত শ্রমসাধ্য কাজ চাপিয়ে দিয়ে "নাগরিকেরা" নিজেদের নিয়োগ করেছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সংস্কৃতির সাধনায়, অনেকটা তেমনভাবেই তখন সমাজের সমস্ত মানুষ যন্ত্রমানবদের ("রোবট"-দের) উপরে সমস্ত শ্রমসাধ্য কাজ যথাসম্ভব ছেড়ে দিয়ে আত্মনিয়োগ করবে সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের সাধনায়, অভিযান চালাবে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে। সমাজে সব কিছুরই যখন সকলেই সমান মালিক, তখন প্রশ্ন ওঠে না দাম ও বিনিময়ের। অবশ্য যতকাল পর্যন্ত সব কিছুর উৎপাদন না হয় অঢেল, ততকাল অবধি বিলি-বণ্টনের জন্য প্রয়োজন হবে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের। অনাগত ভবিষ্যতের সেই বাঞ্ছিত বিধান আজ হয়তো স্বপ্ন, কিন্তু 'হাই টেকনোলজি' ইতিমধ্যেই আভাসিত করেছে তার সম্ভাব্যতা। আজকের মে দিবস সেই স্বপ্নেরও দিগ্‌দর্শক।

কিন্তু আলোকজ্জ্বল প্রভাতের পূর্বপ্রহরে যেমন অন্ধকার হয় গাঢ়তম, তেমনি পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ মানুষ যখন ইতিমধ্যেই পদার্পণ করেছে সেই পদাঙ্ক অনুসরণে, তখন এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের ছায়াপাত ঘটেছে আমাদের এই বিশ্বে এবং আমাদের এই দেশেও। এক দিকে বিশ্ব-ধনতন্ত্রের ভাঙন-ভীত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ হুমকি দিচ্ছে এক পারমাণবিক প্রলয়ে গোটা বিশ্বকে বিধ্বস্ত করার, অন্যদিকে বিদেশী প্রতিক্রিয়ার প্রশ্রয়-পুষ্ট স্বদেশী বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি হুমকি দিচ্ছে ভারতের রাষ্ট্রীয় সংহতিকে বিপর্যস্ত করার। এই পটভূমিকাতেই গোটা পৃথিবীর দেশে দেশে এবং আমাদের ভারতেও আজ উদ্‌যাপিত হচ্ছে মে দিবসের শতবর্ষ জয়ন্তী।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের পাণ্ডা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বের উপরে তার সামরিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে স্থাপন করে 'ন্যাটো'। কিন্তু তার উত্তরে বিশ্ব সমাজতন্ত্রের নেতা সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'ওয়ারশ চুক্তি সংস্থা' এবং রক্ষিত হয় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সামরিক ভারসাম্য। ইতিমধ্যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা ও স্বনির্ভর বিকাশের তাগিদে ক্রমে ক্রমে সমবেত হয় সমাজতন্ত্রের শক্তি-শিবিরের স্বপক্ষে। এইভাবে সামরিক শক্তিতে ভারসাম্য সত্ত্বেও, সমাজতন্ত্রের শিবিরের সঙ্গে জাতীয় মুক্তির শক্তি সংযোজিত হওয়ায় জনশক্তিতে প্রাধান্য লাভ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রমুখ শক্তি-সমাবেশ। অন্যদিকে বিশ্ব-ধনতন্ত্রের সঙ্কট বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ক্রমেই হয়ে ওঠে আরও আরও যুদ্ধমুখী, আরও আরও আগ্রাসী; এবং শান্তিকামী জনগণ ক্রমেই বেশি করে ঝুঁকে পড়ে সোভিয়েত নেতৃত্বাধীন শক্তি-সমাবেশের পক্ষে। তাই বিদেশে ও স্বদেশে জনসমর্থন-বঞ্চিত রেগন-প্রশাসন আজ

মরিয়া হয়ে উঠেছে পারমাণবিক পরাক্রমের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় ; জলে স্থলে এমন কি অন্তরীক্ষেও চলেছে তার পারমাণবিক সমরায়োজন।

এই সামরিক সন্ত্রাস সৃষ্টির রাজনীতির অঙ্গ হিসাবেই দেশে দেশে চলেছে রেগন-প্রশাসনের, তথা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের, হস্তক্ষেপ—কোথাও প্রকাশ্য, কোথাও প্রচ্ছন্ন ; কোথাও রাজনৈতিক ও সামরিক, কোথাও অর্থনৈতিক ও সামাজিক। তৃতীয় বিশ্বের তথা গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা আমাদের এই দেশের প্রতি স্বভাবতই পড়েছে তার কোপ-দৃষ্টি। একদিকে সে চেষ্টা করছে ভারতকে ঘিরে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের অন্যদিকে সে চেষ্টা করছে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিচ্ছেদকামী শক্তিগুলিকে সৃষ্ট ও পুষ্ট করতে, এবং সেই সঙ্গে আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অর্থ-ঋণ ও বহুজাতিক বিনিয়োগের মাধ্যমে এ দেশে তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক বনিয়াদের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার সাধন করতে।

এই যখন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি তখন বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীর অঙ্গ হিসাবে আমাদের দেশের শ্রমিক ও প্রগতিশীল মানুষেরাও উদ্‌যাপন করছে মে দিবস। এক দিকে বিশ্বশান্তির সংগ্রামে বিশ্ব শ্রমিক শ্রেণীর অঙ্গ হিসাবে তাদের গ্রহণ করতে হবে উপযুক্ত ভূমিকা, প্রমাণ করতে হবে পারমাণবিক শক্তি নয়, মানবিক শক্তিই বিশ্বের ভবিষ্যৎ-নিয়ন্তা। অন্যদিকে ভারতের রাষ্ট্রীয় সংহতি রক্ষার সংগ্রামেও তাদের গ্রহণ করতে হবে পুরোগামী ভূমিকা, প্রমাণ করতে হবে যে শোষক শ্রেণী ও গোষ্ঠীগুলির বোঝাপড়ায় নয়, দেশের প্রত্যেকটি অঞ্চলের. প্রত্যেকটি ধর্ম-সম্প্রদায়ের, প্রত্যেকটি সামাজিক বিভাগের অন্তর্গত শ্রমজীবী জনগণের সংহতিই হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সংহতির একমাত্র স্থায়ী ও নিশ্চিত রক্ষাকবচ। তাই মে দিবসের শতবর্ষ-জয়ন্তী নিছক উৎসবের দিন নয়, উৎসর্গেরও দিন—বিশ্বশান্তি ও রাষ্ট্রীয় সংহতি রক্ষার আদর্শে নিজেদের উৎসর্গের দিন। আজকে আর একথা সত্য নয় যে, বিশ্বের শ্রমিকদের হারাবার কিছু নেই। হারাবার আছে অনেক কিছু—বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ দেশের উপরে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও আধিপত্য, পৃথিবীর বাকি দেশে দেশে অর্জিত অধিকার অগ্রগতি, এবং সেই সঙ্গে ভবিষ্যতের স্বপ্ন ও প্রতিশ্রুতি। তাই শ্রমিক শ্রেণীকে আজ ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করতে হবে যা জয় করা হয়ে গিয়েছে, তাকে রক্ষা করার জন্য এবং যা জয় করা হয়নি, তাকে জয় করার জন্য।

১.৫.৮৬

ওরা রানার, সময় হয়েছে নোতুন খবর আনার

ওরা ছুটছে। সারা পৃথিবী জুড়ে ওরা ছুটছে। মহাদেশে মহাদেশে, শত শত দেশে দেশে, ওরা ছুটছে।

বিশেষ কোনো মতের বা পথের, বিশেষ কোনো ধর্মের বা বর্ণের পরিচয়বাহী নয় ওরা। ওদের মধ্যে আছে সব মতের ও পথের, সব ধর্ম ও বর্ণের, নর-নারী। ওরা মানুষ—শুধু মনুষ্যত্বেরই পতাকাবাহী।

ওরা আজ ছুটে চলেছে পৃথিবীর পথে পথে। উদ্দেশ্য পাথেয় সংগ্রহ। নিজেদের জন্য নয়, অন্যদের জন্য। পাথেয় নয়, প্রেরণা। প্রেরণা নয়, প্রাণ। করাল মৃত্যুর সঙ্গে অন্তিম সংগ্রামরত অগণিত শিশু, নারী ও পুরুষের জন্য প্রেরণা ও প্রাণ। তৃষ্ণার জল, ক্ষুধার অন্ন।

বলার অপেক্ষা রাখে না, আমি বলছি তাদেরই কথা, 'ইউনিসেফ'-এর ডাকে সাড়া দিয়ে গত পঁচিশে মে যারা বেরিয়ে পড়েছিল গোটা পৃথিবীর পথে পথে—খরা-কবলিত, অন্নজলরিক্ত, আফ্রিকার ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে বিরাট জনসংখ্যার জন্য সাহায্য সংগ্রহে।

এক দেশের প্রাকৃতিক বা অন্যবিধ দুর্বিপাকে অন্য দেশের মানুষদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসা কোনো, নোতুন ব্যাপার নয়। এর আগেও আমরা এগিয়ে গিয়েছি অন্যের বিপদে, অন্যরা এগিয়ে এসেছে আমাদের বিপদে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে একের বিপদে অন্যের সহানুভূতি ও সাহায্যের নজির বিরল নয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যেটা অভিনব ও অভূতপূর্ব, সেটা হ'ল একটি বিশ্ব-সংস্থার আহ্বানে এমন একটি বিশ্বব্যাপী আলোড়ন এবং একটি নির্দিষ্ট দিনে অগণিত নর-নারীর একই কার্যক্রমে এমন আবেগদীপ্ত অংশগ্রহণ।

বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য, যে-বিশ্ব-সংস্থাটি এই আহ্বান দিয়েছিল, সেটি 'ইউ-এন-ও' বা জতি-সংঘের একটি সংগঠন, যার প্রতিষ্ঠাতা পাঁচটি রাষ্ট্রের মধ্যে তিনটিই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী। সেই সঙ্গে আরও উল্লেখ্য যে, যে-দেশগুলির দুঃস্থ-দুর্গত মানুষদের জন্য এই আহ্বান, সেগুলির অবস্থান এই সাম্রাজ্যবাদীদেরই দীর্ঘকালীন মৃগয়া-ক্ষেত্র আফ্রিকায় এবং তাদের মানুষগুলি ঘোর কৃষ্ণাঙ্গ ও তীব্র সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী—অতএব, বর্ণ-বিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গদের কেবল শোষণ ও অত্যাচারেরই শিকার, সমব্যথা ও সুবিচারের অংশীদার নয়। এই আহ্বান প্রমাণ করে যে, বিশ্বসভায় আজ আর সাম্রাজ্যবাদের কণ্ঠ প্রধান নয়, এবং এই বিশ্বব্যাপী আলোড়ন প্রমাণ করে যে, কোনও শোষিত ও পীড়িত দেশ আজ আর একা নয়। বিশ্ব জুড়ে এক নোতুন যুগ প্রত্যাসন্ন।

আজ থেকে ঠিক অর্ধ-শতাব্দী আগে রবীন্দ্রনাথ আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন বহিরাগত সাম্রাজ্যবাদের শৃংখলে বদ্ধ, লুণ্ঠনে রিক্ত, অত্যাচারে জর্জর এই আফ্রিকার কথা। মর্মস্পর্শী ভাষায় তিনি আমাদের কাছে উন্মোচিত করেছিলেন তার ছায়াবৃত

পরিচয়, উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন তার "অপমানিত ইতিহাস"। বলেছিলেন, কেমন করে "এল ওরা লোহার হাতকড়া নিয়ে, নখ যাদের তীক্ষ্ণ··· নেকড়ের চেয়ে···। সভ্যের বর্বর লোভ নগ্ন করলো আপন অমানুষতা।" বলেছিলেন, কেমন করে "দস্যু-পায়ের কাঁটামারা জুতোর তলায়" "ভাষাহীন ক্রন্দনে" 'পঙ্কিল হ'ল ধূলি" "রক্ত অশ্রুতে মিশে।"

স্বস্তির কথা, আফ্রিকার অধিকাংশ দেশই আজ শৃঙ্খল-মুক্ত। কিন্তু শৃঙ্খল-মুক্তির সংগ্রাম কঠিন হলেও, আরও কঠিন যুগ-যুগ-ব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন ও ব্যাভিচারের পরে ফেলে যাওয়া রিক্ততা ও বিকৃতি থেকে মুক্তির সংগ্রাম। তার মাটি আজ উর্বরতাহীন, উষর ; তার আকাশ আজ বৃষ্টিহীন, ধূসর। "মানুষ-জন্তুর" অমানুষিকতার শিকার এই আফ্রিকা আজ তাই অক্ষম তার সন্তানদের অন্ন, জল যোগাতে। মানুষেরই একাংশের অমানুষিকতার এই পাপের জন্যই সমস্ত মানুষের হয়ে মানবতার কবি রবীন্দ্রনাথ সেদিন ক্ষমা ভিক্ষা করেছিলেন এই অবমানিতা আফ্রিকার কাছে :

"দাঁড়াও এই মানহারা মানবীর দ্বারে,
বলো, 'ক্ষমা করো'—"

কবি আজ নেই। মনে হয়, 'মানহারা মানবীর' অন্নজল-রিক্ত সন্তানদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা প্রশমনের জন্য আজ যারা বেরিয়ে পড়েছে পথে পথে, তারা কবির এই ক্ষমা প্রার্থনাকেই রূপায়িত করছে অন্ন-জলের অঞ্জলিতে। সাম্রাজ্যবাদী লুঠেরা ও লম্পটদের অত্যাচার ও ব্যাভিচারের অপরিমেয় ঋণের অন্ততঃ আংশিক শোধের জন্য দেশে দেশে ক্ষিপ্র পদে এগিয়ে এসেছে কোটি কোটি মানুষ।

কিন্তু ব্যাপারটা আজ শুধু ঋন শোধের নয়, ব্যাপারটা এক নোতুন উপলব্ধির। "জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে, সে জাতির নাম মানুষ জাতি"—এই উপলব্ধির। বিশ্বের যে কোনো মহাদেশে যে কোনো অংশের মানুষ যদি আজ যে কোনোভাবে আক্রান্ত হয়, বিপন্ন হয়, তা হলে বাকি বিশ্বের মানুষ ক্ষিপ্র পদে এগিয়ে যাবে তার সাহায্যে—হবে তার সহমর্মী, সহায়ক ও সহযোদ্ধা। সে বিপদ আসতে পারে প্রতিকূল প্রকৃতির কাছ থেকে যেমন এসেছে ইথিওপিয়ায় এক দশক-ব্যাপী খরার আকারে ; আসতে পারে মানুষ-জন্তুর কাছ থেকে, যেমন এসেছে দক্ষিণ আফ্রিকায়—বর্ণ-বিদ্বেষী পাশবিকতার আকারে ; কিংবা নিকারাগুয়ায় নামিবিয়ায়, লিবিয়ায়, জাম্বিয়ায়, অ্যাঙ্গোলায়—সাম্রাজ্যবাদী হানা, হামলা ও দখলদারির আকারে।

পঁচিশে মে'র এই বিশ্ব জোড়া ধাবমান পদযাত্রা এই উপলব্ধিরই সতেজ উদ্দীপক, সোচ্চার ঘোষণা। কেউ আর কোথাও একা নও, নিঃসঙ্গ নও। পৃথিবী দেশে দেশে আমরা আছি তোমার সঙ্গে—তোমার বিপদের সঙ্গী হিসাবে। প্রতিকূল প্রকৃতির অন্ধ আক্রোশ আর শোষণ-লোলুপ অমানুষের লুব্ধ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আমরা আছি, এবং থাকব, তোমার পাশে। আমরা পদাতিক—আমরা অনাগত যুগের অগ্রদূত।

এই যে দেশে দেশে, দলে দলে, বেরিয়ে-পড়া লক্ষ লক্ষ মানুষের ধাবমান অভিযান, তা আজ মনে করিয়ে দেয় সেই যাযাবর মানুষদের কথা—সেই কবে, কোন সুদূর অতীতে, যারা বেরিয়ে পড়েছিল অরণ্যের গভীর থেকে কেবল চলা আর চলা ; সংগ্রাম আর সংগ্রাম —প্রথমতঃ প্রকৃতির বিরুদ্ধে। প্রকৃতির উপরে সেই প্রাথমিক জয়লাভের পরে যাযাবর মানুষ আস্তানা গড়ে তুলেছিল নদীর ধারে ধারে, ফসল ফলিয়েছিল কুমারী মাটিতে। তারপরেই এলো দ্বিতীয় যুগ। তাদের ক্ষেত ও ফসলের, এমনকি তাদের দেহ-প্রাণের উপরে দখল কায়েম করে উদ্ভব ঘটল মুষ্টিমেয় মানুষের এক শোষক শ্রেণীর তথা শাসক শ্রেণীর। বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষ হ'ল গোলাম আর ঐ সামান্য সংখ্যক পরশ্রমজীবী প্রাণী হ'ল প্রভু। কিন্তু থামেনি মানুষের পদযাত্রা। ক্রীতদাস যুগের পথ পার হয়ে তারা প্রবেশ করল ভূমিদাস-যুগে। দেহের ও প্রাণের উপরে অধিকার আদায় হ'ল বটে, কিন্তু অনাদায়ী রয়ে গেল বাকি সব অধিকার। থামলো না অগ্রগমন, সংগ্রামে সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে তারা প্রবেশ করল মজুরি-দাস যুগে। বাহ্যতঃ আদায় হ'ল সমস্ত অধিকার, কিন্তু কার্যতঃ রয়ে গেল সেই দাসই—মূলধনের দাস। অভিযান চলল অব্যাহত। বহু সংগ্রাম, অঢেল রক্ত ও অসংখ্য প্রাণের বিনিময়ে শ্রমজীবী মানুষ দেশে দেশে প্রতিষ্ঠা করল আপন আধিপত্য। কিন্তু শেষ হ'ল না সংগ্রামী অভিযান—এক দিকে বাকি পৃথিবীতে অমানুষিক ব্যবস্থা ও বিধানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, অন্যদিকে প্রতিকূল প্রকৃতির খেয়ালিপনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। আজ বিশ্ব জুড়ে মানুষ তাই দুর্জয় পদক্ষেপে, ক্ষিপ্র গতিতে, এগিয়ে চলেছে এক নতুন পৃথিবীর পথে, যে-পৃথিবীতে মানুষ-জন্তুর স্থান হবে কেবল যাদুঘরে এবং প্রকৃতির খেয়ালখুশিতে মানুষের দুর্গতির পর্ব হবে শেষ। এক কথায় মানুষের প্রাগিতিহাসের শেষে শুরু হবে তার যথার্থ ইতিহাসের।

পঁচিশে মে'র এই বিশ্ব জোড়া ধাবমান পদযাত্রীরা আমাদের চোখে সামনে তুলে ধরেছে, সেই "এক বিশ্ব, এক জাতি"-র দীর্ঘ-লালিত স্বপ্নেরই এক দূরাগত বাস্তব আভাস। এদের এই অভিযান তাই "Race against Time" নয়, বরং "Race ahead of Time"। এরা ভবিষ্যতের ঠিকানাবাহী 'রানার,' যাদের কানে এসে পৌঁছেছে সেই ডাক :

"সময় হয়েছে নতুন খবর আনার !"

২.৬.৮৭